রাসায়েল ও মাসায়েল

৪র্থ খন্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

রাসায়েল ও মাসায়েল

৪র্থ খণ্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ
সুলাইমান ফারূকী
আবদুস শহীদ নাসিম
আকরাম ফারূক

শতাব্দী প্রকাশনী

আমাদের কথা

ইসলামি জ্ঞান গবেষণার বিশ্ববরেণ্য বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাহ. দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ শহর থেকে ১৯৩২ সালে 'তরজমানুল কুরআন' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন, যা অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল যাবত মানব জাতির কাছে ইসলামি জ্ঞান পরিবেশন করে আসছে। আজও সে পত্রিকাটি লাহোর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

এ মাসিক পত্রিকায় তিনি ইসলামের বিপ্লবী চিন্তাধারা হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও প্রকাশভংগীতে পরিবেশন করতে থাকেন, যার ফলে পাঠকবর্গের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাঠকদের পক্ষ থেকে উক্ত পত্রিকাটির মাধ্যমে তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর ও ব্যাখ্যা দাবি করা হয়। মাওলানা পত্রিকাটির মাধ্যমে সেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেন।

এ প্রশ্নোত্তরগুলো 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে প্রকাশিত হতে থাকে। রাসায়েল 'রিসালাহ' শব্দের বহু বচন, যার অর্থ 'পত্রপত্রিকা' 'সাময়িকী' ইত্যাদি। মাসায়েল 'মাস্য়ালা' শব্দের বহু বচন। এর অর্থ 'প্রশ্ন' বা 'সমস্যা'।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক তাঁর নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। কেউ জ্ঞান লাভের জন্যে প্রশ্ন করেছেন, কেউ তাঁর প্রকাশিত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তাঁকে পত্র লিখেছেন। এ সবের তিনি সুন্দর জবাব দিয়েছেন।

তাছাড়া প্রশ্নের ধরন ছিলো বিভিন্ন। কুরআন, হাদিস, তফসির, ফেকাহ সম্পর্কে প্রশ্ন। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন, সাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞান জিজ্ঞাসার 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মন জয়কারী জবাব তিনি দিয়েছেন। এসব প্রশ্নোত্তর 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে গ্রন্থকারে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানার মনীষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এ গ্রন্থের বংগানুবাদের নামকরণও আমরা করলাম 'রাসায়েল ও মাসায়েল'।

আমরা মনে করি আলেম সমাজ, কুরআন হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রের জ্ঞানপিপাসু, সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্যে জ্ঞান আহরণের এ এক অমূল্য গ্রন্থ।

আব্বাস আলী খান
চেয়ারম্যান, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা
নভেম্বর ১৯৯১

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

ইসলামি আন্দোলন প্রসঙ্গে

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সাধারণ বিষয়

মনোহারি অভিযোগ

প্রশ্ন : মেহেরবানী করে পরিষ্কার ও সরল ভাষায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির জবাব দিয়ে বাধিত করুন, যাতে এগুলো সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা এবং অজ্ঞতা দূর হয়ে যায় :

১. যখন সাবেক গণপরিষদ আদর্শ প্রস্তাব পাশ করে, তখন জামায়াতে ইসলামি 'পাকিস্তান'কে দারুল ইসলাম হিসেবে মেনে নিয়েছিল। পরবর্তীতে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক যাবতীয় প্রস্তাব এবং এর অসম্পূর্ণ আইন সমেত গণপরিষদ বাতিল ঘোষিত হয়। এমতাবস্থায় আপনার দৃষ্টিতে পাকিস্তান কি পূর্ববৎ দারুল ইসলামই থেকে যাবে, না দারুল হরবে রূপান্তরিত হবে?

২. "আপনার এখন পর্যন্ত হজ্জ না করার কারণ কি?" এ প্রশ্নের জবাবে আপনি কি বলেছিলেন, কিংবা সেটাই কি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যে, বর্তমানের চেষ্টা সংগ্রাম আমাদের কাছে হজ্জ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ?

৩. প্রথম বারের হজ্জ ফরয ও পরবর্তী হজ্জ নফল। জাতীয়, পারিবারিক কিংবা ধর্মীয় পর্যায়ের যেসব ফরয ও সুন্নত সম্পন্ন না করে দ্বিতীয় বার হজ্জ করা জায়েয নয়, সেগুলো কি কি? যে দেশের লোকেরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুরাবস্থায় জীবন যাপন করে সে দেশের লোকের জন্য দ্বিতীয়বার হজ্জ করা জায়েয কি না?

৪. খতমে নবুয়্যত আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছে, আপনার জামায়াতের সদস্য ও সহযোগী সদস্যগণ তাদের মৃত্যুকে হারাম মৃত্যু বলে আখ্যা দিয়ে আসছেন। এটা কি আপনার জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি না কি যারা বলছেন তাদের ব্যক্তিগত অভিমত? যদি ব্যক্তিগত মত হয় তাহলে এই পবিত্র আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে জামায়াত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? এভাবে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে আপনি সাংগঠনিকভাবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

৫. আমাদের শহরে আপনার আগমন উপলক্ষে যে হাজার হাজার টাকা অপচয় করা হয়েছে, তা কি অন্যায় হয়নি? আপনার আগমনে আনন্দ অপরিহার্য হয়ে থাকলে এ পরিমাণ টাকার খাদ্যশস্য গরীব মিসকীনদের মধ্যে আপনার হাতে বিতরণ করলে কি ভালো হতো না?

৬. আপনার জামায়াত গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত কেন?

জবাব :

১. একথা ঠিক নয় যে, গভর্নর জেনারেল সাবেক গণপরিষদের সকল প্রস্তাব ও অসম্পূর্ণ শাসনতন্ত্রের খসড়া বাতিল করে দিয়েছেন। এমন কোনো ঘোষণা আজও হয়নি। আদর্শ প্রস্তাব ও পূর্বেকার অন্যান্য সিদ্ধান্ত এখনো স্বস্থানে বহাল আছে। তবে কোনো বিষয় পূর্বাবস্থায় বহাল রাখা অথবা রহিত করে পরিবর্তন করার এখতিয়ার নতুন গণপরিষদের রয়েছে। সুতরাং আপনার এ প্রশ্ন অবান্তর।

২. আমি আদৌ এ কথা বলিনি এবং এমন ধারণা করাও ঠিক নয়। আমার হজ্জ করতে না পারার কারণগুলো হচ্ছে : আর্থিক সংকট, অসুস্থতা এবং বার বার কারাবরণ করতে থাকা। কয়েক বছর থেকে হজ্জ করার এরাদা করছি, কিন্তু প্রতিবারই উক্ত কারণগুলির কোনো না কোনো একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। দোয়া করছি যেনো আগামী বছর আল্লাহ তায়ালা হজ্জ করার তৌফিক দান করেন।

৩. আপনার তৃতীয় প্রশ্নের জবাব বিস্তারিতভাবে দেওয়া প্রয়োজন, এর সংক্ষিপ্ত জবাব সম্ভব নয়। আমি শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করবো যে, দেশের দারিদ্র্যকে দ্বিতীয়বার হজ্জ করা নাজায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল সাব্যস্ত করা ভুল।

৪. খতমে নবুয়্যত আন্দোলনে যোগদান করে শাহাদাত বরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুকে জামায়াতে ইসলামির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি হারাম মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করেছে, আমি একথা কখনো জানতে পারিনি। আপনার সামনে এমন কথা কেউ বলে থাকলে আপনি তার নাম আমার নিকট পেশ করুন, যাতে করে সে বিষয়ে যাঁচাই করে তাকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি।

৫. হাজার হাজার টাকার অপচয় সম্পর্কে সম্ভবত আপনি আপনার শহরের কিছু লোকের সেই খরচকে বুঝাতে চেয়েছেন যা তারা আমার আগমন উপলক্ষে আয়োজিত ভোজসভায় ব্যয় করেছিল। এটাই যদি আপনার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে একাজ তো আপনার শহরের কিছু লোক করেছে আর এ কথা সম্ভবত আপনার অজানাও নাই। আপনি বরং তাদেরকেই জিজ্ঞেস করুন। আমার অপরাধ হয়ে থাকলে সেটা কেবল এই যে, আমি তাদের দাওয়াত কবুল করেছি। আপনি কি চান যে, কেউ আমাকে খানা বা চায়ের দাওয়াত দিলে আমি তা ফিরিয়ে দিই?

৬. এটা তো কোনো প্রশ্নই নয়, বরং নিছক ভিত্তিহীন অভিযোগ মাত্র। আপনি যে দোষারোপ করছেন প্রথমে তার ব্যাখ্যা দিন। হিংসা ও সংকীর্ণ দৃষ্টি দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন? তারপর জামায়াতে ইসলামির মধ্যে এর অস্তিত্ব থাকার প্রমাণ উপস্থিত করুন। প্রমাণ হলেই প্রশ্ন আসতে পারে জামায়াতে ইসলামির মধ্যে এটা থাকবে কেন? এ কষ্ট স্বীকারের পূর্বে আপনি নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখলে কি ভালো হতো না যে, আপনি নিজেই এই হিংসা ও সংকীর্ণতায় জড়িয়ে আছেন কি না? *(তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৫৫ খৃ.)*

অভিনন্দন পত্র ও অভ্যর্থনা

প্রশ্ন : মাহেরুল কাদেরী সাহেবের প্রশ্নের জবাবে ফারান পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত ইসলাহী সাহেবের লিখিত চিঠি সম্ভবতঃ আপনার নযরে পড়েছে আমার মনে হয় আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে যদি আপনি নিজের মত প্রকাশ করেন, তাহলে সেটাই হবে উত্তম ও যথার্থ। কারণ, ব্যাপারটি সরাসরি আপনার সাথে জড়িত। আর আপনার কাজের ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব অন্য যে কোনো ব্যক্তির তুলনায় আপনারই উপর বর্তায়। এটা তো স্পষ্ট কথা যে, আপনার নিজের সম্মতিক্রমেই যখন অভিনন্দনপত্রটি আপনার উদ্দেশ্যে পেশ করা হচ্ছিলো তখন আপনি এর প্রয়োজনকেও বৈধ বলেই মনে করে থাকবেন। কিন্তু আপনি কোন্ দলীলের ভিত্তিতে এ তৎপরতাকে সঠিক মনে করেন? আমি আসলে এটাই জানতে চাই এবং এমন এক ব্যক্তির নিকট জানতে চাওয়া আশা করি ভুল হবে না যিনি সব সময় যুক্তিপ্রিয় হওয়ার দাবি করে আসছেন। জবাব দিতে গিয়ে বিশেষভাবে একটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে অনুরোধ করছি যে, আপনি অভিনন্দনপত্রের সম্পূর্ণ কাজটিকে জায়েয বলে প্রমাণিত করলেও আপনার নীতি অনুসারে ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য এ পন্থা পরিহার করা সতর্কতা, বুদ্ধিমত্তা ও শরিয়তের মূল চেতনার দাবি হিসেবে উচিত নয় কি? আর কূপের একেবারে কিনারাতে পায়চারী করার পরিবর্তে একটু দূরে সরে থাকাই কি উচিত নয়, যাতে করে পিছলে গিয়ে কূপের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে?

অভ্যর্থনা উপলক্ষে পুষ্প বর্ষণকে ইতিপূর্বে আমি খারাপ মনে করতাম না কিন্তু এর বৈধতা সম্পর্কে ইসলাহী সাহেব যে প্রমাণ উপস্থিত করেছেন সেটাই আমাকে এই জিদ করতে বাধ্য করেছে যে, তোহ্ফা তোহ্ফাই। কোনো মহৎ ব্যক্তির অভ্যর্থনা উপলক্ষে পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা তার মহত্বের স্বীকৃতি দান এবং তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনই বুঝায়। ৬০।, তাঁর উপস্থিতিতে এর আয়োজন করাটা সম্ভবতঃ পছন্দনীয় বলা যায় না, আর কোনো ব্যক্তির উদারপনা হওয়া একথার নিশ্চয়তা নয় যে, সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে যদি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাহলে তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবেন না। আর আমাদের নিকট এমন কোনো যন্ত্র নাই যার দ্বারা কোনো ব্যক্তির উদারতা, অভ্যন্তরীণ অবস্থা সঠিকভাবে আন্দাজ করা যায়।

জবাব দানকালে ফারান পত্রিকার জুলাই সংখ্যা সামনে রাখা আমি সমীচীন মনে করি। কারণ এর মধ্যে পক্ষ বিপক্ষ উভয় দিকের যুক্তিগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর জবাব আমি সরাসরি আপনার নিকট থেকেই আশা করি। আপনার কোনো সহকারির কাছ থেকে নয়। আশা করি সুযোগ পাওয়া মাত্র আপনি এর জবাব দেবেন এবং এ প্রশ্নকে অনর্থক মনে করে এড়িয়ে যাবেন না।

জবাব : মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী সাহেব নিজেই তার কথার ব্যাখ্যা দিতে পারেন। তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দান করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না। অবশ্য আমি নিজে না অভিনন্দনপত্র পছন্দ করি, না ফুলের মালা, না পুষ্পবৃষ্টি। এসব কিছু আমার ইচ্ছার বাইরে বরং ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হয়েছে। আর বাধ্য হয়েই আমাকে এগুলি সহ্য করতে হয়েছে। কারণ কারো পক্ষ থেকে যদি কোনো প্রতিকূল অবস্থায় আন্তরিকতা ও মহব্বত প্রকাশ পায় তাহলে অন্য পক্ষ প্রায়শই বড় মুশকিলে পড়ে যায়। আপনিই বলুন, আমি কোনোখানে গেলে লোকেরা যদি ফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে আসে এমতাবস্থায় তাদেরকে রাগ দেখিয়ে ও ধমক দিয়ে যদি বলি যে, নিয়ে যাও তোমাদের ফুলের মালা, এগুলি আমি গ্রহণ করিনা, অথবা কোনো জায়গায় যদি আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং মেজবান অভিনন্দনপত্র শুধু তৈরিই নয়, ছাপিয়েও নিয়ে আসে আর সেখানে উপস্থিত হওয়ার পরই আমি জানতে পারি তাহলে 'রাখো তোমাদের অভিনন্দনপত্র" বলে ফিরিয়ে দেয়া কি শালীনতাপূর্ণ আচরণ গণ্য হবে? অবশ্য এটা যদি স্পষ্ট হারাম হতো তাহলে একে অস্বীকার করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্টদের নিন্দা করা আমার জন্য যথার্থ ছিলো। কিন্তু পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়; বরং আমার সাথে যারা আন্তরিক মহব্বত রাখে শুধুমাত্র অপছন্দনীয় হওয়া এবং ফিতনার আশংকার অজুহাতে তাদের মনে আঘাত দেয়া, তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করা আমি সঙ্গত মনে করি না। আমি এই করতে পারি; আর করেও থাকি যে, লোকদেরকে আন্তরিকতা প্রদর্শনের এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করার আবেদন জানাতে পারি। এর বেশি যদি কিছু করা দরকার বলে আপনি মনে করেন তাহলে সে পন্থা আপনি নির্দেশ করতে পারেন। *(তরজমানুল কুরআন, মুহাররাম ১৩৭৫ হি. সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ খৃ.)*

মিথ্যা অভিযোগ

প্রশ্ন আমাদের এলাকায় জনৈক আলেম সাহেব আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। আপনার প্রতি তিনি যেসব বিষয়ে দোষারোপ করে থাকেন সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. আপনার লিখিত তাফহীমাত গ্রন্থে চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তিকে আপনি যুলুম বলে অভিহিত করেছেন।

২. তরজমানুল কুরআনে আপনি লিখেছেন, কিয়ামতের পরে এই যমীনকে জান্নাত বানিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ জান্নাত আগামীতে তৈরি হবে। এখন এর অস্তিত্ব কোথাও বর্তমান নেই, আগে থেকে তৈরি করেও রাখা হয়নি।

৩. তরজমানুল কুরআনে আপনি এ কথাও লিখেছেন, হযরত আদম আ. কে যে জান্নাতে রাখা হয়েছিল সেটা এই যমীনের উপরেই ছিলো। অথচ এটা মুতাযিলাদের আকীদা।

মেহেরবানী করে এসব অভিযোগের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন, যাতে করে সত্যিকার অবস্থা জানা যায়।

জবাব : আল্লাহ তায়ালা এসকল আলেমকে সততা ও দীনদারীর তৌফিক দান করুন। দু:খ হয় তাদের জন্য যে, তারা يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ কথাগুলিকে নিজ স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র রাখে। তারা একটুও চিন্তা করেন না যে, এই দুনিয়াটাই সবকিছু নয়, আল্লাহর নিকটও কখনো হাজির হতে হবে এবং নিজ কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে। আপনি যেসব অভিযোগের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত জবাব নিম্নরূপ:

অনৈসলামি সমাজে শরিয়তের শাস্তি বিধান জারি করা

১. উল্লেখিত হযরতের ইংগিত ঐ কথাগুলির প্রতি যা তাফহীমাত ২য় খণ্ডের ২৮০-২৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। আপনি নিজে সেটা পড়ে দেখতে পারেন। সমগ্র প্রবন্ধটিই লেখা হয়েছে ঐসব লোকের সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে যারা শরিয়তের শাস্তি বিধানকে অত্যাচারমূলক ও বর্বর সাজা হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ প্রসঙ্গে নিজের যুক্তি পেশ করতে গিয়ে আমি যাকিছু লিখেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী হলো: ইসলামি ফৌজদারী আইনের ধারাগুলি সেই দেশে প্রয়োগ হতে পারে যেখানে ইসলামের জীবনবিধান পুরাপুরি চালু আছে। কিন্তু যে দেশের সমস্ত আইন-কানুন কুফরী পদ্ধতি অনুসারে জারি রয়েছে সে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামের শুধুমাত্র চুরি অথবা ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ ন্যায়ানুগ হতে পারে না। চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তি অবশ্য সে দেশের জন্যই ইনসাফপূর্ণ হতে পারে যেখানকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ইসলামের আইন অনুসারে চালু রয়েছে। পক্ষান্তরে এ শাস্তি ঐ দেশের জন্য রীতিমতো জুলুম যেখানে সুদ হালাল, যাকাত ব্যবস্থা পরিত্যক্ত এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্যের কোনো ব্যবস্থাই বর্তমান নেই। এতোগুলো কথাবার্তার মধ্য থেকে কেউ যদি শুধুমাত্র একথাটি বের করে নেয় যে, চুরির অপরাধে হাত কাটাকে এ ব্যক্তি জুলুম বলে অভিহিত করে, তাহলে আপনি নিজেই চিন্তা করুন তার বিবেক ও বোধশক্তি সম্পর্কে দু:খ করা হবে, না তার সততা খতম হয়ে গেছে বলে শোক করা হবে।

জান্নাতের অবস্থান স্থল

২. এ নিবন্ধটি ১৯৫৫ সনে তরজমানুল কুরআনের মে সংখ্যার দু'জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ১১৯-১২০ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় ১৮৮-১৯০ পৃষ্ঠায়। দু'স্থানেই কুরআন থেকে দলিল পেশ করতে গিয়ে আমি অবশ্যই বলেছি এই যমীনকে পরকালে জান্নাত বানিয়ে দেয়া হবে। এবং শুধুমাত্র নেককার লোকেরাই তার মালিক হবে। কিন্তু কোথাও একথা বলিনি যে, বর্তমানে জান্নাতের কোনো অস্তিত্বই নেই বা পূর্ব থেকে তৈরি নেই। তাহলে আমার কথার মধ্য থেকে এ মর্মার্থ কেমন করে বেরিয়ে এলো আর কোত্থেকে এলো? কেউ যদি বলে অমুক

জায়গায় বাড়ি তৈরি করা হবে, তার দ্বারা একথা কেমন করে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, এখন সেখানে কোনো বাড়ি নেই বা পূর্বেও কোনো সময়ে তৈরি করা হয়নি? অপরের কথার মধ্যে নিজের কোনো কথা বাড়িয়ে দিয়ে দোষারোপের সুযোগ তৈরি করে নেওয়ার এটা এক অদ্ভুত কৌশল বৈকি!

৩. হযরত আদম আ. কে এই যমীনেই জান্নাতে রাখা হয়েছিল এ অভিমত আমি অবশ্যই প্রকাশ করেছি। তাই বলে কি এটা মূলত:ই কোনো অপরাধ এবং ইসলামের মৌলিক আকীদার সঙ্গে সংঘর্ষশীল? মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে তিন প্রকার মত গ্রহণ করেছেন : এক. সে জান্নাত আসমানের উপর অবস্থিত ছিলো; দ্বিতীয়, যমীনের উপর বর্তমান ছিলো এবং তৃতীয়, এ ব্যাপারে নীরবতাই শ্রেয়। এঁদের মধ্যে কেউ একথা বলেননি যে, অমুক মতকে মেনে নেওয়া ওয়াজিব এবং ইসলামের একটি অপরিহার্য আকীদা, এর বিপরীত মতপোষণকারী অপবাদের যোগ্য। সন্দেহ নেই যে, কোনো কোনো মুতাযিলী আলেম দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেছেন। তবে এটা মুতাযিলীদের সবিশেষ মাসআলাগুলির অন্যতম নয় যার ভিত্তিতে তাদেরকে মুতাযিলী বলা হয়। তাদের প্রত্যেক কথা যদি ইতিজাল (পৃথক হয়ে যাওয়া) এবং পরিত্যাগযোগ্য বলে কেউ মনে করে তাহলে সেটা যুলুমের নামান্তর। তাদের কট্টর বিরোধী ইমাম রাযীর ন্যায় মনীষীও আবু মুসলিম ইসপাহানী এবং জামাখশারীর মতো মুতাযিলীদের অনেক উক্তি গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য আলেমরাও তাদেরকে জ্ঞানগত দিক থেকে এতোটা অস্পৃশ্য মনে করেন না যে, একটি কথা শুধু একারণে রদ করে দিতে হবে যে, কথাটি কোনো মুতাযিলীর মুখ নি:সৃত। *(তরজমানুল কুরআন, রবিউল আউয়াল ১৩৭৫ হি., মুতাবিক নভেম্বর ১৯৫৫ খৃ.)*

ফিৎনা সৃষ্টি করার দুরারোগ্য ব্যাধি

প্রশ্ন রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ডের ৫৩ পৃষ্ঠায় আপনি লিখেছেন, 'কানা দাজ্জাল ইত্যাদি নিছক কাল্পনিক কাহিনীমাত্র, যার কোনো শরঈ ভিত্তি নেই।" একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, দাজ্জালের ব্যাপারটিকে আপনি মূলত অস্বীকার করতে চান। অবশ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই আপনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে জিনিসটিকে আপনি কাল্পনিক কাহিনী বলে অভিহিত করেছেন, তা দাজ্জালের নিজের প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারটি নয়, সেটা বরং এই ধারণা যে, সে বর্তমানে কোথাও বন্দী জীবন যাপন করছে। এমতাবস্থায়, যথাস্থানে বাক্যটিকে শুধরে দিলে কি ভালো হতো না? কারণ, এর শব্দগুলিই এমন যে, এদ্বারা লোকদের আপত্তি করার সুযোগ অনায়াসে এসে যায়।

জবাব : যে লেখাটির প্রতি আপনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সেটা স্বতন্ত্র কোনো নিবন্ধ নয়, বরং তা হচ্ছে একটি প্রশ্নের জবাব। আর বিবেকবান

ব্যক্তিমাত্রই একথা জানে যে, কোনো কথা যখন কোনো প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, তখন সেই প্রশ্ন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র জবাব দ্বারা একটি তাৎপর্য বের করা সঠিক হতে পারে না। প্রশ্নকারীর প্রশ্ন ছিলো কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রচার হয়ে আছে যে, সে কোথাও বন্দি জীবন-যাপন করছে। এখন প্রশ্ন হলো সে স্থানটি কোথায়? এখন তো মানুষ দুনিয়ার প্রতিটি এলাকাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে ফেলেছে। তারপরও কানা দাজ্জালের সন্ধান আজও পাওয়া গেলো না কেনো? (রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা) একথার জবাবে আমি যাকিছু লিখেছি তার সম্পর্ক অবশ্যই প্রশ্নের মধ্যে পেশকৃত কথার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। অর্থাৎ দাজ্জাল আজও কোথাও বন্দি অবস্থায় আছে। অতঃপর পরবর্তী পৃষ্ঠায় আমি নিজেই আমার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছি। কিন্তু, এরপরও আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ফিৎনা সৃষ্টি করাই যাদের মূল উদ্দেশ্য তারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা এবং লোক সমাজে লজ্জিত হাওয়াকে উপেক্ষা করে আমার সে উক্তির ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে। এখন আপনি কি আশা করেন যে, নিজের উক্তি যদি আমি সংশোধন করে দেইও তাতে কি তারা নিজেদের অনুসৃত সে নীতি থেকে বিরত থাকবে? আপনার পরামর্শ যথার্থ এবং মূল্যবান সন্দেহ নাই। এ প্রসঙ্গে আপনাকে এ নিশ্চয়তাও দিচ্ছি যে, রাসায়েল ও মাসায়েলের পরবর্তী সংস্করণে আলোচ্য বাক্যটি পরিবর্তন করে দেয়া হবে। কিন্তু আমি এও জানি, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এ সংশোধনের দিকে ফিরেও তাকাবে না, বরং পূর্বের লেখা থেকেই তারা নিজেদের কুমতলব হাসিলের আগ্রহে ছুটে যাবে। *(তরজমানুল কুরআন, রবিউল আউয়াল ১৩৭৫ হি., নভেম্বর ১৯৫৫ খৃ.)*

ব্যাখ্যার অযোগ্য জীবন সমস্যা

প্রশ্ন মানব জীবনে এমন অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায় যেগুলির গঠনমূলক দিকের উপর নাশকতামূলক দিকগুলো প্রবল মনে হয়। বহু ঘটনা এমনও ঘটে যায় যার রহস্য ও যুক্তিসিদ্ধতা বোধগম্য হয় না। জীবনের ব্যাপারে ধ্যানধারণা যদি এটাই হয়ে থাকে যে, এর অস্তিত্ব আপনা থেকেই এসেছে এবং এর পিছনে কোনো বিজ্ঞানময়, জ্ঞানী ও দয়াময় স্রষ্টার শক্তি কার্যকর নেই, তাহলে তো জীবনের প্রতিটি পেরেশানী ও জটিলতা নিজ নিজে স্থানে যথার্থ। কারণ, তাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তার কোনো হাত নেই। কিন্তু ধর্ম এবং আল্লাহ সম্পর্কে বুনিয়াদী ধ্যানধারণা এবং ঐসব ঘটনাবলীর মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য বুঝা যায় না।

যদি বলা হয় এসব সমস্যা সমাধানের উপায় উপকরণ আমাদের কাছে নেই তাহলে এটাও আশ্চর্য বটে। মানব মস্তিষ্ককে এসব প্রশ্ন উত্থাপনের উপযোগী করে গড়া হবে অথচ এগুলোর জবাব দেয়া কিংবা এগুলো বুঝতে সক্ষম করে তোলা

হবে না? সব প্রয়োজনের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হবে অথচ মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনকে এড়িয়ে যাবে এমনটা হতে পারে না। কেননা এভাবে তো আল্লাহ তায়ালার পলিসি বাহ্যত: দুর্বল বলে মনে হয়ে থাকে। (নাউযু বিল্লাহ)

জবাব : আপনি যেসব জটিলতায় জড়িয়ে আছেন, সেসবের সমাধান দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভবই মনে হয়। বড়জোর আমি এতোটুকু বলতে পারি যে, আপনার চিন্তার সূচনাটাই সঠিক নয়। কেননা আপনি যেসব প্রশ্নের আলোকে চিন্তার প্রবাহে গতি আনতে আগ্রহী সেগুলো মূলত পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নের কোনো অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর অংশ দ্বারা বস্তুর পূর্ণাঙ্গ রূপকাঠামো বা বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত কায়েম করা যায় না। আপনি প্রথমে পূর্ণাঙ্গ বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, কোনো সৃষ্টিকর্তা, সংগঠক ও পরিচালক ব্যতীত তা বর্তমান থাকতে পারে কি না। যদি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপক ছাড়া ব্যবস্থা বর্তমান আছে বলে আপনার অন্তর তৃপ্তির সাথে মেনে নেয় তাহলে বাদবাকী সব প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এমতাবস্থায় সবকিছুই যেমন হঠাৎ করে এলোমেলো সৃষ্টি হয়ে গেছে, তদ্রূপ সবকিছু আপনা থেকেই বিশৃংখলভাবে চলেও যাচ্ছে; এর মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি, রহমত ও লালনপালনের প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু আপনার অন্তর যদি এতে পরিতৃপ্ত না হয়, তাহলে পুরো বিষয়টির যতোগুলি দিকই আপনার সামনে ভেসে ওঠে সেগুলোর উপর সামগ্রিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এটা জানার চেষ্টা করুন যে, এ জিনিসগুলোর সৃষ্টি, এগুলোর অস্তিত্ব, এগুলোর অবস্থা এবং এসবের গুণাবলীর মধ্যে এদের সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপকের কোন্ কোন্ গুণের চিহ্ন ও সাক্ষ্য চোখে পড়ে, তিনি কি প্রজ্ঞাহীন হতে পারেন? তিনি কি অজ্ঞ ও বেখবরও হতে পারেন? তিনি কি উদ্দেশ্য ও কল্যাণবিহীন অনর্থ কর্মপ্রয়াসী হতে পারেন? তিনি কি বেরহম, যালিম, এবং ধ্বংসপ্রিয় হতে পারেন? তাঁর কাজগুলি কি সাক্ষ্য দেয়? –তিনি কি গঠনশীল না বিপর্যয় সৃষ্টিকারী? তাঁর সৃষ্টিজগতে সততা, কল্যাণ ও গড়ার দিকটাই প্রধান, নাকি অশান্তি, ক্ষতি ও বিপর্যয়ের দিকটাই প্রবল? এসব বিষয়ে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে আপনি নিজেই চিন্তা করুন এবং নিজেই রায় কায়েম করুন। সামগ্রিকভাবে নিজের পর্যবেক্ষণে আসা চিহ্ন এবং অবস্থাগুলি দেখে যদি আপনি অনুভব করেন যে, তিনি জ্ঞানময় এবং ওয়াকেফহাল, কল্যাণের জন্য 'কর্ম সম্পাদনকারী এবং তাঁর কাজের মধ্যে ভাঙ্গা নয় নির্মাণই আসল, তাহলে আপনি নিজেই এ কথার জবাব পেয়ে যাবেন যে, এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে সব আংশিক নির্দশন ও অবস্থা দেখে আপনি পেরেশান, সেগুলি এখানে বর্তমান থাকার কারণ কি? সমগ্র সৃষ্টিকে যে প্রজ্ঞা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন, তাঁর কাজের মধ্যে যদি কোথাও বিপর্যয়ের দিক নযরে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে এর প্রয়োজন অবশ্যই আছে। প্রত্যেক ভাঙ্গা, গড়ার জন্যই। এই আংশিক বিপর্যয় ও অশান্তি, সামগ্রিক কল্যাণ ও শান্তির জন্যই। অবশ্য এটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন যে, তাঁর কল্যাণের বিশাল

পরিমণ্ডল আমাদের জ্ঞানের আবেষ্টনে সংকুলান না হওয়ার কারণ কি? বস্তুতঃ এ জটিল জিজ্ঞাসার উত্তরে চরম সত্য কথা এই যে, এ রহস্যের স্বরূপ অনুধাবন করা আমাদের জ্ঞানের অতীত। যার সরল অর্থ আমরা সেগুলো বুঝতেই পারি না। এই বাস্তব অবস্থাকে পরিবর্তন করা আমার এবং আপনার উভয়েরই সাধ্যের অতীত। এখন আমরা বুঝিনা বা বুঝতে সক্ষম নই, শুধু এ কারণেই কি আমাদেরকে বিরক্তি এতোটুকু আচ্ছন্ন করে ফেলবে যে, আমরা চির বিজ্ঞানময় ও সর্বজ্ঞ মালিকের অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসবো? আপনার যুক্তি হলো, প্রত্যেক খুঁটিনাটি ঘটনার যুক্তিসিদ্ধতা হয়, আমাদের বুঝে আসতে হবে, নতুবা সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই আমাদের মাথায় জাগতে পারে না; অন্যথায় আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবো যে, সৃষ্টিকর্তার পলিসির মধ্যে কোথাও কোনো গোলমাল আছে। কারণ তিনি আমাদের প্রশ্ন করার ক্ষমতা তো দিলেন অথচ জবাব পাওয়ার উপায় বাতলিয়ে দিলেন না। এই ধরনের যুক্তি আমার মতে, মেজাজের অস্থিরতার ফল। তাতে আপনি যেনো সৃষ্টিকর্তাকে এ কারণে শাস্তি দিতে চান যে, তিনি আগনাকে প্রত্যেক প্রশ্নে জবাব পাওয়ার যোগ্য করে তোলেননি কেন? আর সে শাস্তি হলো তাঁকে আপনার দোষারোপ করা যে, তাঁর পলিসির মধ্যে কোথাও ত্রুটি রয়েছে। ঠিক আছে, আপনি তাঁকে এ সাজা দিতে চান দিন, তবে আমাকে একথা বলুন দেখি, এতে আপনার কোন্ ধরনের তৃপ্তি হলো? এ দ্বারা আপনার কোন্ সমস্যার সমাধান হলো? মেজাজের এই অস্থিরতা দূর করা সম্ভব হলে আপনার নিজের দাবির অন্তরালে যে দুর্বলতা রয়েছে তা সহজেই অনুভব করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা এই যে, প্রশ্ন করার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, জবাব পাওয়ার বা জবাব দেওয়ার জন্য ততোটুকু যোগ্যতা যথেষ্ট নয়। সৃষ্টিকর্তা আপনাকে মানুষ বানিয়েছেন বলেই চিন্তাশক্তিও দিয়েছেন, আর মানুষ হওয়ার কারণে আপনাকে যে মর্যাদা দান করা হয়েছে, তার জন্যই আপনাকে এই যোগ্যতা দান করা জরুরি ছিলো। কিন্তু এই যোগ্যতার কারণে আপনার যতোখানি প্রশ্ন করার ক্ষমতা আছে সে পরিমাণ জবাব পাওয়ার ক্ষমতা আপনাকে দিতেই হবে– এটা সে খিদমতের জন্য জরুরি নয়, মানুষের মর্যাদায় থেকে আপনার জন্য যা আঞ্জাম দেয়া প্রয়োজন। এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে আপনি যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন, কিন্তু এমনও অনেক প্রশ্ন আছে যার জবাব পাওয়া ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনার জন্য সম্ভব নয় যতোক্ষণ পর্যন্ত আপনি মানুষের পর্যায় থেকে উলুহিয়াতের (সর্বময় ক্ষমতার মালিকের) স্তরে পৌঁছুতে না পারেন। আর কোনো অবস্থাতেই আপনি সে মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেন না। প্রশ্ন করার ক্ষমতা আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, কারণ আপনাকে মানুষ বানানো হয়েছে, পাথর, গাছপালা বা কোনো পশু বানানো হয়নি। তাই বলে আপনাকে সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাওয়ার উপায় করে দিতেই হবে এটা জরুরি নয়। কারণ আপনি মানুষ, খোদা নন। এতে

করে আপনি সৃষ্টিকর্তার পলিসির মধ্যে ত্রুটি আছে বলে মনে করলে সানন্দে করতে পারেন। *(তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উখরা ১৩৭৫ হি., ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ খৃ.)*

স্বপ্নে মহানবীর সা. যিয়ারত লাভ করা

প্রশ্ন মেহেরবানী করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত জানিয়ে তৃপ্ত করুন :

হুজুর সা.-এর হাদিস "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে যেনো প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখলো। কারণ শয়তান আমার অবিকল আকৃতি ধারণ করতে পারে না", অথবা তিনি অনুরূপ যা বলেছেন। –এ হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে যে কোনো চেহারা সুরতে দেখলে তাঁকেই দেখা হয়েছে বলে বুঝা যাবে কি? হুজুর সা. কে ইউরোপীয় বেশভূষায় দেখলেও কি তাঁকেই দেখা হয়েছে বলে মনে করতে হবে? জীবনের উপর এসব স্বপ্নের কোনো প্রভাবও পড়ে কি?

জবাব উক্ত হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তি নবী সা. কে তাঁর নিজ চেহারা ও আকৃতিতে দেখলো সে প্রকৃতপক্ষে তাঁকেই দেখলো। কারণ শয়তানকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি যে, সে নবী সা.-এর আসল রূপ ধরে এসে কাউকে ধোঁকা দিতে পারে। মুহাম্মদ বিন সীরিন রহ. ঐ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। ইমাম বুখারী কিতাবুত তাবীরে তাঁর একথা উদ্বৃতি করেন إذا رآه في صورته যখন কোনো দর্শক তাঁকে তাঁর আপন চেহারায় দেখে। আল্লামা ইবনে হাজর বিশুদ্ধ সনদ সহকারে রিওয়ায়েত করেছেন : যখন কোনো ব্যক্তি ইবনে সীরিনকে এসে বলতো, "আমি নবী সা. কে স্বপ্নে দেখেছি, "তিনি জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি তাকে কোন্ চেহারাতে দেখেছো?" এর জবাবে সে যদি এমন চেহারা ছবির বর্ণনা দিতো যা রসূলুল্লাহ সা. এর হুলিয়ার সঙ্গে মিলতোনা, তখন তিনি বলতেন, "তুমি রসূলুল্লাহ সা. কে দেখনি। হাকেম সহীহ্ সনদ সহকারে হযরত ইবনে আব্বাসের এই ধরনের জবাব দানের কথাই উল্লেখ করেছেন। বরং প্রকৃতপক্ষে এটাই সত্য যে, হাদিসের শব্দগুলিও এই অর্থই প্রমাণ করে। সহীহ্ সনদ সহকারে এ হাদিসটি আসল যতোগুলি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে সবগুলোতে এ অর্থই ব্যক্ত হয়েছে যে, শয়তান নবী সা.-এর আকৃতি নিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এটাও নয় যে, অন্য কোনো আকৃতিতেই সে মানুষকে ধোঁকায় ফেলতে পারে না। বরং ভিন্ন আকৃতি ধারণ করত: ধোঁকা দেয়া তার পক্ষে সম্ভব যে, লোকের মনে হবে যেনো রসূলুল্লাহকেই সা. সে দেখতে পাচ্ছে।

এর সাথে একথাও জেনে নেয়া জরুরি যে, যদি কোনো ব্যক্তি নবী সা. কে স্বপ্নে দেখে এবং তার নিকট থেকে কোনো হুকুম অথবা নিষেধাজ্ঞা পায় অথবা দীন ইসলাম সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে কোনো ইশারা পায়, সে অবস্থাতে সে স্বপ্নের

নির্দেশ মেনে চলা ততোক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয় যতোক্ষণ পর্যন্ত ঐ শিক্ষা কিংবা ইশারা কিতাব ও সুন্নাহ মুতাবিক হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা না যায়। আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূল সা. আমাদের জন্য দীনের ব্যাপার স্বপ্ন, কাশফ বা এলহামের উপর ছেড়ে দেননি। সত্য-মিথ্যা এবং শুদ্ধ-অশুদ্ধ এমন এক উজ্জ্বল কিতাব ও সুন্নহর মাধ্যমে পেশ করেছেন যার দ্বারা জাগ্রত এবং সচেতন অবস্থায় চোখে দেখে সঠিক পথ নির্ণয় করা যেতে পারে, হাঁ, কোনো স্বপ্ন, কাশ্ফ্ বা এলহাম, কিতাব ও সুন্নাহ্ মুতাবিক আছে বলে বুঝা গেলে আল্লাহর শুকর আদায় করুন যে, তিনি হুজুর সা.-এর দীদার লাভ করার তৌফিক দান করেছেন। কিন্তু এগুলির কোনো কিছু যদি কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করুন এবং দোয়া করুন যেনো তিনি এ ধরনের পরীক্ষা করা থেকে আমাদেরকে হেফাযত করেন।

এ দু'টি কথা না বুঝার কারণে বহু লোক গুমরাহ হয়েছে এবং হচ্ছে। আমার জানা মতে, এমন কিছু লোক আছে যারা শুধু এই কারণে একটি গুমরাহ্ মযহাবের অনুসারী হয়ে গেছে যে, তারা নবী সা. কে উক্ত মযহাবের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি সমর্থন দিতে অথবা তার প্রতি ভালোবাসার স্বপ্ন দেখেছেন। এই গুমরাহীতে পড়তেন না যদি তারা জানতেন যে, স্বপ্নে নবী সা.-এর নামে কাউকে দেখা মানেই নবী সা.-কে দেখা নয়। আর নবী সা.-কে তাঁর আসল রূপে স্বপ্নে দেখলেও এ দ্বারা কোনো শরঈ হুকুম বা দীনি ব্যাপারে কোনো ফয়সালা গ্রহণ করা যায় না।

কোনো কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, যদি শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য এটাই শর্ত হয় যে, কোনো ব্যক্তি হুজুর সা.- কে তাঁর আপন চেহারায় দেখবে, তাহলে এতে কেবল তাঁরাই উপকৃত হতেন যারা জীবদ্দশাতে রসূলুল্লাহ সা.-কে দেখেছেন। পরবর্তী কালের লোকেরা কেমন করে বুঝবে যে, তারা যে আকৃতি স্বপ্নের মধ্যে দেখেছে তা নবী সা.-এর নিজস্ব আকৃতি, নাকি অন্য কারো? তাহলে এ হাদিস দ্বারা তারা কি সান্ত্বনা পেলো? এর জবাব হলো, পরবর্তীকালের লোকেরা অবশ্যি, নিশ্চিতভাবে একথা মনে করতে পারে না যে, স্বপ্নে তারা যে আকৃতি দেখেছে তা নবীর সা. নিজস্ব আকৃতি। তবে এটা অবশ্যই তারা বুঝতে পারেন যে, স্বপ্নের অর্থ ও তাৎপর্য কুরআন ও সুন্নাহর অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল কি না? সামঞ্জস্য থাকলে এটাই বেশি আশা করা যায় যে, তারা স্বপ্নে হুজুর সা.-কেই দেখেছে। কারণ শয়তান তো কাউকে সত্য সঠিক পথে পরিচালনার জন্য অন্য রূপ ধারণ করবে না।

অস্পষ্ট জবাব

প্রশ্ন : কিছু লোকের ধারণা, আপনি সব সময় প্রশ্নের অস্পষ্ট জবাব দিয়ে থা.কন। এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা চাওয়া হলে আপনি রেগে যান অথবা অক্ষম হলে জবাব

দিতে অস্বীকার করে বসেন। আল্লাহ পাকের শুকর, এখনো আমি সে সব লোকদের ন্যায় ধারণার পক্ষপাতী নই। কারণ আমার জানামতে, আপনি প্রতিটি প্রশ্ন সঠিকভাবে এবং বিস্তারিত বুঝিয়ে জবাব দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ করুন, আমার এই নেক ধারণা যেনো কায়েম থাকে।

উপরের নিবেদন সামনে রেখে নিম্ন প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১. কোনো সুন্নত ত্যাগকারী ব্যক্তি অলি হতে পারে কিনা?

২. হযরত রাবেয়া বস্‌রী বিয়ের সুন্নত উপেক্ষা করলেন কেন?

৩. মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া সম্পর্কে বলা হয়, তিনি তাঁর পীর ও মুর্শেদ খাজা সাইয়েদ বাবা ফরীদউদ্দীনের একটি গোপন ইশারার কারণে চিরকুমার ছিলেন। আপনার বিবেচনায় কোনো পীর-মুর্শিদের সুন্নত বিরোধী ইশারা দেয়া এবং সে ইশারা অনুসারে কোনো মুরীদের পক্ষে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, বিয়ের সুন্নত ত্যাগ করা কতোটুকু সঠিক।

জবাব : আমি যুক্তিসংগত ও জরুরি প্রশ্নাবলীর জবাব সর্বাদাই বিস্তারিতভাবে দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু বাজে ও নিষ্প্রয়োজন প্রশ্নাবলীর জবাব এড়িয়ে যাওয়াই আমি সঠিক উপায় মনে করি। এখন আপনি নিজের প্রশ্নগুলির দিকেই খেয়াল করুন। প্রথম প্রশ্নটি করে আপনি যদি ক্ষান্ত হতেন তাহলে আমি সহজেই জবাব দিতে পারতাম যে, সুন্নত ত্যাগকারী কোনো ব্যক্তি অলি হতে পারে না। আবার আপনি তৃতীয় প্রশ্নের শেষ অংশটি যদি জিজ্ঞাস করতেন তাহলেও এই জবাব দেওয়া যেতো যে, কারো পরামর্শ অথবা নির্দেশে সুন্নত তরক করা জায়েয নয়। কিন্তু আপনি আরো অগ্রসর হয়ে দু'জন মরহুম বুযুর্গের মুকদ্দমাও দায়ের করে দিয়েছেন এবং আপনি চান আমি তাদের ব্যাপারে ফয়সালা শুনিয়ে দেই। এমতাবস্থায় আপনি নিজেই বলুন, আপনার নিজের এই বিতর্কের মধ্যে লিপ্ত হওয়া এবং আমাকেও তাতে জড়িয়ে ফেলা কতোটুকু সঠিক। আমার বা আপনার এটা জানবার এমন কি উপায় আছে যে, রাবেয়া বস্‌রী সুন্নতের এতো পাবন্দ হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করলেন না কোন্ কারণে? আর হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়াকে তাঁর উস্তাদ কেন বিশেষ কারণে বা অবস্থায় বিয়ে না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন? অথবা আদৌ পরামর্শ দিয়েছিলেন কি না? সমস্ত অবস্থা আমার সামনে নেই, আপনার সামনেও নেই। সব অবস্থা না জেনে আমি যদি ঐ বুযুর্গদের বিরুদ্ধে কোনো হুকুম জারি করি তাহলে বাড়াবাড়ি করে ফেলবো, আবার যদি তাঁদের কাজের ব্যাখ্যা দান করি তাহলে সুন্নত তরক করার কাজে অপর লোকদের উৎসাহ দানের দায়ে দায়ী হবো। বস্তুত: আসল ব্যাপারটা বুঝবার জন্য অতীতের বুযুর্গদের ব্যাপারে কোনো ফয়সালা করার প্রয়োজন নেই। আপনি নিজেই আমাকে বলুন, এধরনের প্রশ্ন এড়িয়ে না গিয়ে আমার উপায় কি? এই ধরনের প্রশ্ন ও জবাব সম্পর্কেই কুরআনে নবী সা. কে বলা হয়েছে?

فَلاَ تُمَارِ فِيْهِمْ اِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا وَّلاَ تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا

'তাদের ব্যাপারে শুধুমাত্র মামুলী ধরনের জবাব দাও, আর তাদের সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করো না।' (সূরা কাহফ : ২২) *(তরজমানুল কুরআন, জিলক্বদ, ১৩৭৫ হি., জুলাই ১৯৫৬ খৃ.)*

বাহাস ও মুবাহালা[১] করা

প্রশ্ন : মাদরাসা শিক্ষিত আমার জনৈক আত্মীয় আমাকে জিজ্ঞেস করলো, মাওলানা মওদূদী সাহেব তার বাহাস ও মুবাহালার চ্যালেঞ্জকে কবুল না করে এড়িয়ে যান কেন, অথচ নবী সা. নিজে ইহুদীদের সাথে মুবাহালায় নামার ফয়সালা করেছেন? নবীগণ এবং প্রথম যুগের ওলামায়ে কেরামও তর্ক বাহাসে অংশ নিয়েছেন। বিরোধীরা বার বার আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছেন অথচ তাদের সাথে আপনি মুবাহালাও করছেন না মুনাযারায়ও (বাকযুদ্ধে) অবতীর্ণ হচ্ছেন না। আমি সাধ্যানুযায়ী আমার সেই বন্ধুকে শান্ত করার চেষ্টা করেছি। আমি তাকে বলেছি, প্রত্যেক মুবাহালায় সাড়া দেয়া ফরয বা সুন্নত কোনোটাই নয়। এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে আপনার পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করে দিলে সেটা হবে আরো সান্ত্বনাদায়ক।

জবাব : আপনার যে আত্মীয় ইহুদীদের সাথে হুজুর সা. মুবাহালার দ্বারা ফয়সালা করেছেন বলে বলছেন তার জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ। বলাবাহুল্য, মুবাহালা করার ফয়সালা হুজুর সা. করেননি, বরং আল্লাহ তায়ালাই কল্লতে বলেছিলেন এবং এ মুবাহালা ইহুদীদের সাথে নয়, এটা ছিলো ঈসায়ীদের (খৃস্টানদের সাথে) নবী সা.-এর জীবনে মুবাহালার এই একটিমাত্র ঘটনাই পাওয়া যায়। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলাম কোনো বিবাদমান বিষয়ের ফয়সালার জন্য মুবাহালাকেই স্বতন্ত্র কোনো পদ্ধতি হিসেবে এমনভাবে সাব্যস্ত করেনি যে, যখনি কোনো কাফের বা কোনো মুসলমানের সাথে কোনো মতভেদ হবে তখনই সাথে সাথে মুবাহালার আহ্বান জানাতে হবে। আজকাল তো পেশাদার বাহাছকারীরা মুবাহালাকে রীতিমতো কুস্তির একটি মারপ্যাঁচ গণ্য করে নিয়েছে। কিন্তু গোটা ইসলামের ইতিহাসে মুবাহালার আহ্বান ও তা কবুল করার দৃষ্টান্ত পাওয়া খুবই কঠিন। সাহাবিদের মধ্যে বিরাট বিরাট মতভেদ হয়েছে, সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ার উপক্রমও হয়েছে। কিন্তু তবুও মুবাহালা করার অবস্থা কদাচিতই এসেছে। তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীন এবং মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যেও ভীষণ মতভেদ পয়দা হয়েছে, বড় বড় মাসলা মাসায়েলের ব্যাপারে বাহাছও হয়েছে, কিন্তু বাহাছের স্থলে মুবাহালার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীকালেও আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ

---

১. শরিয়তের পরিভাষায় বিতর্কিত বিষয়ের ফয়সালা আল্লাহর উপর সোপর্দ করত: মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সমবেতভাবে দোয়া করার নাম মুবাহালা।

প্রকাশ পেয়েছে, এমনকি পরস্পরকে কাফের, ফাসেক ইত্যাদিও বলা হয়েছে। তবুও কেউই মুবাহালার আশ্রয় গ্রহণ করেনি।

স্বয়ং নবী সা.-এর যুগে তাঁর বিরোধীদের সংখ্যা ছিলো অনেক। ইহুদী, নাসারা ও মুনাফিকরা প্রতি পদে পদে তাঁর বিরোধিতা করেছে, কিন্তু শুধু নাজরানের নাসারাদের কিছু লোক ব্যতীত অন্য কারো সাথে মুবাহালা করার প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। এতে স্বত:ই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুবাহালা এমন একটি বিচ্ছিন্ন পদ্ধতি ছিলো যা বিশেষ কিছু কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র নাজরানের নাসারাদের জন্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেছিলেন। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এটাকে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে এমনভাবে গ্রহণ করা হয়নি যে, প্রতিটি মতভেদপূর্ণ বিষয়ে এ পদ্ধতিকেই গ্রহণ করতে হবে। নাজরানের নাসারাদের ব্যাপারে এ পদ্ধতি বিশেষভাবে গৃহীত হলো কেন, বিভিন্ন হাদিসে তার কারণ যা জানা যায় তা হলো, নাজরানের যে তিনজন ধর্মীয় নেতা নবী সা.-এর কাছে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলো তাঁরা নিজেদের মনে তাঁর নবুয়্যতের সত্যতা স্বীকারকারী ও সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র নিজ জাতির মধ্যে নিজেদের মান-সম্ভ্রম ও প্রভাব ঠিক রাখার জন্য ঈমান গ্রহণ করতে বিরত থাকেন। পথিমধ্যে তাদের একজন নবী সা. সম্পর্কে অশোভন উক্তি করে বসলে অপর একজন তাকে বাধা দিয়ে বললো: সাবধান, ঐ ব্যক্তি (রসূল সা.) সম্পর্কে কোনো অশোভন উক্তি করো না। কারণ তিনি সেই রসূল যার আগমনবার্তা সম্পর্কে আমাদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এলমে গায়েব জানার কারণে তাদের দিলের এই গোপন অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন আর এটাও জানতেন যে, তারা অন্তরে তাঁকে নবী স্বীকার করার পর মুবাহালার আহ্বানে সাড়া দিয়ে لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ (মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক) বলে নিজেদের উপর কোনো অবস্থাতেই লা'নতের ভয়ংকর অভিশাপ চাপিয়ে নেওয়ার দু:সাহস দেখাতে পারে না। এই কারণে তাদের গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা এ প্রস্তাব পেশ করেন। এর ফলও তাই দাঁড়াল। নাজরানের প্রতিনিধিরা মুবাহালা করে লা'নত চেয়ে নিতে রাজি হলো না এবং তাদের মিথ্যাবাদী ও মুনাফিক হওয়া সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেলো ।

আপনার আত্মীয় এ প্রশ্নও তুলেছেন যে, আমি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নেমে যাই না কেন, অথচ নবীগণ ও আল্লাহর নেক বান্দারা বরাবর নিজেদের বিরোধীদের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন? এর জবাবে বলতে চাই, তাদের সে বিতর্ক বা বাহাছ যুক্তি প্রমাণাদি পেশ করা পর্যন্ত সীমাদ্ধ থাকতো। আর আজকালের পরিবেশে মুনাযারা বাহাছ বলতে সাধারণভাবে মোরগের লড়াইয়ের ন্যায় পরস্পর বিতর্কে জড়িয়ে পড়াকেই বুঝানো হয়। কোনো সমস্যার ব্যাপারে মৌখিক বা লিখিতভাবে কেউ কোনো যুক্তির অবতারণা করলে তাতে অংশ নিতে আমার

আপত্তি থাকে না। আর সম্ভব ও জরুরি মনে করলে এ ধরনের তর্ক-বাহাছে আমি অংশগ্রহণ করেও থাকি। কিন্তু পেশাদার তার্কিক ও ঝগড়াটেদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া আমার কাজ নয়। যাদের কাছে এ ধরনের বিতর্ক উপাদেয় বিবেচিত হয় তারা খুশি মনে এরূপ তৎপরতায় লিপ্ত হতে থাকুক। *(তরজমানুল কুরআন, জিলহজ্জ ১৩৭৫ হি., আগস্ট ১৯৫৬ খৃ.)*

প্রশ্নের আবরণে মিথ্যা দোষারোপ

প্রশ্ন : ১৩৭৫ হিজরী সনের রমযান মাসের তরজমানুল কুরআনে আপনি কোনো ব্যক্তির কিছু প্রশ্নের উল্লেখ করে তার জবাব দিয়েছেন। ১২ নং প্রশ্নের জবাবে আপনি লিখেছেন : এটা প্রশ্ন নয় বরং সুস্পষ্ট দোষারোপ, আমি আকার ইংগিতেও একথা লিখিনি:" আসলে উল্লিখিত প্রশ্নকারী বরাত দিতে ভুল করেছেন। আযীয আহমদ কাসেমী বি.এ., তাঁর রচিত "মওদূদী মাযহাব", ১ম খণ্ডে রবিউস সানী, ১৩৫৭ হি. সংখ্যার বরাতে আপনার সে উক্তি উল্লেখ করেছে। দয়া করে ঐ বরাতের সাহায্যে পুনরায় কথাগুলি যাচাই করুন এবং উদ্ধৃত কথাগুলি সঠিক হয়ে থাকলে তার জবাব দিয়ে বাধিত করুন।

জবাব : আমি গোড়াতেই সে প্রশ্ন দেখে বিস্মিত হয়েছি, যাতে আমি বলেছি বলে যেসব কথা উল্লেখ করা হয়েছে, মূলত তা আমার কলম দিয়ে কখনো বেরোয়নি। তাহলে এ দোষারোপের উৎস কি? এখন আপনার দেয়া বরাত খুঁজে বের করে দেখে জানলাম, মওলানা সদরুদ্দীন এসলাহীর একটি প্রবন্ধের কিছু কথা এনে আমার ঘাড়ে শুধু এই কারণে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সেটা তরজমানুল কুরআনে ছাপা হয়েছিল। অথচ নিয়ম হলো, প্রতিটি প্রবন্ধের লেখক নিজ লেখার জন্য দায়ী হবেন। তার প্রতিটি শব্দের জন্য ঐ পত্রিকার সম্পাদক দায়ী হতে পারে না, যাতে তা ছাপা হয়েছে। *(তরজমানুল কুরআন, মুহাররাম-সফর, ১৩৭৬ হি., অক্টোবর ১৯৫৬ খৃ.)*

স্ত্রী ও পিতামাতার অধিকার

প্রশ্ন : আপনার লেখা বইগুলো পড়েছি। ফলে মনের অনেক জটিল দ্বন্দ্বের সুরাহা হয়ে গেছে। কিন্তু একটা খটকা মনের মধ্যে প্রথম থেকে ছিলো এবং এখনো রয়ে গেছে। খটকাটা হচ্ছে, ইসলাম একদিকে মেয়েদের মর্যাদা যথেষ্ট উন্নত করেছে কিন্তু অন্যদিকে স্ত্রী হিসেবে কোনো কোনো বিষয়ে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। যেমন, তিনজন সতীনের ঝামেলা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া জায়েয গণ্য করেছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা নারী প্রকৃতির সাথে হিংসাও মিশিয়ে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে যেখানে স্ত্রীকে স্বামীর কর্তৃত্বের অধীন করা হয়েছে, সেখানে স্বামীকে আবার করে রাখা হয়েছে তার বাপ-মায়ের কর্তৃত্বের অধীন। এভাবে বাপ-মায়ের কথায় স্বামী তার স্ত্রীর একটি বৈধ আকাঙ্ক্ষারও বিনাশ সাধন করতে পারে। এসব ব্যাপারে

বাহ্যত স্ত্রীকে তো চার পয়সার একটি পুতুলের চাইতে বেশি কিছু মনে হয় না। আমি একটি মেয়ে। স্বাভাবিকভাবে আমি মেয়েদের আবেগ ও অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করছি। মেহেরবানী করে এ ব্যাপারে যুক্তিসংগত জবাব দিয়ে আমার মনের দ্বন্দ্ব দূর করতে সহায়তা করবেন।

জবাব : সংসার জীবনে মেয়েদের স্থান অপেক্ষাকৃত নিচে বলে আপনি যে ধারণা প্রকাশ করেছেন, তার পেছনে আপনার যুক্তি দু'টি। একটি হচ্ছে, পুরুষ চারটি বিয়ে করার অনুমতি পেয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, স্বামীকে বাপ-মায়ের কর্তৃত্বের অধীনে রাখা হয়েছে। এর ফলে সে অনেক সময় বাপ-মায়ের সন্তুষ্টির জন্য নিজের স্ত্রীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দেয়। এর মধ্যে প্রথম কারণটি নিয়ে চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন, তিনটি সতীনের ঝামেলা বরদাশত করা মেয়েদের জন্য যতোটা কষ্টকর, তার চাইতে অনেক বেশি কষ্টকর হবে যখন সে দেখবে, তার স্বামীর কয়েকটি প্রেয়সী ও উপপত্নী রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতির যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য ইসলাম পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি করার ব্যাপারে একজন পুরুষ যতো বেশি নির্ভীক হয়, বিয়ে করার ব্যাপারে ততোটা হতে পারে না। কারণ বিয়ে করলে স্বামীর দায়িত্ব বেড়ে যায় এবং নানা ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। আসলে এটা মেয়েদের জন্য একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পুরুষদের জন্য নয়। পুরুষদের অবাধ সুযোগ সুবিধা দেবার পদ্ধতির পরীক্ষা নিরীক্ষা তো আজকাল পাশ্চাত্যের সমাজে চলছে। সেখানে একদিকে বৈধ সতীনদের পথ রোধ করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে অবৈধ সতীনদের হাত থেকে স্ত্রীকে বাঁচাবার কোনো পথই করা হয়নি। তবে অবৈধ সতীনদের চাপ সইতে না পারলে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেবার জন্য স্ত্রী আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে। এ ছাড়া স্ত্রীর জন্য আর দ্বিতীয় কোনো পথ সেখানে খোলা নেই। আপনি কি মনে করেন এর ফলে স্ত্রীর বিপদ কিছু কমে গেছে? যেসব স্ত্রীর কোল খালি আছে, ছেলেপিলে হয়নি, তারা হয়তো সতীনদের জ্বালা থেকে বাঁচার জন্য তালাককে সহজ পথ মনে করতে পারে, কিন্তু সন্তানের মায়ের জন্যও কি এ পথ এতোই সহজ?

দ্বিতীয় যে অভিযোগটি আপনি করেছেন, তার জবাবে সংক্ষেপে বলতে চাই সম্ভবত এখনো আপনার কোনো সন্তান হয়নি অথবা হয়ে থাকলেও আপনার কোনো ছেলের এখনো বিয়ে হয়নি। এ বিষয়টিকে আপনি এখনো শুধুমাত্র বধূর দৃষ্টিতে বিচার করছেন। যখন আপনি নিজের ঘরে বউ আনবেন এবং ছেলের মা ও বউয়ের শ্বাশুড়ীর দৃষ্টিতে এ বিষয়টা বিচার করবেন, তখন ব্যাপারটা আপনি ভালোভাবে অনুভব করতে পারবেন। তখন স্ত্রীর অধিকার কতোটুকু এবং মা-বাপের অধিকার কতোটুকু হওয়া উচিত, তা আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন।

বরং আজ আপনি যেসব অধিকার নিয়ে আপত্তি তুলেছেন, সেদিন হয়তো আপনি নিজেই সেগুলি চাইবেন। *(তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৫৬ খৃ.)*

হাদিস সমর্থিত যিক্‌র আয্‌কার

প্রশ্ন : আজ আপনার খিদমতে একটি মানসিক দ্বন্দ্ব পেশ করার সাহস করছি। আশা করি, এ বিষয়ে আপনি আমাকে পুরাপুরি সাহায্য করবেন। ঘটনা হলো, আমি বেরলভী বংশের এক ব্যক্তি। ছোটবেলায় যখন আমার বুদ্ধি পরিপক্ক হয়নি, তখন আমার আব্বাজান সুলতান বাহু রহ. এর খলিফা সুলতান আমীর মরহুমের হাতে আমাকে বায়আত করিয়ে ছিলেন।

হযরত সুলতান বাহু ঝং জেলার এক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন; আর তিনি ছিলেন হযরত আওরংজেব আলমগীরের সমকালীন। তিনি দীন ইসলামের প্রচার কাজে পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করেন এবং জিহাদেও শরীক হন।

গদীনশীন সুলতান আমীর মরহুম যাবতীয় ফরয কাজের পাবন্দ এবং সব ধরনের হারাম থেকে বিরত থাকা একজন উচ্চ পর্যায়ের পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। দরবারে গেলে তিনি সুন্নাহর নিয়ম অনুযায়ী মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন। লোকেরা দরবারে তাওয়াফ করা শুরু করলে দরবারের মধ্যে তিনি এমনভাবে একটি প্রাচীর নির্মাণ করালেন যে, সেখানে তাওয়াফ করা অসম্ভব হয়ে গেলো । তাঁর এসব কাজের দরুন এবং তাঁর পরহেযগারীর কারণে তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিলো। কিন্তু আফসোস কিছু পাওয়ার পূর্বেই আমার অপ্রাপ্ত বয়সেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়। তারপর আরেকজন বুযুর্গ থেকে কিছু অজীফা হাসিল করে আমি নিয়মিতভাবে আমল করতে থাকি। ইতিমধ্যে ১৯৪৩ সালে আমি জামায়াতের রুকনিয়াত লাভ করি।

তারপর থেকে আমার মধ্যে এক দারুণ দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে অন্তরের প্রশান্তির জন্য রুকনিয়াত এবং এর দাবি পূরণই যথেষ্ট মনে হাচ্ছিলো। কিন্তু নিজের মনোযোগ সংযত ও কেন্দ্রীভূত করার জন্য কিছু দোয়া দরুদ ও অজীফার উপর আমল করার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বুযুর্গের কাছে ধর্না দেই। কিন্তু অন্য সব ধরনের পরহেযগারী থাকা সত্ত্বেও ইকামতে দীনের বুনিয়াদী দাবি পূরণের ব্যাপারে তাঁদের উদাসীনতা আমার অন্তর থেকে তাঁদের ব্যক্তিত্বের সমস্ত প্রভাবকে কমিয়ে দেয়। দীর্ঘদিন থেকে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আটক রয়েছি। কোনো কোনো বন্ধুর সাথে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছি; অবশেষে এ বিষয়ে আপনার শরণাপন্ন হওয়ার জন্য মন ঝুঁকে পড়লো। আমার আরয, সুন্নাহ সমর্থিত এমন কিছু দোয়া দরুদ অজীফা আমার জন্য ঠিক করে দিন যা

১. আমার মেজাজের উপযোগী হয়,

২. আর যা পনের, বিশ বা পঁচিশ মিনিটব্যাপী নিজের মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আমার সহায়ক হয়। আমি পুরাপুরি আশা রাখি যে, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।

জবাব : যিক্‌রের ব্যাপারে দু'টি জিনিস সামনে রাখা দরকার : এক, অস্বাভাবিক ও কৃত্রিমতাপূর্ণ যিক্‌র না হওয়া উচিত, বরং মনের আকর্ষণ ও আগ্রহ সহকারে যিক্‌র হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, নিজের পছন্দ ও আন্তরিক চাহিদা মুতাবিক যিক্‌র বাছাই করতে হবে। যিক্‌র তো তাই যার সাথে নিজের আন্তরিক সম্পর্ক অনুভব করা যায় এবং সেই সময়েই যিক্‌র করুন যখন পূর্ণ মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে আপনি তা করতে পারেন। এই দু'টি কথা মনে রেখে আপনি মেশকাত শরীফের তিনটি স্থান বিশেষভাবে অধ্যয়ন করুন কিতাবুস সলাতের মধ্য থেকে বাবুয যিক্‌র বা'দস্ সলাত এবং বাবু সলাতিল লাইল, বাবুল কাসদি ফিল আমল এবং কিতাবুদ দাওয়াত সম্পূর্ণটুকু। এ অধ্যায়গুলি পড়াশুনা করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, নবী সা. যিক্‌র ও দোআ কিভাবে করতেন এবং অপরকে এ প্রসঙ্গে কি কি করতে বলতেন। এগুলির মধ্যে থেকে আপনার পছন্দমত দোয়াগুলি বেছে নিন। *(তরজমানুল কুরআন, শা'বান-রমজান ১৩৭৬ হি., জুন ১৯৫৭ খৃ.)*

উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আগমনে ব্যস্ততার প্রদর্শনী

প্রশ্ন : আমি একটি ওয়ার্কশপে কর্মরত আছি, কিন্তু কখনো কখনো বাইরেও সফরে যেতে হয়। এ সময়ে আমাদের কাজ খুবই কম থাকে। এ কারণে অধিকাংশ সময় আমাদেরকে একেবারেই বেকার বসে থাকতে হয়। কিন্তু যখনই আমরা জানতে পারি, আমাদের কোনো উর্দ্ধতন কর্মকর্তার এদিক দিয়ে অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে অথবা অতিক্রম করছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা আশপাশে দাঁড়িয়ে যাই এবং এমনভাবে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠি যেনো তিনি অনুভব করতে পারেন যে, আমরা কোনো কিছু করছি। তিনি চলে গেলে আমরা পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে আরামে বসে যাই। আবার কোনো কোনো সময় এমনও মনে হয় যে, কি জানি কর্মকর্তার মনে আমাদের সম্পর্কে কি ধারণা সৃষ্টি হলো। যদিও আমি নিজে এ ধরনের প্রদর্শনী খুব কমই করি। অবশ্য কখনো কখনো বাধ্য হয়ে আমিও ওরকম করে বসি। যখনই এ অবস্থার সম্মুখীন হই, মনটা বড় পেরেশান হয়ে যায়, খুবই ঘাবড়ে যাই এ কথা মনে করে যে, কি জানি এ অভিনয়ের জন্যও হয়ত আমাকে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে। মেহেরবানী করে এ বিষয়ে আমাকে সঠিক পথনির্দেশনা দান করবেন।

জবাব : আপনার কর্তব্য কাজে আপনি জেনে বুঝে যদি গাফলতি না করেন, বরং কাজ না থাকার কারণে বেকার বসে থাকেন এবং কোনো অফিসারের আগমন

মুহূর্তে শুধুমাত্র এজন্য ব্যস্ততা দেখান যে, তার পক্ষ থেকে অসন্তুষ্ট হওয়ার আশংকা আছে, তাহলে এমতাবস্থায় এ ধরনের অভিনয় করাতে কোনো ক্ষতি নেই; তবে জেনে বুঝে কাজে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ ধরনের প্রদর্শনী জায়েয হবে না। এর সাথে একথাও মনে রাখবেন যে, এমনও একজন কর্মকর্তা আছেন যিনি সদাসর্বদা এবং সর্বাবস্থায় আপনাকে দেখছেন এবং যাঁকে মিথ্যা কোনো প্রদর্শনী দ্বারা ধোঁকা দেওয়া যেতে পারে না। উপরন্তু সাজা দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর সমস্ত অফিসারদের অপেক্ষা বেশি। যখনই ছোট ছোট অফিসারের ভয়ে আপনি এবং আপনার সঙ্গিরা ঘাবড়িয়ে যান সে সময়ে সেই শ্রেষ্ঠ অফিসারকেও একটু স্মরণ করে নেবেন। *(তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল আখের ১৩৭৭ হি., ১৯৫৮ খৃ.)*

অধিক মুসীবতে একজন মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন : আমার তৃতীয় ছেলে পৌনে চার বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ পাক তাকে রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। এখানে এসে প্রথম দু'টি ছেলে মারা যায়, এটি ছিলো তৃতীয়। এ সময়ে এক ব্যক্তি সন্দেহ সৃষ্টি করে দিলো যে, একে জাদু করা হয়েছে। তার জন্মলগ্ন থেকেই কুরআনে করীমের বিভিন্ন স্থান থেকে তেলাওয়াত করে ঝাড়ফুক করছিলাম। এতে পার্থক্য শুধু এতোটুকু হয়েছে যে, প্রথম দুই ছেলে পৌনে দুই বছর বয়সে মারা যায় এবং এই তৃতীয়জন মারা গেলো পৌনে চার বছর বয়সে। আমার প্রশ্ন হলো, জাদুমন্ত্র তো কয়েকটি শব্দসমষ্টি মাত্র। কুরআনে পাকেরও কিছু শব্দ সেগুলির আছর নষ্ট করার জন্য বর্তমান আছে, সেগুলি পড়ে তো দম করা হয়েছেই। তাছাড়া আরো বেশ কিছু দোয়া দুরুদও পড়ে তদ্বীর করা হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাহাজ্জুদের সময়ে যথেষ্ট কান্নাকাটিও আল্লাহর কাছে করেছি। অথচ আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা হাজির নাজির এবং তিনি সর্বক্ষণ শুনছেন ও দেখছেন। এমতাবস্থায় হক তায়ালা কি জাদুর প্রভাব ছিন্ন করার ব্যাপারে নিরুপায় হয়ে গেলেন? লোকেরাও কবরবাসীদের নাম লিখে তার তাবীজ করে এবং পায়ে কড়া পরিয়ে সন্তানদের বাঁচিয়ে রেখেছে, কিন্তু আমি এটাকে শিরক মনে করে সেদিকে মন দেইনি, তবুও আমাকে রীতিমত দু:খ ভোগ করেই যেতে হলো। উপর্যুপরি তিন তিনটি আঘাত পেলাম। দয়া করে এই শোক দু:খের চরম মুহূর্তে আমাকে পথ প্রদর্শন করুন।

জবাব : আপনার ছেলের মৃত্যু সংবাদে বড়ই আফসোস হলো, আর তার থেকে বেশি আফসোস হলো একথা জানতে পেরে যে, ইতিপূর্বে আরো দু'টি পুত্র সন্তানের বিয়োগ ব্যথা আপনাকে পোহাতে হয়েছে। সন্তানদের উপর্যুপরি মৃত্যুশোক জনিত জ্বালা আপনার ও আপনার বেগমের জন্য কতো যে অসহনীয় তা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের উভয়কেই সবর করার তৌফিক দিন এবং সান্ত্বনা দান করুন।

আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুভব করলাম আপনি উপর্যুপরি আঘাত পেয়ে অস্বাভাবিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। যদিও এমন অবস্থায় নসীহত করা কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেয়ার নামান্তর এবং প্রচণ্ড দু:খ বেদনার অবসান না হওয়া পর্যন্ত কিছু না বলাই সমীচীন। কিন্তু তবুও আমার ভয়, এই কঠিন সংঘাতে আপনার নেক আকীদাগুলি বিপর্যস্ত না হয়ে পড়ে। তাই বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে যে, বিপদ মুসীবত এবং দু:খ বেদনা যতো গভীরই হোক না কেন, এমতাবস্থায় মুমিন ব্যক্তির কর্তব্য হলো, সে যেনো নিজের ঈমানের উপর এবং আল্লাহ পাকের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে কোনো প্রকারেই আঘাত আসার সুযোগ না দেয়। এ দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার অবস্থার মধ্যে ফেলে পরীক্ষা করেন। দু:খ বেদনা আসে, সুখ শান্তিও আসে, বিপদ আপদ আসে, আরাম আয়েশও নসীব হয়। ক্ষতি লোকসান হয়, আবার প্রচুর মুনাফাও ভাগ্যে জুটে। এ সবকিছুই জীবনের নানা পরীক্ষা এবং আমাদেরকে এ ধরনের সমস্ত পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে হবে। আমাদের জন্য এর থেকে বড় বদনসীব আর কিছুই হতে পারে না, যদি আমরা বিপদ মুসীবতে এতোটা বেশি পেরেশান হয়ে যাই যে, নিজেদের ঈমান আকীদাকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে ফেলি। কারণ, এর দ্বারা তো দীন ও দুনিয়া উভয় জায়গাতেই ক্ষতির মধ্যেই পতিত হবো। আপনি যে দু:খ বেদনার সম্মুখীন হয়েছেন তা অবশ্যই হৃদয়বিদারক, তবুও এ অবস্থার মধ্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করার চেষ্টা করুন এবং মুশরিকদের মতো কোনো চিন্তা-ভাবনা, অথবা শিরকের প্রতি ঝুঁকে পড়া, অথবা আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ অন্তরের মধ্যে আসতে দেয়া সমীচীন হবে না। আমরা এবং আমাদের যা কিছু আছে সবই একমাত্র আল্লাহর, এসব কিছুর মালিকানাও তাঁরই এবং তাঁরই এ সব কিছুর উপর একমাত্র কর্তৃত্ব। তাঁর কাছে আমাদের কোনো পাওনাও নেই এবং কোনো বিষয়ে জোরও নেই। যা চাইবেন তিনি দেবেন, আবার যা চাইবেন তিনি ছিনিয়ে নেবেন এবং যে অবস্থাতে খুশি, সেই অবস্থাতেই তিনি আমাদেরকে রাখবেন। আমরা তাঁর উপর এ শর্তে ঈমান আনিনি যে, তিনি আমাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতেই থাকবেন এবং আমাদেরকে কোনো দু:খ-বেদনা দান করবেন না। বিপদ মুসীবতের কারণে হতাশ হয়ে অন্য কোনো আস্তানায় ধর্না দেয়া ও অর্ঘ পেশ করা দাসত্ব ও বন্দেগীর নিদর্শন হতে পারে না।

অন্য কোনো আস্তানাতে আসলে নেইও কিছু। বাহ্যত সেখানে কিছু পাওয়া গেলেও তা আল্লাহ পাকেরই দান। তবে ওখানে ধর্না দিয়ে যা কিছু পাওয়া যায়, তা কেবলমাত্র ঈমানকে বিকিয়ে দিয়েই পাওয়া যেতে পারে। আবার, এমন কিছু হতভাগ্য ব্যক্তিও আছে, যারা এভাবে ঈমান হারায় অথচ সেখান থেকে উদ্দেশ্য

হাসিলও করতে পারে না। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই এ ধরনের কোনো খেয়াল মনে স্থান দেবেন না ও সুখে দু:খে সর্বাবস্থায় ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ পাকের রশি ধরে থাকুন।

জাদুটোনা বা বাণ মারার মধ্যে আদৌ কোনো শক্তি নেই, আল্লাহ তায়লার শক্তিই সবকিছুর উপর শক্তিমান। আল্লাহ তায়ালার নিকটেই প্রার্থনা করতে থাকুন ও তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে থাকুন। আশা করা যায়, শেষ পর্যন্ত আপনি তাঁর সাহায্য পেয়ে যাবেন এবং আপনাকে এবং আপনার সন্তানদেরকে কোনো বালা মুসীবত স্পর্শ করতে পারবে না। *(তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল আখির ১৩৭৭ হি.)*

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কতিপয় বুনিয়াদী প্রশ্ন

প্রশ্ন : নিবেদনকারী শিক্ষা ও শিক্ষকতার সাথে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত এবং বর্তমানে এখানে শিক্ষারত। এখানকার শিক্ষা বিশারদদের সাথে প্রায়ই শিক্ষা বিষয়ক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। ফলে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরমায়েশ অনুযায়ী এ অধম একটি প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করছে, এর মাধ্যমে একথা জানানোই উদ্দেশ্য যে, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের শিক্ষার প্রয়োজন পাকিস্তানের শিক্ষার প্রয়োজন থেকে অবশ্যই ভিন্ন প্রকৃতির। পাকিস্তানের শিক্ষার প্রয়োজন ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে পূরণ হতে হবে। কোনো চিন্তাভাবনা না করে যদি আমাদের দেশে আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাহলে অপূরণীয় ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

আপনার অধিকাংশ পুস্তক পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে এবং এখন সেগুলি আমাকে বাস্তবক্ষেত্রে পথ প্রদর্শন করছে। এরই মধ্যে দু'একটি প্রশ্ন এমন ধরনের জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে যে, সে বিষয়ে আপনার সরাসরি পথ নির্দেশনা চাওয়া জরুরি মনে করি। আশা করি সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যেও এর জবাবের জন্য একটু সময় বের করবেন।

আমার নিবেদনগুলি ধারাবাহিকভাবে ব্যক্ত করছি :

১. যেসব দেশে শিল্পের উন্নতি হয়েছে, সেখানে অনিবার্যভাবে সাধারণ নৈতিকতার অবনতি ঘটেছে। জাতীয় কারখানাগুলির প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে নারী পুরুষ ও শিশুরা পর্যন্ত মেশিনের যন্ত্রাংশে পরিণত হয়ে গেছে। ফলে এসব দেশে কিছু চিন্তাবিদও জন্ম নিয়েছে, যেমন আমেরিকায় জন ডেভি। তাঁরা নতুন জীবন পদ্ধতিকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন দিলেন, প্রাচীন ঐতিহ্যের ভুল আখ্যা দিলেন এবং সমাজের মূল্যবোধকেই পরিবর্তন করে ফেললেন। পাকিস্তানে একদিকে শিল্পের উন্নতি প্রয়োজন, অপরদিকে ইসলামি ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ কায়েম রাখাও দরকার। মেহেরবানী করে বলুন, বাহ্যত পরস্পর বিরোধী এহেন দুটি উদ্দেশ্য ও ধারা এক সাথে কি করে হাসিল করা যেতে পারে? যান্ত্রিক

পরিবেশে রূহকে কেমন করে সজীব রাখা যায়? পরিবর্তন অবশ্যই দরকার, কিন্তু তা কোন সীমা পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে?

২. ইসলামি শিক্ষা কি ধরনের হতে হবে? শিক্ষা কি সকলের জন্য? অবৈতনিক হবে কিনা? স্কুলের পক্ষে যে আদর্শ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা উচিত, তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি হবে? আমাদের দীনি মাদরাসাগুলি এই ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলছে কি?

৩. আদর্শ ইসলামি পরিবারের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? বর্তমানের পারিবারিক জীবনকে ইসলামি জীবন বলা যাবে কি? শহর এবং পল্লীতে কি একই পদ্ধতির পারিবারিক জীবন হবে? বর্তমানের পারিবারিক জীবনে প্রাচীন হিন্দুস্তানী ঐতিহ্য কতোখানি প্রভাব বিস্তার করে আছে?

জবাব : জেনে খুশি হলাম যে, আপনি আমেরিকায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করার কাজে ব্যাপৃত আছেন। যে সকল বিষয় সম্পর্কে আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, সেগুলি বাস্তবিকই মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা রাখে। সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আমার মতামত পেশ করে দিচ্ছি।

মানব সভ্যতায় বস্তুগত পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত সেই পরিবর্তনের ন্যায়, যা কোনো মানুষের দেহে শৈশব থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব এবং প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়ে পরিলক্ষিত হয়। আত্মা ও শরীরের সঙ্গে এগুলির গভীর সম্পর্ক অবশ্যই আছে। কিন্তু এসব পরিবর্তনের ফলাফল একটা সুনির্দিষ্ট ও অকাট্য ছকে বাঁধা নয় যে, সকল মানুষের দেহের উপর তা সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করবে। এতে বরং ব্যক্তিবিশেষে এবং মানবগোষ্ঠীর ও দলবিশেষেও বিরাট পার্থক্য হয়ে থাকে, যার মধ্যে আরো বহু ধরনের প্রতিক্রিয়া কার্যকর থাকে। কোনো ব্যক্তি যদি উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক সুন্দর পরিবেশ পায়, যা তার মধ্যে উন্নত জীবনধারা গড়ে তোলার সাথে সাথে সুন্দর ও মজবুত চরিত্র গড়ে তুলতে সহায়ক হয়, তাহলে শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করার সময় তার স্বভাবে যে তেজস্বীতা সৃষ্টি হয়, সেটা ভুল পথে না গিয়ে উত্তম ও গঠনমূলক পথ বেছে নেয় এবং এই উন্নতি তার বার্ধক্য পর্যন্ত সঠিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু শিক্ষার ভিত্তি যদি সঠিক চিন্তাধারার উৎকর্ষ সাধনকারী কোনো দর্শনের উপর স্থাপিত না হয় এবং এর সাথে কোনো বদ অভ্যাস ও অসৎ চরিত্র গঠনকারী প্রশিক্ষণও হয়ে যায়, তদুপরি সামাজিক কাঠামোও যদি ধ্বংসাত্মকই থেকে যায়, তাহলে চেতনার উন্মেষ ঘটার সাথে সাথে একজন বাচ্চাবয়সী মানুষ অপরাধী হয়ে গড়ে ওঠে, চোর, ডাকাত হিসেবে সে যৌবনে পদার্পণ করে এবং বার্ধক্য পর্যন্ত তার অপরাধ প্রবণতা বাড়তেই থাকে। এইভাবে মানব সভ্যতায় শিল্পবিপ্লবের মতো যেসব পরিবর্তন এসেছে তার নিজের মধ্যে আসলে খারাপ কিছু ছিলো না,

বরং তার মধ্যে মানব কল্যাণের অনেক উপকরণ বর্তমান ছিলো। যেমন, যৌবনের আগমন স্বত:ই কোনো দোষের কিছু নয়, বরং এটা আপন সত্তার দিক দিয়ে মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ। কিন্তু দোষ তো ছিলো সে জীবনদর্শনের, যা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে গড়ে উঠেছিলো। তা মন মস্তিষ্ক বিগড়ে দিলো মন মগজের বিপর্যয় দ্বারা চরিত্র ধ্বংস হলো এবং এই চারিত্রিক বিপর্যয় সেই সামাজিক কাঠামোকে আরো বেশি বিগড়ে দিলো, যা সামন্ত প্রথার সময় থেকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে নেমে যাচ্ছিলো। এমতাবস্থায় শিল্প বিপ্লবের শক্তি হাতে এসে যাওয়ায় জাতির পর জাতি পেশাদার অপরাধী হিসেবে গড়ে উঠলো। আর বর্তমানে আণবিক শক্তির অধিকারী হয়ে এসব জাতি সভ্যতার সকল প্রদর্শনী সত্ত্বেও ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে যেসব দার্শনিক এই ধ্বংসাত্মক অবস্থার মধ্যে নিশ্চিন্ত থাকার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার মতবাদ দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং বিপর্যস্ত কাঠামোর সঙ্গে সংগতি রাখার উদ্দেশ্যে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ পরিবর্তনের যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তার উদাহরণ হলো সেই বন্ধুরূপী শত্রুর ন্যায়, যে বিপর্যয়মুখী একটি বাচ্চাকে প্রথমবারে পকেট মারার কাজে বাহবা দেয় এবং তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলে, এই পকেটমারার কাজটা একটি উন্নত মানের শিল্পকলা, এর নিন্দাকারী দল নিছক সেকেলে ও প্রাচীনপন্থী।

বস্তুগত উন্নতির উদ্দেশ্য এবং ইসলামি জীবনের মূল্যবোধের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈপরিত্য আছে বলে আমি মানতে রাজি নই। ইউরোপে শিল্পের উন্নতির ফলে যে বিশেষ সভ্যতা ও তামাদ্দুন গড়ে উঠেছে, তা নিশ্চিতভাবে সে বিপ্লবের ফলই হতে হবে এবং যখন যেখানেই এ ধরনের উন্নতি সাধিত হবে সেখানে একই ধরনের সভ্যতা গড়ে উঠবে বা উঠতেই হবে, একথাও আমি স্বীকার করি না। এভাবে সে ধারণাও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় যে, মানুষের আত্মা চরকা, চাকা ও যাঁতার সাথে কাজ করে সজীব থাকতে পারে বটে কিন্তু মেশিনের প্রকৃতিই এমন যে, এর পাল্লায় পড়লে সেই আত্মাই নির্জীব হয়ে যায়। আমার বিবেচনায়, মনমগজকে যদি সঠিক জীবনদর্শনের পরিচালনায় গড়ে তোলা হয়, চরিত্র গঠনের জন্য যদি একটি উত্তম চারিত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যদি একটি ইনসাফপূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামো বর্তমান থাকে, তাহলে শিল্পবিপ্লব এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি সাধনায় প্রাপ্ত শক্তির ব্যবহার দ্বারা এখানকার পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তামাদ্দুন থেকে বুনিয়াদীভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন অপর এক সভ্যতা ও তামাদ্দুন গড়ে তোলা যাবে এবং তা আরো সুন্দর ও শক্তিশালী এবং মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই আমাদেরকে এ ধরনের জীবনদর্শন এবং চারিত্রিক ব্যবস্থা দিতে পারে এবং বাস্তবে তার প্রাধান্যকে মেনে নিয়ে যদি তার নির্দেশ মুতাবিক

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলি ও জনগণকে শিক্ষা দান করি, আর সামাজিক কাঠামোকেও ঢেলে সাজাই, তাহলেই ঐ শর্তসমূহ পূর্ণ হতে পারে, যা বস্তুগত উন্নতির সাথে সাথে একটি সুন্দর সভ্যতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমি উপরে আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে ইহুদিবাদ প্রথম থেকে নৈরাশ্যজনক ছিলো। খৃষ্টবাদ নবযুগের শুরুতেই অকেজো প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং বৌদ্ধ মতবাদও আদৌ এ ময়দানে কোনো ভূমিকাই রাখেনি। এবার রইলো নতুন মতবাদসমূহ। সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও পুঁজিবাদ, এগুলি তো নিজ নিজ ভালো মন্দ দিকগুলি সবই খোলাখুলিভাবে সামনে রেখে দিয়েছে এবং তাদের ভালো দিকগুলির সাথে মন্দ দিকগুলোর কি সম্পর্ক, পৃথিবী সেটা বাস্তব দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে। নতুন এমন কোনো দর্শনও সামনে আসেনি যা কোনো সভ্যতার বুনিয়াদ হওয়ার যোগ্য হতে পারে। এ বিষয়ে একমাত্র পাশ্চাত্যবাসীরাই চিন্তা-ভাবনা করে এবং নিজেদের তাহ্‌যীব তামাদ্দুনের বিষাক্ত ছোবলে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও তারা এতে পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত নয়। বরং এর সীমারেখা থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করার মতো যোগ্যতাও তাদের নেই। ওরা শুধু আংশিক সংশোধন দ্বারাই কাজ চালিয়ে নিতে চায়, আর এগুলির অধিকাংশের প্রস্তাবিত সংশোধন আরো বেশি ধ্বংসাত্মক।

যেসব কারণে ইসলামকে যুক্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আমি শুধু যথেষ্টই মনে করি না, বরং মানবতার জন্য একে আমি আশার আলো মনে করি, আমার পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত চিঠিতে তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা খুবই মুশকিল। অবশ্য ঐ যুক্তিগুলির পুনরুক্তির প্রয়োজনও নেই। কারণ, সেগুলি আমি আমার বিভিন্ন পুস্তকে বর্ণনা করেছি। যথাঃ ইসলামি সংস্কৃতির মর্মকথা ('ইসলামি তাহ্‌যীব আও উস্‌কে উসূল মবাদী') মুসলমান এবং বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত ৩য় খণ্ড 'মুসলমান আওর মউজূদা সিয়াসী কাশমাকাশ' ইত্যাদি। এছাড়া আমার বিভিন্ন প্রবন্ধেও এ বিষয়ে ইংগিত করা হয়েছে।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবঃ এযুগে শিক্ষাদানের ইসলামি পদ্ধতি কি হবে, সে বিষয়ে আমি আমার রচিত 'তালীমাত' গ্রন্থে মোটামুটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি, গ্রন্থখানা আপনি পাঠ করুন। আমার মতে নারী পুরুষ প্রত্যেক শিশুকেই এ শিক্ষা দান করা উচিত। তবে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করে নেয়া উচিত। এ পর্যায়ে প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক আর ন্যূনতম মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাক্রম অনিবার্য থাকা দরকার। পরবর্তী স্তরসমূহে বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্নদেরকে সুযোগ দান করে তাদের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থাও রাখা প্রয়োজন। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে আদর্শ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা উচিত, তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে চারটি ইসলামি পরিভাষায় ব্যক্ত করা যায়ঃ মুমিন হতে

হবে, মুসলিম হতে হবে, মুত্তাকী ও মুহসিন হতে হবে। এই পরিভাষাগুলিকে আপনি যতো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করবেন, কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি ততোই বেশি পরিপূর্ণ ও যোগ্যতার অধিকারী হবে। সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করলেও শিল্প বিপ্লবের কথা এবং তার উন্নতির মধ্যে বর্তমান তাহযীব তামাদ্দুনের আবহাওয়ায় লালিত ফাসেকী কাজের খেলোয়াড়ী মনোভাবের সাথে মিল খাওয়ানোর কথা বাদ দিতে পারলে, ইনশাআল্লাহ পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আপনি আদর্শ নমুনা পেয়ে যাবেন।

আমাদের পারিবারিক জীবনের বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে চারটি: এক, বংশ রক্ষা, যার কারণে ব্যভিচারকে হারাম ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। পর্দার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র জায়েয ও আইনসংগতভাবে সীমিত রাখা হয়েছে, এ সীমা অতিক্রম করা কোনো অবস্থাতেই ইসলাম অনুমতি দেয়নি। দুই, পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তা, এ উদ্দেশ্যে পুরুষকে ঘরের কর্তা বানানো হয়েছে, বিবি ও সন্তানদেরকে বানানো হয়েছে তার হুকুমের অনুগত এবং আল্লাহর হক আদায়ের পরই সন্তানদের জন্য পিতামাতার হক আদায় করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তিন, সুন্দর ও সুষ্ঠু সামাজিক অবস্থান, এ উদ্দেশ্যে নারী পুরুষের অধিকারসমূহকে নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। পুরুষকে দেয়া হয়েছে তালাক দেয়ার অধিকার, আর নারীকে দেয়া হয়েছে খোলা তালাক গ্রহণ করার হক এবং আদালতকে দেয়া হয়েছে (প্রয়োজনে) বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ক্ষমতা। আর পৃথক হয়ে যাওয়া নারী পুরুষের দ্বিতীয়বারে বিবাহ বন্ধনের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। যার ফলে স্বামী স্ত্রী হয় সুন্দর ব্যবহার সহকারে বসবাস করবে, আর নয়তো বনিবনা না হলে পৃথক হয়ে গিয়ে অপর কোনো পরিবার গঠন করতে পারবে। চার, আত্মীয়তার বন্ধন, এর উদ্দেশ্য হলো আত্মীয় স্বজনের পরস্পরকে সাহায্যকারী ও সহানুভূতিশীল বানানো। আর এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর যে কোনো অনাত্মীয়ের তুলনায় নিজ আত্মীয় স্বজনের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আফসোস, মুসলমানেরা এই উত্তম পারিবারিক ব্যবস্থার মর্যাদা বুঝতে পারেনি এবং এর বৈশিষ্ট্য থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে। এই পারিবারিক ব্যবস্থার নীতিসমূহ পল্লীজীবন ও নাগরিক জীবনের সর্বত্র সমান, দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে জীবন যাপন পদ্ধতির বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে কথা আছে। এ ব্যাপারে কথা হলো, শহর ও পল্লীজীবনের পদ্ধতি একই প্রকার হওয়া তো দূরের কথা, শহরে বসবাসকারীগণও একই পদ্ধতিতে জীবন যাপন করে না। স্বাভাবিকভাবে এদের জীবন যাপনের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য বিদ্যমান তা ইসলাম বিরোধী নয়, তবে শর্ত হলো মৌলিক নীতিসমূহের রদবদল না হওয়া। *(তরজমানুন কুরআন, খণ্ড ৫১, সংখ্যা ৬, মার্চ ১৯৫৯ খৃ.)*

শয়তানের হাকিকত

প্রশ্ন : কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত এবং সাধারণ বোধগম্য ভাষায় ব্যবহৃত 'শয়তান' শব্দের মূল তত্ত্ব কি? শয়তান কি আমাদের মতোই সৃষ্টি, যাকে জীবন মৃত্যুর ঘটনা পরিক্রমা মুকাবেলা করতে হয় এবং জন্ম ও বংশবৃদ্ধির নিয়মে যার বংশধারা চালু আছে? যেমন করে আমরা খাওয়া দাওয়া, আয় রোজগার ও জীবনের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকি, তেমনি করেই কি তারা আমাদের মতো পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ? মানুষকে ধোঁকা দেয়ার ক্ষমতা তার কতোটুকু? মানুষের শারীরিক অংগপ্রত্যঙ্গাদির মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা তার আছে কি, আর শিরা উপশিরার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে কি সে বশীভূত করতে পারে? জোর করে কি মানুষকে সে ভুল পথে চালিত করতে পারে? আর তা না হলে ধোঁকা সে দেয় কেমন করে? অথবা শয়তান আরবি পরিভাষায় ব্যবহৃত এমন একটি শব্দমাত্র, যা সেই প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যে ধ্বংসাত্মক নীতি গ্রহণ করে থাকে। অথবা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান প্রবৃত্তিগত শক্তির নাম, যাকে কুরআন নাফসে আম্মারা বা নফ্সে লাওয়ামার সঙ্গে তুলনা করে থাকে। অর্থাৎ এমন নফস যা মানুষকে অসৎ কাজের দিকে প্ররোচিত করে। শয়তানের অস্ত্র বড়ই বিপদজনক বিধায় এর থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন করা হচ্ছে।

জবাব : কুরআন ও হাদিস ব্যতীত শয়তান সম্পর্কে জানার আমার দ্বিতীয় কোনো মাধ্যম নেই। এর মাধ্যমে যা জেনেছি তা হলো : শয়তান নিছক কোনো শক্তি বা মানুষের কোনো আবেগ অনুভূতির নাম নয়, বরং সে জ্বিন প্রজাতি থেকে উদ্ভূত এক জাতি বিশেষ এবং জ্বিন আমাদের মতোই এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি, যার প্রতিটি সদস্য মানুষের মতো ব্যক্তিত্বের (Personality) অধিকারী। তাদের জীবিকা, কাজ এবং জন্ম ও বংশ বৃদ্ধি সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু জানি না। মানবদেহের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আমাদের দ্বারা জবরদস্তি করে কোনো কাজ করিয়ে নেয়ার ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়নি। সে শুধুমাত্র আমাদের প্রবৃত্তিকে উস্কানি এবং অসৎ কাজের দিকে এগিয়ে দেয়ার কাজ করতে পারে, অথবা কুপ্ররোচনা দান এবং সন্দেহ সৃষ্টির কাজ করতে পারে। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে তার প্ররোচনাকে প্রতিরোধ করে নিজ ইচ্ছা ইখতিয়ার অনুসারে কোনো পথ গ্রহণ করতে সক্ষম। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫২, সংখ্যা ৫, আগস্ট ১৯৫৯ খৃ.)*

প্রশ্ন : যতোবারই কোনো অন্যায় কাজ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর আত্ম জিজ্ঞাসার সুযোগ হয়েছে, ততোবারই আমি অনুভব করেছি যে, কোনো বাইরের শক্তি আমাকে ভুল পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করেনি, বরং আমার নিজের ব্যক্তিসত্তাই তার জন্য দায়ী। আমার সহজাত চাহিদা যখনই সৎ চিন্তাকে পরাভূত করে এবং আমার আত্মার উপর কুপ্রবৃত্তি জয়ী হয়, তখনই আমি কোনো অন্যায় কাজ করে বসি।

বাইরের কোনো শক্তি আমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে আমাকে ভুল পথে নিয়ে যায় না। কিন্তু কুরআন মজীদ অধ্যয়নকালে আমি অনুভব করি যে, স্বতন্ত্র এক অস্তিত্বের অধিকারী শয়তানই আমার চিন্তাগত ও কার্যগত বিভ্রান্তির উস্কানিদাতা। মানুষের এই দুশমন কখনো বাইরে থেকে আসে, আবার কখনো মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যায়। এ বিষয়ে আমার প্রশ্ন হলো, আপনিও কি শয়তানকে এমন এক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী মনে করেন, যে মানুষকে ভুল পথে নিতে অথবা কুপরামর্শ দিতে পারে?

জবাব : শয়তান সম্পর্কে কুরআন বলে, সে জ্বিন জাতি হতে উদ্ভূত এক সৃষ্টি, আর ঐ জাতির বহু লোক মানুষ জাতির মতো মুমিনও আছে, আবার কাফেরও আছে। উপরন্তু জ্বিনদের মধ্যকার শয়তানরা এই কাফেরদেরই অন্তর্ভুক্ত। এমনি করে কুরআন এটাও বলে যে, জ্বিন জাতি আগুনের পয়দা। এ জাতি বাস্তবে আছে এ ব্যাপারে আমি কোনো জটিলতা অনুভব করি না। আসলে বস্তু ও শক্তি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান একেবারেই প্রাথমিক স্তরের। শক্তির বস্তুরূপ ধারণ করার পরের অবস্থাকে আমরা তুলনামূলকভাবে বেশি জানি, কিন্তু বস্তুরূপ গ্রহণ করার পরিবর্তে যখন এটা শুধু শক্তিরূপে বর্তমান থাকে, তখন সে কি কি ঘটনা ঘটাতে পারে এবং সে কি ধরনের হতে পারে, সে জ্ঞানের ত্রিসীমানায় আমরা এখনো পৌঁছুতে পারিনি। এটা কি সম্ভব নয়? আর সম্ভব নাই বা হবে কেন যে, পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি শক্তিরূপেই বর্তমান থাকতে পারে? এদের মধ্যে এমন অস্তিত্বও তো বর্তমান থাকতে পারে, যারা বুঝশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং নড়াচড়া ও কর্মক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে একটি স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারীও? আমার বিবেচনায় শয়তান এই ধরনেরই এক সৃষ্টি, আর এ সৃষ্টি আমাদের মতো এই পৃথিবীতেই বর্তমান।

তবে আমাদের শরীয়ী সত্তার সাথে তার যোগাযোগ (Contact) এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্বের অনুভূতির মধ্যে তার পক্ষে মন্দ অনুভূতিকে শক্তি যোগানো এটাও অবিশ্বাস্য বা বুদ্ধির অগম্য কোনো ব্যাপার নয়। আমাদের শারীরিক সত্তা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি এখনও স্বল্পমাত্রায় এবং এর গঠনপ্রণালীর রহস্যকে আমরা এখনও উদঘাটন করতে পারিনি। সম্ভবতঃ এটাও অসম্ভব নয় যে, যখন আমরা নিজেদের মনের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হই এবং ভালো বা মন্দের মধ্য থেকে কোনটা গ্রহণ করবো সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ি, সে সময় এক অননুভূত বাহ্যিক প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি আমাদের অনুভূতিকে মন্দের প্রতি আকর্ষণ করে ও শক্তি যোগায়। অনুরূপ অপর এক অদৃশ্যশক্তি (অর্থাৎ ফেরেশতা) আমাদের সৎ প্রবণতাকে সাহায্য করতে থাকে, যদিও আমরা তাদের কাজ ও কর্মপদ্ধতিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

অবশ্য আমরা তা না বুঝলেও এ ধরনের দ্বন্দ্বের সময় আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে একটু গভীরভাবে যাঁচাই করলে একটা অস্পষ্ট ধারণা অবশ্যই অনুভূত হয় যে, বহিরাগত কোনো অদৃশ্য শক্তি আমাদের চিন্তাজগতে এবং করণীয় কর্ম বাছাই পর্বে আপন প্রভাব ফেলে থাকে। কখনও কখনও আমি নিজেও তা অনুভব করেছি। যাই হোক, বস্তুগত জিনিসের উর্ধ্বের কোনো স্বতন্ত্র সত্তার আমাদের শারীরিক শক্তির সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা এবং এগুলিকে প্রভাবিত করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। আর এর অনুধাবনও মুশকিল কিছু নয়। তবে আমরা যদি শুরুতেই ধরে নেই যে, আমাদের অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, তা হলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৩, সংখ্যা ২, নভেম্বর ১৯৫৯ খৃ.)*

ফিতরাত শব্দের অর্থ

প্রশ্ন : ফিতরাত নামক একটি শব্দ সাধারণভাবে প্রায়শ: ব্যবহার করা হয়। আসলে ফিতরাত (প্রকৃতি) জিনিসটি কি? এটা কি মানুষের সৃষ্ট কোনো বিষয়? না কি মায়ের পেট থেকে নিয়ে আসা জন্মগত কোনো যোগ্যতার নাম? মানুষ চেষ্টা সাধনা দ্বারা ফিতরাতকে ভালো বা মন্দ করতে পারে কি? নাকি মানুষ এ ব্যাপারে একেবারেই অসহায়? তা যদি না হয়, তাহলে প্রকৃতির ত্রুটি বিচ্যুতি চেষ্টা সাধনার দ্বারা দূর হতে পারে কি? প্রশ্নটি আমার আপন সত্তার সাথে সম্পর্কিত। মনে হয়, আমার প্রকৃতি আদতেই নিকৃষ্ট ধাঁচের গড়া, যার প্রভাব আমার মন মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও এর প্রভাব দূরীভূত করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং আপনার খেদমতে অনুরোধ, আমাকে সুষ্ঠু ও সঠিক পরামর্শ দান করুন।

জবাব ফিতরাত বা প্রকৃতির মূল অর্থ হচ্ছে কাঠামো। অর্থাৎ সেই নির্মাণ কাঠামো, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আপন সৃষ্টির প্রত্যেক শ্রেণী, জাতি ও ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন। আর সেসব যোগ্যতা ও শক্তিনিশ্চয় প্রত্যেক প্রাণী দেহের আদলে রেখে দিয়েছেন। এক প্রকার প্রকৃতি এই, যা গোটা মানবজাতির মধ্যে সমষ্টিগতভাবে বর্তমান। আর এক ধরনের প্রকৃতি আছে, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে বিদ্যমান এবং প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে। এই প্রকৃতির মধ্যে ঐ সমস্ত শক্তিও রয়েছে, যেটা ব্যবহার করে মানুষ নিজেকে পরিমার্জিত করে তুলতে পারে, আবার বিনাশও করে দিতে পারে। একইভাবে অপরের উপকারী বা অপকারী প্রভাবকে গ্রহণ কিংবা প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও লাভ করতে পারে। এজন্য যেমন একথা বলা যায় না যে, মানুষ নিজের স্বভাব প্রকৃতিকে গঠন করার বা পরিবর্তন করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তেমনি একথাও বলা যায় না যে, সে এ ব্যাপারে একেবারেই উপায়হীন এবং আদৌ তার কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। আসল অবস্থা এ দুইয়ের মাঝামাঝি। আপনি

চেষ্টা করলে নিজের কোনো কোনো প্রাকৃতিক দুর্বলতাকে সংশোধনও করে নিতে পারেন। আর এটাও সত্য যে, ঐ সংশোধনী শক্তিও আপনার মূল স্বভাবপ্রকৃতিরই একটি অংশ। আপনি নিজের যেসব দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি সম্পর্কে আত্মজিজ্ঞাসা করে ভালোভাবে সেগুলি বুঝবার চেষ্টা করুন। তারপর নিজ চিন্তা, বিবেকশক্তি এবং ভালোমন্দের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা ও ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে সে দুর্বলতাগুলি কমিয়ে এনে এক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছার চেষ্টা করতে থাকুন। আপনার দুর্বলতা সম্পর্কে আপনার নিজের স্বীকৃতিই এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, আপনি নিজে সেগুলি অনুভব করেন। এরপর যখনই সে দুর্বলতাগুলিকে আত্মপ্রকাশ করতে এবং নিজেকে প্রভাবিত করতে দেখতে পাবেন, সেই মুহূর্তেই আপন ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেগুলিকে দমন করা শুরু করুন। নিজের চিন্তা, বিবেক এবং ভালো ও মন্দের পার্থক্য জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা কোন্‌টি, সেটা জেনে নিন। অত:পর পরিমার্জিত ও সংশোধিত রূপে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করতে থাকুন। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫২, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৫৯ খৃ.)*

ছবি তোলার ফিতনা

প্রশ্ন : আজকাল চিত্র নির্মাণ ও ছবি তোলার প্রবণতা অত্যধিক বেড়ে গেছে। জীবনের প্রতিটি বিভাগেই এর ব্যবহারকে সভ্যতার মাপকাঠি বানিয়ে নেয়া হয়েছে। বাজারের দোকানসমূহে, বাড়ির বৈঠকখানাগুলিতে, পত্র পত্রিকার প্রচ্ছদপটে, সংবাদপত্রে, এক কথায় যেদিকেই দৃষ্টি ফেলা হোক না কেন, এ অভিশাপের সাথে সাক্ষাত হবেই এবং কোনো কোনো সময়ে মনমগজও এতে আকৃষ্ট হয়ে যায়। পূর্ণ মনোযোগ সহকারে মেয়েদের ছবি দেখাও কি গুনাহের কাজ?

জবাব : ছবির ফিতনা বাস্তবিকই একটি সাধারণ ব্যাধি, বরং ব্যাধির বন্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে। যার চিকিৎসা আমার জ্ঞানমতে এছাড়া আর কিছুই নয় যে, সমষ্টিগতভাবে জীবনব্যবস্থার পরিবর্তন করা এবং এমন লোকদের হাতে নেতৃত্বের লাগাম সোপর্দ করা যারা চরিত্র হননকারী প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি বস্তু নির্মূল করে সমাজদেহ থেকে এর অবাঞ্ছিত প্রভাবের ছাপ মুছে ফেলতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ বন্যা যতোদিন পর্যন্ত প্লাবন আকারে অগ্রসর হতে থাকবে, ততোদিন প্রত্যেককেই যার যার সাধ্য অনুযায়ী এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। মেয়েদের ছবির ব্যাপারে দৃষ্টিকে তেমনি নিম্নগামী ও সংযত রাখতে হবে, যেরূপ খোদ নারীদেরকে দেখার ব্যাপারে শরিয়ত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কারণ, জ্বলজ্যান্ত নারীদের মনোযোগ দিয়ে দেখা, আর তাদের ছবি দেখার প্রভাব ও ফলাফল প্রায় একই প্রকারের। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫২, সংখ্যা ৫, আগস্ট ১৯৫৯ খৃ.)*

কুরআন ও বিজ্ঞান

প্রশ্ন : মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ মনে করেন, কুরআনে এমন কিছু কথা আছে যা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। অনেক আলেম ও জ্ঞানবান লোক বলে থাকেন, কুরআন মজীদে পৃথিবীর আবর্তনের কোনো উল্লেখই নেই, বরং সূর্যের আবর্তন প্রমাণিত।

জবাব : কুরআনের কোনো কথা বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্যের বিরোধী, একথা সর্বৈব মিথ্যা। বিজ্ঞানীদের মতবাদ, থিওরী ও চিন্তাভাবনার বিরোধী হওয়া এক কথা, আর বাস্তব এবং প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সত্যের বিরোধী হওয়া অন্য কথা। প্রথমটার বিরোধী হওয়ার কোনো পরোয়াই আমরা করি না। কিন্তু দ্বিতীয়টার বিরোধী হওয়ার ব্যাপারে কোনো দৃষ্টান্ত যদি আপনার জানা থাকে, তাহলে আমাকে অবশ্যি জানাবেন। পৃথিবীর আবর্তনের ব্যাপারে আপনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তার জবাব হচ্ছে, পৃথিবী গতিশীল না স্থির, এ ব্যাপারে কুরআন মজীদ সুস্পষ্টভাবে কোনো কথা বলেনি। তবে কুরআনের কোনো কোনো স্থানে আনুষংগিকভাবে যেসব ইংগিত পাওয়া যায়, তা থেকে বরং গতিশীলতার ধারণাই শক্তিশালী হয়। আর সূর্য প্রসঙ্গে বলা যায়, অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা সূর্যকে স্থির মনে করে আসছিলেন। সাম্প্রতিক কালেই না জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেছেন যে, সূর্য তার সমগ্র সৌরজগতসহ আবর্তিত হচ্ছে। *(তরজমানুল কুরআন, আগস্ট ১৯৫৯ খৃ.)*

বিবর্তনবাদ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : বিবর্তনবাদ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ পাওয়া যায়। কোনো কোনো চিন্তাবিদের ধারণায় মানুষ সৃষ্টি নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা। কারো ধারণায় (যার মধ্যে ডারউইনের ধারণাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ) নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় পৌছার জন্য মানুষ ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আর এ ক্রমোন্নতি হচ্ছে বাঁচার সংগ্রামে ও যোগ্যতর ব্যক্তির বাঁচার অধিকারের কারণেই। কোনো কোন ব্যক্তি মনে করে, মানুষ সর্বদা ভৌগোলিক পরিবেশের ছাঁচে গড়ে উঠেছে। যেমন লামার্ক বলেছেন, কেউ কেউ বরগুমানের বিবর্তন মতবাদের সমর্থক। আপনার লেখাগুলি অধ্যয়ন করে একথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি যে, আপনি বিবর্তনের কোন দিকটির বিরোধী। মেহেরবানী করে সে দিকটি চিহ্নিত করে দিন।

জবাব : বিবর্তনবাদের প্রশ্নে আমি প্রকৃতপক্ষে ডারউইন মতবাদের বিরোধিতা করেছি। ক্রমোন্নতি বিষয়টি তো একটি বাস্তব সত্য, যে ব্যাপারে কোনো মতভেদ করা চলে না, কিন্তু ডারউইনী মতবাদ নিছক একটি অনুমানের বেশি কিছু নয়, আবার তা এমন অনুমান, যা সকল প্রকার জ্ঞান গবেষণালব্ধ তথ্যের যুক্তিসংগত

ব্যাখ্যা দেয় না, এতে বরং কোনো কোনো তথ্যের অনুমান ভিত্তিক যুক্তি পেশ করে সে তথ্য গোপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর এমন এক জ্ঞানগত পীড়নধর্মী আধিপত্য দ্বারা এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে, যা গোঁড়ামীর দিক দিয়ে খৃষ্টান পাদ্রীদের ধর্মীয় কঠোরতা অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। তদুপরি এর বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক কোনো সমালোচনা বরদাশত করতেও এ মতাদর্শীরা প্রস্তুত নয়। এতদসত্ত্বেও এই মতবাদের উপর আজ পর্যন্ত জ্ঞানসিদ্ধ তথ্য ও প্রমাণভিত্তিক যে সমস্ত সমালোচনা করা হয়েছে সেগুলি সামনে রাখলে একথা বুঝা যায় যে, এ সম্পর্কে উত্থাপিত অধিকাংশ প্রশ্ন এমন, যার জবাব আজ পর্যন্ত ডারউইনী মতবাদের ভক্তরা দিতে পারেনি। আপনি নিজে সমালোচনাপূর্ণ পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে দেখে নিন যে, অভিযোগগুলি কতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর ডারউইনী মতবাদের যুক্তি বলে যে প্রমাণ পেশ করা হয়, তা কতো দুর্বল। উদাহরণস্বরূপ আপনাকে আমি শুধুমাত্র The revolt against reason নামক একটি মাত্র বই অধ্যয়ন করতে পরামর্শ দিবো। আমি যে জিনিসটিকে সঠিক মনে করি তা হলো, গাছপালা, তরুলতা ও জীব জানোয়ারের প্রত্যেকটি শ্রেণী এবং মানব জাতিকেও ঠিক এমনিভাবে পয়দা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা নিজ সৃজন ক্ষমতা দ্বারা সরাসরি অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন এবং তারপর তিনি নিজেই তার মধ্যে বংশবৃদ্ধির শক্তি দান করেছেন। যার ফলে পরবর্তীকালে জন্মদান ও বংশবৃদ্ধির সহজাত ধারায় অগণিত ব্যক্তি ও বস্তু পয়দা হতে থাকে। এ মতবাদই পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত।

সমস্ত তথ্যের (Observed facts) ব্যাখ্যা সঠিকভাবে পেশ করে এবং এর বিরুদ্ধে এমন কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না, যার জবাব এর অভ্যন্তরে বর্তমান নেই, আর এই মতবাদের বিস্তারিত তথ্যের মধ্যে কোনো জায়গায় এমন জটিলতাও বর্তমান নেই যার সমাধান হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হলো, কল্পনাপ্রসূত প্রত্যেক অনুমানকে চিন্তা গবেষণার যোগ্য মনে করা হয়, কিন্তু এই মতবাদ থেকে পিছিয়ে থাকা হয় কেনো? *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৩, সংখ্যা ২, নভেম্বর ১৯৫৯ খৃ.)*

মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.)

প্রশ্ন : ১. কুরআনে মজীদ এমনভাবে হযরত আদম আ. সম্পর্কে উল্লেখ করেছে, যাতে স্বচ্ছ আয়নায় প্রতিফলিত হওয়ার মতো এ সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, মানবজাতির এই প্রথম সদস্য অত্যন্ত সভ্য ও শালীন ব্যক্তি ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমার মনে যে জিনিসটি খটকার সৃষ্টি করেছে তা এই যে, এমন সুসভ্য মানুষের ঔরসে অসভ্য গোত্রগুলি কেমন করে পয়দা হয়ে গেলো। ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে, এই গোত্রগুলি চরিত্র ও মানবতার মৌলিক

মূল্যবোধের সঙ্গেও ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানও এ বিষয়েরই সমর্থন ও সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রমান্বয়ে মানুষ নিজ চিন্তাশক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত করেছে, এই একটি মাত্র পার্থক্যই পশু ও মানুষকে পৃথক করে রেখেছে, এ ছাড়া মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে বড় একটা প্রভেদ নেই। এ বিষয়টি বিবর্তনবাদের পক্ষেই শক্তি যোগায়। আমি আশা করবো এ বিষয়ে আপনি আমার খটকা দূর করে দেবেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানাবেন যে, আদি পিতা হযরত আদমের সৃষ্টির ধরনটি কি ধরনের এবং তাঁর স্বাভাবিক শক্তি কোন পর্যায়ে ছিলো।

২. হযরত আদম আ. ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ে পয়দা হয়েছিলেন? এ প্রসঙ্গে ধর্ম আমাদেরকে যে জ্ঞান দেয় মনস্তাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক তথ্যাদি তা সমর্থন করে না। আদম ও বিবি হাওয়ার এ কাহিনী একটি উপমা এবং রূপক বিষয় নয় কি?

জবাব : আদম আ. কে আমি মানবজাতির প্রথম ব্যক্তি মনে করি এবং এ বিশ্বাসও আমি পোষণ করি যে, প্রথম ব্যক্তিকে সরাসরি পয়দা (Direct creation) করা হয়েছিল। আর এটাও ঠিক যে, প্রথম সেই ব্যক্তিকে এমনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, তিনি আপন প্রচেষ্টায় চিন্তা চেতনা এবং বাস্তব সভ্যতার দিকে অগ্রসর হবেন, বরং তাকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণে রেখে সেই প্রাথমিক প্রশিক্ষণও দান করা হয়েছে, যা মানব জীবনের সভ্যতার গোড়াপত্তনে অনিবার্য ছিলো। একটু চিন্তা করলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, প্রতিটি প্রজাতিকেই জীবনের সূচনাতে কিছু পথ প্রদর্শনের মুখাপেক্ষী হতে হয়। জীব জানোয়ারের জন্য অবশ্য এ পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন খুবই কম ও সীমিত আকারে। প্রত্যেক জীবন জানোয়ারের বাচ্চা সাধারণত নিজ মা বাপ বা সম শ্রেণীর অন্যদের দ্বারা জীবন পথের সন্ধান পায়। কিন্তু মানব সন্তান এদের থেকে বহুগুণে বেশি তত্ত্বাবধান ও পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী, যার অভাবে হয়তো সে বাঁচতেই পারে না অথবা মনুষ্য সন্তান হিসেবে লালিতপালিত হতে পারেনা। আমার মতে এই প্রাথমিক এবং প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশনা প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম ব্যক্তির মতো মানবজাতির প্রথম ব্যক্তিকেও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছিল।

মানুষ সম্পূর্ণভাবে অসভ্য এবং একেবারেই পশুর স্তরে ছিলো, এটা নিছক একটি কল্পনা মাত্র। আর এ কল্পনা মূলত ঐ অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে যে, উন্নতির ক্রমধারায় পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে মানুষ বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এ যাবতকালের জ্ঞান গবেষণা দ্বারা সে দু'টি অনুমানের সমর্থনে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি (সমর্থন এ অর্থে যে, প্রমাণ কোনো কিছু পাওয়া যায়নি)। পক্ষান্তরে প্রাচীনতম ভগ্নাবশেষের যেখানে যতটুকু চিহ্ন আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে সেখানেই সভ্যতার কিছু নিদর্শনও আবিস্কৃত হয়েছে। [অবশ্য অনুমান ভিত্তিক কিছু শূন্য

এলাকা (Missing link) বাদে] সেটা যতোই প্রাথমিক যুগের হোক না কেনো। পশুর ন্যায় নিরেট অসভ্য এবং জংলী মানুষ আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি। আপনি যাকে জংলী বলে অভিহিত করেন, তার মধ্যে এবং পশুদের উন্নত অবস্থার মধ্যে সত্যিকার তুলনা করা হলে দেখা যাবে, পশুর উন্নত থেকে উন্নত শ্রেণীর সাথে মানুষের নিম্নতম স্তরে কোনো তুলনাই খাটে না। কেননা এ ক্ষেত্রে মানুষ ও পশুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য স্বত:ই ফুটে উঠবে। এ পর্যায়ে এটা কেবল কাল্পনিক ক্রমবিবর্তনের উন্মাদনা, যার আবরণে এক প্রকার বাহ্যিক সাদৃশ্যকে কেন্দ্র করে মানুষ ও পশুর মধ্যে একটি আপাত মিল খুঁজে বের করা হয়েছে। অথচ একেবারে আদিম যুগের অবস্থার মধ্যে এমন কিছু নির্দশন লক্ষ্য করা যায়, যা মানুষ এবং পশুর মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করে। যেমন লজ্জা শরম, যা যৌন অংগকে ঢেকে রাখার এবং যৌনমিলনকালে গোপনীয়তা রক্ষার ইচ্ছার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শব্দ ও ইংগিত দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করার মধ্যেও মানুষের সাথে পশুর আওয়াজে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পশুর অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত আবিষ্কার উদ্ভাবনী ক্ষমতার বেলায়ও পশু আর মানুষে বিরাট ব্যবধান। ঐচ্ছিক এবং অনিচ্ছাকৃত বিষয়ে পার্থক্য করা এবং ঐচ্ছিক ব্যাপারে নৈতিক বিধিবন্ধন আরোপ করা পশুর যে কোনো উন্নত মানের স্তরের মধ্যেও পাওয়া যাবে না। পশুর মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতির কোনো অস্তিত্ব নেই। অথচ মানবগোষ্ঠীর কোনো অংশ চরম অসভ্য অবস্থায়ও এই অনুভূতি বিবর্জিত থাকেনি।

(খ) বাবা আদমের অস্তিত্বকাল নির্ধারণ করার কোনো উপায় আজও পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে নিশ্চিত বা এর কাছাকাছি কোনো জ্ঞান আজও সংগৃহীত হয়নি। এ জ্ঞান শুধুমাত্র নবীদের মাধ্যমে এবং আসমানী কিতাবসমূহের দ্বারা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। অবশ্য কুষ্ঠিগত জ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমানের ভিত্তিতে দু'টি মতবাদ গঠন করা যেতে পারে, হয় বর্তমানের মানবজাতি বিভিন্ন মানব বংশধারা থেকে বেরিয়েছে। নতুবা এদের সবার আদি পুরুষ একজনই ছিলেন, যার থেকে মানবগোষ্ঠীর অগণিত ব্যক্তিবর্গ পয়দা হয়েছে। আপনি নিজেই চিন্তা করে স্থির করুন, এর মধ্যে কোন মতবাদ অধিকতর যুক্তিসংগত। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫, সংখ্যা ২, নভেম্বর ১৯৫৯ খৃ.)*

ভাগ্য প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আপনার বই 'মাসআলায়ে জাব্‌র, কাদ্‌র' পড়বার সুযোগ আমি পেয়েছি। অকাট্যভাবে এ কথা বলা যায় যে, আপনি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা দ্বারা এ সত্যকে স্পষ্ট করে তুলেছেন যে, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ভাগ্য লিপির (তাকদীর) যে আলোচনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে পরস্পর বিরোধী কোনো বিষয় আদৌ দেখা যায় না। এ ব্যাপারে আমি নিজে তো নিশ্চিত, কিন্তু তবু দু'টি প্রশ্ন মনে উদয় হয়।

এক. মানুষের ভাগ্য কি পূর্ব থেকে নির্ধারিত আছে এবং ভবিষ্যতে যেসব ঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটবে, সৃষ্টির সূচনা থেকে সেটা স্থির এবং নির্দিষ্ট হয়ে আছে? এখন শুধুমাত্র তার মুখ থেকে পর্দাটা উঠে যাওয়াই কি বাকী রয়ে গেছে? এর হ্যাঁ সূচক জবাব হলে দ্বিতীয় প্রশ্ন জাগে যে, এ অবস্থাটা মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতার সঙ্গে কতোটা সামঞ্জস্যশীল?

জবাব : পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য ও মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক কোন ধরনের এবং এ দু'য়ের সীমাই বা কি, প্রকৃতপক্ষে তা আমার বোধগম্যের বাইরে। এ সম্পর্কে আমরা কোনো নিশ্চিত কথা বলার অবস্থায় নেই। তবে তিনটি মৌলিক বিষয় এমন আছে, যা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।

এক, ভাগ্য সৃষ্টির ব্যাপারে মানুষ শর্তহীন সক্ষম নয়, বরং যে শক্তি গোটা সৃষ্টি জগত পরিচালনা করছে, তিনিই (শ্রেণী, জাতি, দল ও ব্যক্তি হিসেবে) ভাগ্য নির্ধারণ করছেন। অবশ্য তার একটি অংশ (যার পরিমাণ আমাদের জানা নেই) মানুষের এখতিয়ারাধীন।

দুই, আল্লাহ তায়ালার ইলমে গায়েব বা ভবিষ্যত জ্ঞান মানুষের অনাগত অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং এর পরিধিভুক্ত ভবিষ্যৎ বিস্তৃত। আল্লাহ তায়ালা নিজ সৃষ্টিলোকে সংঘটিতব্য অবস্থা সম্পর্কে বেখবর থাকলে এবং কোনো ঘটনা সংঘটিত হলেই তিনি জানতে পারেন এ অবস্থা হলে, আল্লাহ তায়ালার এই বিরাট কার্যমণ্ডল একদিনের জন্যেও চলতে পারে না।

তিন. আল্লাহ তায়ালার মহা শক্তি মানুষকে সীমিত আকারে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছে, যার জন্য মানবীয় ইচ্ছাশক্তির শর্তযুক্ত স্বাধীনতা থাকা অপরিহার্য। বস্তুত আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান তাঁরই কুদরতের দেয়া কোনো কাজ বাতিল করে দেন না। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৩, সংখ্যা ২, নভেম্বর ১৯৫৯ খৃ.)*

প্রতিকূল পরিবেশে ইসলাম প্রচার

প্রশ্ন : আমি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত, বর্তমানে নাইজিরীয়ায় বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছি। ভারত থেকে এখানে আগমনকালে আমার ধারণা ছিলো, আমি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় গমন করছি, যার কারণে শরঈ হুকুম আহকাম পালনে আমার জন্য কোনো সংকট দেখা দেবে না। কিন্তু এখানে আসার পর দেখলাম, ব্যাপার অন্য রকম। আমার অবস্থান এলাকাটি অমুসলিম প্রধান। এখানে খৃস্টান মিশনারীরা যথেষ্ট কাজ করছে। বহু স্কুল ও হাসপাতাল তাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এখানে মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ শতাংশের বেশি নয় এবং তাও শিক্ষাক্ষেত্রে এরা বহু পিছনে। এরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না। অথচ স্থানীয় খৃষ্টানরা কিছু না কিছু ইংরেজি বলতে পারে। লেখাপড়া জানা লোকের চাহিদা এখানে যথেষ্ট। এখানে বহু বিদেশী শিক্ষক ও

ব্যবসায়ী কাজ করছে, যার মধ্যে বেশির ভাগই খৃষ্টান ও হিন্দু। আমার ধরনের ব্যক্তি এখানে আমি একাই। আমি যে শহরে থাকি সেখানে তিনটি মাত্র ছোট ছোট মসজিদ আছে, যা অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত। এছাড়া দূর দূরান্তের কোনোখান থেকে আযানের শব্দও উত্থিত হয় না। এ দেশটি অক্টোবর মাসে স্বাধীনতা লাভ করবে। অবশ্য সমষ্টিগতভাবে সারাদেশে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশে মুসলিম কালচারের তুলনায় পাশ্চাত্য ও খৃষ্টীয় কালচার বেশি প্রভাবশীল। সম্ভবত মদের প্রচলন এখানে পশ্চিমা দেশসমূহ অপেক্ষা অধিক। এতদসত্ত্বেও দু'টি বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক ঐতিহ্যবাহী আচরণ, এ ব্যাপারে তারা আমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী। বিদেশীদেরকে তারা সানন্দে বরণ করে নেয়। এবং দ্বিতীয় বিষয় হলো, আমাদের দেশের ন্যায় এখানকার মুসলমানদের উপর পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার প্রভাব তেমন পড়েনি। সম্ভবত এর কারণ এটাই যে, এখন পর্যন্ত তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা বয়কট করে চলেছে।

এইসব অবস্থা সামনে রেখে আমাকে পরামর্শ দিন যে, এখানে কিভাবে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে হবে এবং ইংরেজিতে লিখিত কোনো সাহিত্য তাদেরকে দেয়া যেতে পারে। এখানকার লেখাপড়া জানা লোকেরা ইংরেজি সাহিত্য বুঝে। পর্দার মতো কোনো পুস্তক মদ্যপানের উপর যদি লিখিত হয়ে থাকে, তাহলে সে বিষয়েও আমাকে অবগত করবেন।

আর একটি পরামর্শ আপনার নিকট কামনা করি যে, এমন অবস্থায়, যেখানে গোটা পরিবেশ ও সমাজ অন্য রঙে রঞ্জিত, সেখানে মানুষ কিভাবে সঠিক পথে টিকে থাকতে পারে? এছাড়া নিম্নবর্ণিত জিনিসগুলির উপর আলোকপাত করলেও আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো :

১. এখানকার দাওয়াতে এবং পার্টিগুলোতে মদের ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত আছে। এমতাবস্থায় ঐ সব দাওয়াতে যোগদান করা উচিত কি না? এ পর্যন্ত আমি এ নীতি অবলম্বন করে আসছি, আমি এসব দাওয়াতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করি, কিন্তু মদ এবং এ জাতীয় অন্য জিনিস গ্রহণ করতে অস্বীকার করে দেই, যাতে করে অন্তত তাদের এ ধারণা হয় যে, কোনো কোনো ব্যক্তির নিকট তাদের এই প্রিয় খাদ্যটি অপছন্দনীয়।

২. তাদের থালাবাটিতে খানাপিনা করা ঠিক হবে কি হবে না?

৩. অনেক জিনিস এমনও আছে, যাতে আলকোহলের কিছুটা মিশ্রণ থাকে অথবা থাকতে পারে, এ ধরনের জিনিস ব্যবহার করা যেতে পারে কি পারে না?

৪. এখানে কিছু লোককে দাওয়াত দিলে তাতে মদ সরবরাহ করা যেতে পারে কি না? কারণ এখানকার লোকেরা মদ ব্যতীত কোনো ভোজের আয়োজন হতে পারে বলে বুঝেই না। আর যদি এগুলো ব্যবহার নাই করা যায়, তাহলে এর বিকল্প কি দেওয়া যেতে পারে?

জবাব : একথা জেনে খুশি হলাম যে, আপনি দেশের বাইরে এমন এক জায়গায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন, যেখানে ইসলামের বহু খিদমত করা যায়। এমতাবস্থায় আপনাকে বুঝতে হবে যে, আপনি অধপতিত মুসলমান এবং অমুসলিম সবার জন্য প্রকৃত ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে নিয়োজিত হয়েছেন। নিজের কথা ও কাজ দ্বারা যদি আপনি কিছুমাত্র ভুল প্রতিনিধিত্ব করেন তাহলে আল্লাহর বহু বান্দাকে গুমরাহ করার দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে এসে চাপতে পারে। এই অনুভূতি নিয়ে যদি আপনি সেখানে অবস্থান করেন এবং সাধ্যানুযায়ী ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝে একজন মুসলমানের জীবনের সঠিক নমুনা হিসেবে নিজেকে পেশ করার চেষ্টা করতে থাকেন, তাহলে আশা করা যায়, এতে আপনার নিজের উন্নতির জন্যও ফায়দা হবে, আর আপনার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা অনেকের হেদায়াতের কারণ হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, যার বদলা আল্লাহর দরবারে আপনার নসীব হবে।

আপনার চিঠি দ্বারা ওখানকার যে অবস্থা জানা গেলো , তার প্রেক্ষাপট চিন্তা করে কাজের যে ধরন সেখানে যথাযথ বলে আমি মনে করি, তা পেশ করে দিচ্ছি।

স্থানীয় ভাষা শেখা ও বলার অভ্যাস করুন, শুধু ইংরেজিকে যথেষ্ট মনে করবেন না। বিদেশে বাইরের কোনো ব্যক্তি তাদের ভাষায় কথা বললে তারা বেজায় খুশি হয় আর তার কথা খুবই আনন্দের সাথে শোনে।

স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলুন এবং সম্পর্ক আরো গভীর করতে থাকুন। তাদেরকে দীনের সঠিক অবস্থা এবং নিয়ম কানুন বুঝানোর চেষ্টা করুন। তাদের মধ্যকার যাদের সন্তান আপনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে, তাদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখুন, যাতে করে তারা আপনাকে নিজেদের দরদী বলে মনে করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছেলেদের পড়াশুনার ব্যাপারেও যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন, তাহলে তাও করুন। যারা আপনার নিকট ইংরেজি পড়তে চায়, তাদেরকে পড়ান। এইভাবে তাদের অন্তরের মধ্যে নিজের জন্য স্থান গড়ে তুলুন। আর তারপরেই তাদের মধ্যে দীনের সঠিক এল্‌ম ও আমল ছড়ানোর জন্য এবং তাদের অবস্থাকে শুধরানোর জন্য রাস্তা বের করুন। তাদের মধ্যকার কিছু প্রভাবশালী লোকের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হলে তাদেরকে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতির পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করুন এবং নিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করুন। নি:স্বার্থপরতা, মুহাব্বত, বিনয় এবং প্রকৃত শুভকামনা নিয়ে তাদের কল্যাণের চেষ্টা করতে থাকলে শীঘ্র হোক বা বিলম্বেই হোক, ইনশাল্লাহ একদিন আপনি তাদের অন্তর জয় করতে সমর্থ হবেন। আর তারাও আপনার কথামতো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনি কাজ করেন, সেখানে আপনি নিজ কর্মপদ্ধতি দ্বারা নিজের যোগ্যতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং উন্নত মানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করুন, যেনো শিক্ষার্থী, শিক্ষকবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপকদের সবার উপর আপনার চারিত্রিক প্রভাব কায়েম হয়ে যায়। তারপর এমন কিছু উপায় এবং পদ্ধতি তালাশ করুন, যার মাধ্যমে আপনি অমুসলিম ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে নিজ চিন্তাধারা ছড়াতে পারেন। এ ব্যাপারে গভীর চিন্তাভাবনা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রাপ্ত যে কোনো সুযোগকে হাতছাড়া করবেন না। তবে সর্বদা ভুল পদক্ষেপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অন্যথায় ফল উল্টো দাঁড়াতে পারে। চিকিৎসকের প্রজ্ঞা এরই মধ্যে নিহিত যে, সে রোগীকে সময় মতো এবং সঠিক ঔষধ প্রদান করে, মাত্রা কমও দেয়না বেশিও দিয়ে বসে না।

সাধারণ যেসব লোকের সাথে আপনার মেলামেশা হয়, তাদের সাথে কথাবার্তার সময়ে যথাযথ নিয়মে ইসলামের পরিচয় করিয়ে দিন। পাশ্চাত্য সভ্যতার দুর্বলতাগুলিকে তাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন, খৃষ্টানদের বিকৃত কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদের নিকট ততোটাই তুলে ধরুন, যতোটা শুনবার মতো তাদের ধৈর্য আছে। তারপর যাদের মধ্যে ইসলামি সাহিত্য পড়ার আগ্রহ দেখতে পান, তাদেরকে পড়ার জন্য উপযুক্ত বইপত্র সরবরাহ করুন। এখান থেকে আপনার নিকট একটি ইংরেজি সাহিত্য সূচি পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। চাহিদা সৃষ্টি করা ব্যতীত সকলকেই সাহিত্য দেওয়া শুরু করবেন না। সেগুলি আনিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখার ব্যবস্থা করুন।

অমুসলিমদের মধ্যকার যেসব ব্যক্তির মধ্যে আপনি বিশেষ যোগ্যতা, শান্ত স্বভাব এবং সত্যপ্রবণ বলে অনুভব করবেন, তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বাড়ান এবং বিশেষভাবে তাদের উপর কাজ করুন, যেনো আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আপনার মাধ্যমে হেদায়াত নসীব করে দেন। কিন্তু আপনার নিজের হাতে কাউকে ইসলামে দীক্ষিত করানো থেকে বিরত থাকবেন। যে কোনো ব্যক্তি মুসলমান হতে চাইলে তাকে স্থানীয় মুসলমানদের নিকট পাঠিয়ে দিন।

মদ্যপান সম্পর্কে ইংরেজিতে বহু বই পুস্তক বর্তমান আছে। আপনি লন্ডনের ঠিকানায় Church of England Temperance Sceiety এবং ওয়াশিংটনের Anti Saloon League of American এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে এই বিষয়ক সাহিত্যের তালিকা আনিয়ে নিন এবং উপযুক্ত বই বাছাই করে তা সংগ্রহ করুন।

এখন সংক্ষিপ্তভাবে আপনার প্রশ্নগুলির জবাব দিচ্ছি :

১. অন্যদের পক্ষ থেকে আপনাকে দাওয়াত দিলে অবশ্যই তা কবুল করবেন, কারণ এ ছাড়া তাদের সাথে খোলাখুলিভাবে মেলামেশার অন্য কোনো সুযোগ

আপনি পাবেন না। এই উদ্দেশ্যে আপনি যদি ঐ সব আসরে যোগদান করেন, যেখানে মদ পান করা হয় তাহলে আশা করা যায় যে, আপনাকে আল্লাহর নিকট পাকড়াও হতে হবে না। ওদের ঐ সব আসরে যোগদান করে আপনি মদপান থেকে প্রকাশ্যভাবে শুধু বিরতই থাকবেন না, বরং তা পরিহারের কারণগুলি প্রশ্নকারীদের সামনে এমন যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরবেন, যেনো তাদের নিকট তা অপ্রিয় মনে না হয়। মদখোরদের মাহফিলে তো ঐসব লোকের জন্য যোগদান করা ক্ষতিকর, যারা মদ পান না করাতেই লজ্জা বোধ করে। কিন্তু ঐসব লোকের উক্ত মাহফিলে যোগদান খুব উপকারী, যারা মদপান করতে বাহাদুরীর সাথে অস্বীকার করে এবং যুক্তির হাতিয়ার নিয়ে সেই মাহফিলেই তাদের সামনে মদের অপকারিতা সম্পর্কে বুঝানোর জন্য এগিয়ে আসে, যারা মদ পান না করার কারণ জানতে চায়। এটা তো অতি উৎকৃষ্ট তাবলীগ, যার বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখি।

২. তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ধোয়া পাত্রে আপনি খানা খেতে পারেন যদি আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন যে, তাতে কোনো হারাম জিনিস লেগে নেই। তবে তৃপ্তি না হওয়ার অবস্থায় আপনার জন্য এটাই ভালো হবে যে, দাওয়াত পত্র পাওয়ার সাথে সাথে আপনার মেজবানকে একথা বলে দেবেন এবং লিখিতভাবে আপনার নীতি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করার অনুরোধ করবেন।

৩. আলকোহল মিশ্রিত জিনিস সে সময় পর্যন্ত গ্রহণ করা চলে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো চিকিৎসক আপনার প্রাণ বাঁচানোর জন্য অথবা আপনার স্বাস্থ্যের অস্বাভাবিক ক্ষতির আশংকায় এর ব্যবহার অপরিহার্য বলে না জানায়।

৪. আপনি নিজে যাদেরকে দাওয়াত দিবেন তাদেরকে কিছুতেই মদ সরবরাহ করবেন না। দাওয়াত দান করার পূর্বে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া আপনার উচিত হবে যে, আপনি স্বীয় নীতির খেলাফ করে কাউকে মদ সরবরাহ করতে পারবেন না। এ শর্তে যারা আপনার দাওয়াত কবুল করবেন, শুধু তাদেরকেই দাওয়াত দিন। মদের বিকল্প কোনো জিনিস যদি পেশ করতেই চান, তো পাকিস্তান বা ভারত থেকে শরবতে রুহ আফযা অথবা এই ধরনেরই কোনো মনোরম রংয়ের খুশবুদার পানীয় আনিয়ে দিন। আশা করা যায় এগুলি তাদের কাছে পছন্দনীয় সাব্যস্ত হবে। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৪, সংখ্যা ১, এপ্রিল ১৯৬০ খৃ.)*

পর্দা ও নিজ পছন্দমত বিবাহ

প্রশ্ন : ইসলামি পর্দার কারণে একদিকে যেমন আমরা অগণিত উপকার লাভ করেছি, তেমনি এতে দু'টি এমন ক্ষতিও আছে, যার জন্য সবর ও শুকর আদায় করে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কোনো সমাধান নযরে পড়ে না।

প্রথম এই যে, একজন শিক্ষিত লোকের নিজস্ব এমন বিশেষ কিছু রুচি আছে, যার কারণে নিজের জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করার সময় সে পাত্রীর বিশেষ চারিত্রিক অবস্থা ও রুচির আশা করে। স্বভাবগতভাবে সে একথার আকাঙ্ক্ষী যে, বিয়ে করার জন্য নিজ মর্জি মতো সাথি বেছে নেবেন। কিন্তু ইসলামি পর্দার কারণে কোনো যুবক বা যুবতীর পক্ষে নিজ মর্জি মতো আপন সাথি বেছে নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। বরং সে এ ব্যাপারে মা, খালা ইত্যাকার অন্য লোকদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য। আমাদের জাতির শিক্ষার অবস্থা তো এই যে, সাধারণত মা বাপ অশিক্ষিত আর সন্তান শিক্ষিত। এখন অশিক্ষিত মা বাপের কাছে এ আশা করা একেবারেই অর্থহীন যে, তার জন্য যথোপযোগী কোনো পাত্রী তালাশ করে দেবেন। এ পরিস্থিতি এমন ব্যক্তির পক্ষে বড়ই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়, যে নিজের সমস্যা নিজে বুঝে এবং নিজেই সমাধান করার যোগ্যতা রাখে।

অন্যদিকে, একটি মেয়ে, যে ঘর থেকে বের না হওয়ারই শিক্ষা পেয়েছে, সে কেমন করে এতোটা প্রশস্ত দৃষ্টি, উদারতা এবং সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী হবে, যদ্বারা সে বাচ্চাদের উত্তমভাবে লালন পালন করতে পারে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক যোগ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয় বুঝবার মতো তার সঠিক জ্ঞানই তো হতে পারে না, বরং প্রকৃত ব্যাপারে এই যে, একজন বেপর্দা মেয়ে যতোটা শিক্ষালাভ করেছে সে যদি ততোটা শিক্ষার অধিকারীও হয়, তবুও তার মনস্তাত্ত্বিক যোগ্যতা কমই হবে। কারণ লব্ধ জ্ঞান বাস্তবে পরখ করার সুযোগই তার হয়নি। আশা করি আপনি এ সমস্যাটির উপর আলোকপাত করে বাধিত করবেন।

জবাব : প্রথমত, আপনি ইসলামি পর্দার যেসব ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি এমন ত্রুটি নয়, যার কারণে মানুষ এমন মুশকিল অবস্থায় পড়ে যাবে, যার কোনো সমাধানই নেই। দ্বিতীয়ত, পার্থিব জিন্দেগীতে এমন কোনো বিষয় আছে, যার মধ্যে কোনো না কোনো দিক থেকে কোনো ত্রুটি বা কমতি নেই? কিন্তু কোনো জিনিসের উপকারী বা অপকারী হওয়ার ফয়সালা শুধুমাত্র একটি বা দু'টি দিকের ভিত্তিতেই করা যায় না, বরং দেখতে হবে যে, সমষ্টিগতভাবে এর উপকার বেশি, না অপকার বেশি। পর্দার ব্যাপারেও এই নীতিই অবলম্বন করতে হবে। আপনার বিবেচনায়ও ইসলামি পর্দা অসংখ্য দিক দিয়ে উপকারী। কিন্তু বিয়ে শাদীর প্রশ্নে নিজ পসন্দমত পাত্রী বাছাই এর স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, শুধুমাত্র এতটুকু জটিলতার কারণে পর্দার উপকারকে কম করে দেখা বা এর থেকে বন্ধনমুক্ত হওয়া সংগত নয়। বরং প্রত্যেক ছেলেকে মেয়ে দেখার এবং প্রত্যেক মেয়েকে ছেলে দেখার খোলাখুলি অধিকার দিলে তার এমন কুফল দেখা দিতে শুরু করবে, যা ধারণাও করা যায় না এবং এর দ্বারা ঐ পারিবারিক ব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ

হয়ে যাবে, যা সমাজকে মজবুত ও পবিত্র রাখার রক্ষাকবচ। আর এই ধরনের একটি কাল্পনিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অসংখ্য বাস্তব সমস্যার দরজা খুলে যাবে।

আপনার ধারণা যে, একজন পর্দানশীন মেয়ে প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন বা উদার হতে পারে না, এটা আদৌ ঠিক নয়। আর এটাকে সঠিক বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তাতে পর্দার কোনো দোষ নাই। একজন মেয়ে পর্দার মধ্যে থেকেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিনী হতে পারে। বিপরীতে একজন মেয়ে পর্দার বাইরে গিয়েও জ্ঞান, বুদ্ধি, উদারতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে। তবে হ্যাঁ, একজন বেপর্দা মেয়ে জ্ঞান বুদ্ধির দিক দিয়ে না হলেও মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে অধিক প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্না হতে পারে, এ ব্যাপারে তাদের প্রাধান্য আছেই। এমতাবস্থায় জীবন সংগিনী নির্বাচন করার ব্যাপারে যদি তার সাফল্য এসেও যায়, তবু যে নযর একবার প্রশস্ত হয়ে গেছে, তাকে গুটিয়ে এনে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সীমাবদ্ধ করা সহজ ব্যাপার নয়।

প্রশ্ন : আপনার জবাব পেলাম। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য হলাম এজন্য যে, আপনি আলোচ্য সমস্যাটিকে একেবারেই একটি মামুলি সমস্যা হিসেবে ধরে নিয়েছেন। সফল বিবাহের আকাঙ্ক্ষা একটি বৈধ চাহিদা। তার জন্য এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা, যার ফলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিজ পসন্দ মতো কোনো পাত্রী বাছাই করার পথ বন্ধ হয়ে যায়, এটাকে আমি মানসিক আনন্দ এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে ক্ষতিকর এবং স্বভাবধর্ম বিরোধী বলে মনে করি।

আমি যতোটা বুঝতে পেরেছি, তাতে আমাদের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী মেয়েরা বড়জোর একটি বাড়ির ব্যবস্থাপক এবং স্বামীর ও নিজের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির একটি উপায় হতে পারে, কিন্তু নিজ পছন্দ ও রুচিমতো বিয়ে করার মধ্যে দুই ব্যক্তির পরস্পরকে একে অপরের নিকট সোপর্দ করার এবং জীবনের দায়িত্বসমূহ পালন করার যে সম্ভাবনা বর্তমান থাকে, নিজের পছন্দ এবং বিবেচনা ব্যতিরেকে অন্য কারো নির্বাচন অনুযায়ী বিয়ে করে নেয়ার অবস্থায় সেটা নস্যাৎ হয়ে যায়। আমি মনে করি, যুবক শুধুমাত্র যৌন সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষী নয়, সে কারো জন্য কিছু ত্যাগও স্বীকার করতে চায়, কাউকে ভালোবাসতে চায়, কাউকে সন্তুষ্ট করতে চায় আর এটাও চায় যে, কেউ তার সন্তুটিতে খুশি হোক। এই আবেগের স্বাভাবিক বহি:প্রকাশ এভাবে হতে পারে যে, এমন কোনো মেয়েকে সে বিয়ে করবে, যাকে সে তার শিক্ষা, অভ্যাস, কৃতিত্ব এবং অন্য গুণাবলীর ভিত্তিতে নিজ মনমতো লাভ করতে পারে (প্রকৃত মুহাব্বত তো কারো গুণাবলী প্রত্যক্ষ করেই গড়ে উঠে, চেহারা সূরত দেখে নয়)। আর কাউকে বিয়ে করিয়ে দেয়ার পর তার কাছে সেই মেয়েকেই এমনভাবে পছন্দ করার দাবি করা, যেনো সে নিজে তাকে পছন্দ

করেছে, এটা মূলত অবাস্তব কথা। এভাবে স্বাভাবিক ভালোবাসার পথ বন্ধ করে দেওয়ার ফল এই দাঁড়ায় যে, সে আবেগের ফলে নিজের জন্য অন্য কোনো পথ খুঁজে নেয়।

পর্দার কারণে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়ে আছে, তাতে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে নিজের জোড়া তালাশ করা সম্ভব নয়। পাত্রের বাপের পক্ষে পাত্রীর খোঁজখবর নেওয়া সম্ভব নয় এবং কোনো মেয়ের মায়ের পক্ষে পাত্র সম্বন্ধে সরাসরি কিছু আন্দাজ করাও সম্ভব নয়। কারণ, পর্দার কারণেই এসব ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং খোলাখুলি আলাপ আলোচনা সম্ভব নয় (পাত্র ও পাত্রীর মেলামেশা তো দূরের কথা)। ইসলাম যদি বেশি কিছু স্বাধীনতা দিয়ে থাকে তা শুধু এতোটুকু যে, পাত্র পাত্রীর চেহারা দেখে নেবে, কিন্তু আমার বুঝে আসে না যে, কয়েক সেকেন্ডের জন্য কারো চেহারা দেখে নেয়াতে কিইবা এমন দেখা হয়।

এ সমস্যার অপর একটি দিকও আছে। আজকের সকল ওলামায়ে কেরাম এ কথা মেনে নিয়েছেন যে, বর্তমান যুগের প্রয়োজন পূরণার্থে মেয়েদের জ্ঞান অর্জন জরুরি। কিন্তু আমার তো এমন মনে হয় যে, মেয়েরা শুধু একটি কাজই করতে পারে, হয় তারা ইসলামের হুকুম আহকাম পালন করবে নতুবা জ্ঞান অর্জন করবে। পর্দার পাবন্দ থেকে ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ঐসব জ্ঞান, যার কারণে জরীপ করা এবং দূর-দূরান্তের সফরের প্রয়োজন হয়, এ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য মেয়েরা কিভাবে কাজ করতে পারে, সেটা আমার বোধগম্য নয়, বিশেষ করে যখন মেয়েদের জন্য মাহরাম পুরুষ সঙ্গি ব্যতীত তিন দিনের অধিক সফর নিষিদ্ধ। সে কি সবখানে কোনো মাহরাম পুরুষকে সাথে নিয়ে বেড়াবে?

এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান একদিকে, অপরদিকে আমি ডাক্তারি এবং পর্দাকে পরস্পর বিরোধী মনে করি। প্রথমত, ডাক্তারি বিদ্যাটাই এমন যে, সেখানে চর্ম চক্ষু দ্বারা শরীরকে তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করার পর অভিজ্ঞতা পূর্ণ হয়। এ বিদ্যা লজ্জা শরমের এ অনুভূতিকে খতম করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, যা প্রাচ্যের মেয়েদের মধ্যে আশা করা হয়, তা সে ডাক্তারি পর্দার মধ্যে থেকেই শেখা হোক, আর শিক্ষার্থী সব মহিলাই হোক না কেন। দ্বিতীয়ত ডাক্তার হয়ে যাওয়ার পর একজন মহিলা ডাক্তারের পক্ষে রোগীদের উপসর্গাদি সম্পর্কে এতো বেশি খোঁজখবর নেয়ার প্রয়োজন হয় যে, তার ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার প্রশ্নই আসে না। এসব জিনিসকে সামনে রেখে আমরা যদি মেয়েদেরকে ডাক্তার হতে না দেই, তাহলে আমাদের ঘরের অসুস্থ মেয়েদের প্রত্যেক রোগব্যাধির চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তারের খিদমতের প্রয়োজন হবে এবং বর্তমানের হায়া শরমের দৃষ্টিকোণ অনুসারে একে তো আরো বেশি দূষণীয় বলে মনে করা হবে। শ্রদ্ধেয় মাওলানা! আপনি আমাকে বলুন সামাজিক ও তামাদ্দুনিক এইসব

সমস্যাদির মধ্যে ইসলামি হুকুম আহকাম পালন করতে যে বাস্তব জটিলতা রয়েছে, তার সমাধান কি?

জবাব : আপনার দ্বিতীয় চিঠি পেলাম। বিয়ে শাদীর ব্যাপারে আপনি যে সংকটের উল্লেখ করেছেন, তাকে বাস্তব সংকট বলে ধরে নিলেও তার সমাধান কোর্টশীপ ব্যতীত আর কিইবা হতে পারে? হ্যাঁ, এটা ঠিকই, জীবন সঙ্গিনী বানানোর পূর্বে পাত্রী ও পাত্রের পরস্পরের গুণাবলী, মেজাজ, অভ্যাসসমূহ, চরিত্র এবং রুচি ও মনমানসিকতা সম্পর্কে জানার যে প্রয়োজন আপনি অনুভব করেন, সেটা যথার্থ। তবে এসব বিস্তারিত তথ্য দুচারটি সাক্ষাৎকারে, তাও আবার আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে, সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এর জন্য মাসের পর মাস পরস্পরের ক্রমাগত মেলামেশা, নির্জনে কথাবার্তা বলা, আনন্দ বিহারে বের হওয়া, সফরে একে অপরের সঙ্গে থাকা এবং নির্দ্বিধায় বন্ধুত্বের পর্যায় পর্যন্ত সম্পর্ক স্থাপন করা অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষেই কি আপনি চান যে, যুবক যুবতীদেরকে এই ধরনের মেলামেশার সুযোগ প্রদান করা হোক? আপনার বিবেচনার এই নিষ্ফল দর্শনের ফলে যুবক যুবতীদের শতকরা কতজন শুধু জীবনবন্ধু খুঁজে বের করার নিষ্ঠাপূর্ণ বাসনায় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং এ সময়ের মধ্যে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নারী পুরুষের যৌন সম্ভোগের স্বাভাবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণে রাখবে, যা বিশেষ করে উঠতি বয়সে তাদেরকে উন্মাদ করে তোলে? আপনি যদি শুধু তর্কের খাতিরেই তর্ক না করতে চান, তাহলে অ াপনাকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ যুবক যুবতীর সংখ্যা আমাদের সমাজে শতকরা দুই তিন জনের বেশি হবেনা। আর তারাও যৌন বিকৃতি থেকে যে মুক্ত থাকতে পারবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই নিরিবিলি সুযোগে জৈবিক তাড়নার স্বাভাবিক চাহিদা তারা পূরণ করেই নিবে। এরপরও কি আপনি মনে করেন যে, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের আকাঙ্ক্ষী হয়ে যেসব ছেলেমেয়ে পরস্পরের সাথে খোলাখুলি মেলামেশা করবে, তারা একে অপরকে জীবনসঙ্গি হিসেবে বাছাই করে নেবে এবং এর নিশ্চয়তা রয়েছে? হতে পারে, এ ধরনের বন্ধুত্বের ফলে হয়তো শতকরা বিশজনের বিয়ে হয়ে যাবে। তাহলে, বাকি শতকরা আশিজন অথবা অন্তত:পক্ষে শতকরা পঞ্চাশ জনকে পুনরায় এ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এমতাবস্থায় ঐ অভিজ্ঞতা লাভকালে আলোচ্য যুবক যুবতীদের মধ্যে বিয়ে আকাঙ্ক্ষায় স্থাপিত সম্পর্কের অবস্থা কি দাঁড়াবে এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ না হওয়া সত্ত্বেও তাদের সম্পর্কে সমাজে যে সন্দেহপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি হয়ে যাবে, তার ফলই বা কি দাঁড়াবে?

অত:পর এটাও আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, পাত্রপাত্রীর জন্য এসব সুযোগের দরজা খুলে দিলে নির্বাচনের ক্ষেত্রও বহু গুণে প্রশস্ত হয়ে যাবে। প্রতিটি

ছেলে শুধুমাত্র একজন মেয়েকেই সম্ভাব্য স্ত্রী হিসেবে নির্বাচনের জন্য মনোনীত করে পরীক্ষা চালাবে না, আর এমনি করে মেয়েরাও সম্ভাব্য স্বামী হিসেবে গ্রহণের জন্য কোনো একজন পাত্রকেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে না, বরং বিয়ের বাজারে প্রত্যেক দিক থেকেই একজন থেকে আর একজন বেশি আকর্ষণীয় মাল হিসেবে আমদানি হবে, যা পরীক্ষা নিরীক্ষার বিভিন্ন স্তর পার হওয়ার পর প্রত্যেক পাত্র পাত্রী পরস্পরের জন্য আরো উন্নততর নির্বাচনী কলাকৌশল পেশ করতে থাকবে। এই কারণেই, প্রথম যে দুইজন পারস্পরিক পরীক্ষার জন্য মিলিত হয়েছিল, তারা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে এবং পরিশেষে বিবাহ সম্পাদন পর্যন্ত পৌঁছুবে এ সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে কমে আসবে।

এছাড়া, আরো একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হলো বিয়ের পূর্বে রোমান্টিক কায়দায় ছেলে মেয়েরা যে কোর্টশীপ করে, তাতে উভয়েই পরস্পরকে তাদের জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলিই দেখায়। মাসের পর মাস ধরে মেলামেশা এবং গভীর বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তাদের দুর্বল দিকগুলি পরস্পরের কাছে পুরোপুরি ফুটে উঠে না। এ সময়ের মধ্যে তাদের যৌন আকর্ষণ এতো বেশি বেড়ে যায় যে, তারা যথাসম্ভব শীঘ্রই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, আর এ উদ্দেশ্যে তারা উভয়েই পরস্পর এমন অঙ্গিকারাবদ্ধ হয় এবং এতো বেশি মুহাব্বাত ও একাত্মতা প্রকাশ করে যে, বিয়ের পর জীবনের বাস্তব সংঘাতে এসে তদের প্রেমিক প্রেমিকা সুলভ এ অভিনয় বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে পারে না এবং শীঘ্রই পরস্পরের ব্যবহারে হতাশ হয়ে ছাড়াছাড়ির (তালাক) পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এর কারণ হলো, তারা উভয়ে পরস্পরের সে আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না, যার অঙ্গিকার তারা একে অপরের সাথে ইতিপূর্বে করেছিল। এমতাবস্থায় তাদের সামনে পরস্পরের সেই সমস্ত দুর্বলতা ফুটে উঠে, যা পারস্পারিক বাস্তব অভিজ্ঞতা কালেই আত্মপ্রকাশ করে, এশ্‌ক বা মুহাব্বাতের অভিনয় যুগে সাধারণত কখনো প্রকাশ হতে পারে না।

এখন আপনি এসব দিকগুলিও চিন্তা করে দেখুন। তারপর মুসলমানদের বর্তমান রীতিনীতি কাল্পনিক ত্রুটি এবং কোর্টশীপ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির মধ্যে তুলনা করে দেখে নিজেই ফায়সালা করুন। এ দুই ধরনের ত্রুটির মধ্যে কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য? এরপরও আপনি কোর্টশীপ গ্রহণযোগ্য মনে করলে আমার সাথে কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। আপনার নিজেকেই এই ফায়সালা করতে হবে যে, যে ইসলাম এহেন পথে যাওয়ার আদৌ অনুমতি দেয় না, সেই ইসলামের সাথে আপনি সম্পর্ক রাখতে চান কি না। আপনি করতে চাইলে অন্য কোনো সমাজ তালাশ করুন। ইসলামের সাধারণ এবং প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেও আপনি জানতে পারবেন যে, সকল বিয়ের জন্য যে ব্যবস্থাকে আপনি হালাল করতে চান, ইসলামের পরিমণ্ডলে এর বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে আপনি যে জটিলতার উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে কোনো রায় কায়েম করার পূর্বে আপনি একথা বুঝে নিন যে, ফিতরত তথা প্রকৃতি নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক করে দিয়েছে। নিজ কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনের জন্য মেয়েদের যেসব উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন, তা তাদেরকে অবশ্যই পেতে হবে এবং ইসলামের সীমার ভিতর রেখে তাদেরকে সে শিক্ষা পুরাপুরিই প্রদান করা যায়। একইভাবে ইসলাম নির্ধারিত সীমায় অবস্থান করার পরও জ্ঞান ও মানগত দিক থেকে নারীদের উন্নতি সম্ভব, যা তাদের নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হতে পারে। এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা মুসলমানদের ত্রুটি, ইসলামের নয়। কিন্তু যে শিক্ষা মেয়েদেরকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করে, তা শুধু মেয়েদের জন্যই নয়, বরং গোটা মানবজাতির জন্য ধ্বংসাত্মক। কাজেই ইসলাম সে সুযোগ দিতে প্রস্তুত নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আপনি আমার রচিত 'পর্দা' কিতাবখানি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৫, সংখ্যা, ৪ জানুয়ারি ১৯৬১ খৃ.)*

দাড়ির ব্যাপারে মুসলমানদের আপত্তি

প্রশ্ন : দাড়ির ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলমানদের চিন্তার ধরনটাই এমন যাতে মনে হয়, কেবলমাত্র উলামা ও মাওলানা সাহেবদেরই দাড়ি রাখা শোভা পায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় সাধারণভাবে সবাই দাড়ি রাখতো। কাজেই অধিকাংশ লোক দাড়ি রাখতে লজ্জা অনুভব করতো না। কিন্তু বর্তমানে মানুষের পোশাক ও বেশভূষার অনেক পরিবর্তন এসেছে। দাড়ি ছাড়া চেহারাই এখন উজ্জ্বল ও ভারিক্কি মনে হচ্ছে। এ অবস্থায় কি সব মুসলমানদের জন্য দাড়ি রাখা অপরিহার্য? মেহেরবানী করে এ ব্যাপারে আমার মানসিক দ্বন্দ্ব দূর করতে সাহায্য করবেন।

জবাব দাড়ি রাখা কেবলমাত্র সুন্নতই নয়, বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রাখার হুকুম দিয়েছেন এবং কামিয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। কাজেই দাড়ি রাখা আলেম উলামা ও মাওলানা সাহেবদের কাজ এবং সাধারণ মুসলমানদের এ ব্যাপারে রাখার বা না রাখার স্বাধীনতা আছে এ ধরনের কথা একটি সম্পূর্ণ অনৈসলামি চিন্তা ও ভাবধারার ফসল। বিশেষ করে কোনো ব্যক্তি যদি দাড়ি কামানো পছন্দ করে এবং দাড়ি রাখা অপছন্দ করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে ইসলামি রুচির পরিবর্তে কাফের সুলভ অনৈসলামি রুচি লালিত হচ্ছে।

বড়ই অবাক লাগে এবং দু:খই হয়। কারণ মুসলমানদের দাড়ি রাখার হুকুম দিয়েছিলেন তাদের নবী ও মহান পথপ্রদর্শক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম। অনুরূপভাবে শিখদের ধর্মগুরুও তাদের দাড়ি রাখার হুকুম দিয়েছিলেন। এই উপমহাদেশে ইংরেজের অধীনে উভয় জাতিই বাস করেছে। কিন্তু শিখেরা তাদের ধর্মগুরুর নির্দেশের এমন অমর্যাদা করেনি, যেমন মুসলমানরা তাদের নবীর নির্দেশের অবমাননা করেছে। আসলে এটা এমন একটা নিকৃষ্টতম অবস্থা, যে জন্য মুসলমানদের লজ্জিত হওয়া উচিত। অথচ উল্টো তারা আজ একথা চিন্তা করতে পারছে যে, দাড়ি ছাড়া চেহারায় ঔজ্জ্বল্য আসে আর দাড়ি রাখলে চেহারা অনুজ্জ্বল ও শ্রীহীন হয়ে যায়। আজকের ফিরিংগীদের অনুসারী মুসলমানরা কেবল দাড়ি কামিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেনা, বরং দাড়ি রাখলেই খারাপ মনে করছে এবং কেউ দাড়ি রাখলে তাকে বিদ্রুপ করছে, যে কোনো প্রকারে তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করতে উদ্যত হচ্ছে। শিক্ষায়তনগুলোয় সর্বতোভাবে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে তো দাড়িতে অযোগ্যতার সার্টিফিকেট গণ্য করা হয়েছে। কোনো কোনো চাকুরীর ক্ষেত্রে আবার দাড়ি রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তাদের দাবি হচ্ছে, দাড়ি রাখলে মানুষ চোস্ত ও কেতাদুরস্ত (smart) থাকতে পারে না। মুসলমান দেশে ও মুসলমান সমাজে আজ এসব কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু শিখেরা এই ইংরেজের শাসনামলে তাদের এই অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে যে, দাড়ি রেখেই তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিভাগে প্রবেশ করতে পারে এবং রাষ্ট্রের বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করতে পারে। সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, এবং সিভিল গভর্নমেন্টের এমন কোনো বিভাগ আছে যে বিভাগে তারা পৌছতে পারেনি? এমন কোনো বড় পদটি আছে, যা নিছক দাড়ি রাখার কারণে তারা লাভ করতে পারেনি? তাদের অযোগ্য গণ্য করার অথবা 'তোমরা স্মার্ট নও', একথা বলার সাহস কারোর ছিলো কি? অথবা কেউ কি হুকুম দিতে পেরেছিল যে, তোমরা আগে দাড়ি চেঁছে এসো তারপর অমুক পদটি পাবে। আজ আমাদের কালো সাহেবদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন, যারা ইংরেজ আমলে কোনো না কোনো শিখ অফিসারের অধীনে কাজ করেছেন। সে সময় তারা একজন দাড়িওয়ালার অধীনে কাজ করেছেন বলে একটুও লজ্জিত হননি। তাদের একজনও তখন শিখদের দাড়ি নিয়ে বিদ্রুপ করা তো দূরের কথা, তার উপর আপত্তি করারও সাহস করেননি। এ সব কিছু প্রমাণ করে যে, শিখদের চারিত্রিক দৃঢ়তা মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশি। তারা মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশি নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, অনেক বেশি নিজেদের ধর্মীয় নেতার আনুগত্য করে এবং তাদের চাইতে অনেক কম মানসিক গোলামীর রোগে ভুগছে। এই ধরনের সুস্পষ্ট হীনতাবোধও কি মুসলমানদের লজ্জিত করবে না। *(তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৬২ খৃ.)*

দাড়ি ও সামরিক বাহিনীর চাকুরী

প্রশ্ন : আমি বিমান বাহিনীতে পাইলট পদের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলাম। মেডিকেল টেস্ট এবং ইন্টারভিউ এর পর আল্লাহর রহমতে অন্যান্য পরীক্ষা ও খেলায়ও কৃতকার্য হই। কিন্তু কোনো কারণ না দর্শিয়েই আমাকে বাদ দিয়ে দেয়া হলো। পরে কিছু লোক আমাকে বললো, দাড়ি না কামানোর জন্যই তুমি বাদ পড়ে গেছ, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি।

এরপরে ডিসেম্বর মাসে আমি পি, এম, এতে ভর্তি হওয়ার জন্য পরীক্ষা দিলাম। প্রথম ইন্টারভিউতে কমিটির সদস্য জনৈক ব্রিগেডিয়ার সাহেব আমাকে বললেন, তুমি প্রথম বার কোহাটে শুধু দাড়ির কারণে বাদ পড়ে গিয়েছিলে। আরো বললেন, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা দাড়িওয়ালা ক্যাডেট পছন্দ করে না এবং এরকম ব্যক্তিকে না নেওয়ারই চেষ্টা করে, তবে পরে অনুমতি নিয়ে দাড়ি রাখা যায়। তারপর আমি লিখিত পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হলাম। অত:পর মেডিক্যাল টেস্ট হওয়ার পর কোহাট যেতে হবে। এ কারণে আমার পাঁচ ভাই এবং ওয়ালেদ সাহেব দাড়ি ছাফ করানোর জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। কিন্তু মানসম্ভ্রম পদ, পদবী ও টাকা পয়সার লোভে আমি এ কাজ করতে প্রস্তুত নই। আমি আমার নিজ অবস্থায় থেকেই হয় ব্যবসা করবো অথবা আরো লেখাপড়া শিখে ইসলামের খিদমতের আকাঙ্ক্ষী। কারণ ঐ সমস্ত চাকুরীতে গেলে আমার ধর্মীয় অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হবে। এ ব্যাপারে ধৈর্য ধরে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই শেষ ফয়সালার পূর্বে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরি মনে করছি। আপনি কিতাব ও সুন্নতের আলোকে পথপ্রদর্শন করে আমাকে বাধিত করুন।

জবাব : আপনি যে অবস্থার কথা লিখেছেন, তা পড়ে অত্যন্ত আফসোস হলো। পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে আজও এমন বহু লোক বর্তমান আছে, যারা দেশ বিভাগের পূর্বে অবিভক্ত ভারতের পদাতিক বাহিনী বা বিমান বাহিনীতে শিখদের সাথে, বরং কেউ কেউ তো তাদের অধীনে কাজ করেছে। তারা ভালো করেই জানে যে, প্রভাব ও প্রতাপ, সৌন্দর্য, কর্মচাঞ্চল্য এবং আরো যেসব চটকদার শব্দ ব্যবহার করে এরা দাড়িকে পদাতিক ও বিমান বাহিনীতে হারাম করে রেখেছে, তার মধ্যকার কোনো ওযর অজুহাত শিখদের দাড়ি মুন্ডন করাতেও পারেনি বা যে কোনো বড় পদ পর্যন্ত পৌছুতেও তাদেরকে বাধা দিতে পারেনি। আজও অবিভক্ত ভারতের পদাতিক বাহিনী, নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীতে শিখরা বড় বড় পদ দখল করে আছে। আর কারো পক্ষে তাদেরকে এ কথা বলার সাহস নেই যে, চাকুরী করতে হলে দাড়ি কামিয়ে এসো, অথবা দাড়ি রাখলে চাকুরী পাবে না। এই মাত্র কয়েক দিন পূর্বে আমাদের এখানকার সামরিক বাহিনীর এক অনুষ্ঠানে

যোগদান করার জন্য ভারত থেকে একজন শিখ লেফটেনান্ট জেনারেল এসেছিলেন। তাঁর মুখে বিঘৎ পরিমাণ দাড়ি ঝুলছিল এবং আমাদের পত্র পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হয়েছিল। আফসোস, তাঁকে দেখেও আমাদের কালো সাহেবদের শরম হলো না। আর তারা একথাও চিন্তা করলো না যে, দাড়ির কারণে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের উপযোগী না হলে, এ শিখ ব্যক্তি কেমন করে লেফটেনান্ট জেনারেল হয়ে গেলো ।

এ দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণ হয় যে, আমাদের মুসলমান অফিসারগণ দাড়িওয়ালাদেরকে চাকুরীতে না নেয়ার এবং চাকুরীর জন্য দাড়ি কামানো শর্ত সাব্যস্ত করার পক্ষে যেসব ওযর অজুহাতের আশ্রয় নিয়ে থাকেন, সেসব বাজে ও অর্থহীন কথা। দাড়ি রাখলে সামরিক বাহিনীতে চাকুরীর যোগ্যতা বা উপযোগিতা থাকে না এটা আসল কথা নয়। বরং আসল কথা হলো, ইংরেজদের গোলামী তাদেরকে শিখদের তুলনায় অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় নামিয়ে দিয়েছে। আমাদের এ সকল অফিসারদের ন্যায় শিখরাও একই ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছে এবং উভয়ই অভিন্ন ইংরেজের অধীনে চাকুরী করে আসছে। কোনো ময়দানেই শিখরা এদের থেকে পিছনে থাকেনি। কিন্তু আজও তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার তাবেদারী করতে গিয়ে হীনমন্যতার এমন চরম প্রান্ত পর্যন্ত পৌছায়নি যে, গুরু নানক, গৌর গবিন্দ এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আনুগত্যকে ঘৃণার চোখে দেখবে বা অযোগ্যতার চিহ্ন মনে করবে। এই সৌভাগ্য (?) শুধুমাত্র আমাদের ইংরেজদের মানসপুত্র ভদ্রলোকদেরই হয়েছে যে, তারা ইংরেজ প্রভুর গোলামী গ্রহণ করে সেই ইংরেজ খোদার পায়ে তাদের সব কিছু নিবেদন করেছে। ইংরেজদের চাকুরী হাসিল করতে গিয়ে সন্তুষ্টির সাথে দাড়ি মুণ্ডন করতে রাজি হয়ে গেছে। শুধু এতটুকুতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, বরং ধীরে ধীরে তারা এতোবেশি বিগড়ে গিয়েছে যে, দাড়িকে অযোগ্যতার চিহ্ন হিসেবে মেনে নিয়েছে। অথচ দাড়ি যেমন শিখদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সুন্নত ছিলো, তেমনি মুসলমান দীনি নেতৃবৃন্দেরও সুন্নত ছিলো। আর যেমন করে শিখদেরকে তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দাড়ি রাখতে হুকুম দিয়েছিলেন, তদ্রুপ নবী সা. ও মুসলমানদেরকে দাড়ি রাখতে তাকীদ করেছেন এবং মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন। এ অবস্থা যখনই আমি প্রত্যক্ষ করি, তখন অত্যন্ত গভীরভাবে আমার মনে হয় যে, হায়, সমসাময়িক এবং একই দেশের অমুসলমানদের তুলনায় আমাদের মুসলিম জাতি কতো হীন প্রমাণিত হচ্ছে।

আমার পরামর্শ শুধু আপনার জন্যই নয়, বরং ঐ সব নওজোয়ানদের জন্যও, যারা নিজেদের মধ্যে দীনী চেতনা এবং আত্মসম্ভ্রমবোধ রাখে, তারা যেনো কোনো অবস্থাতেই হিম্মতহারা না হয়ে যায় এবং কোনো দুর্বলতা প্রদর্শন না করে। প্রত্যেক পরীক্ষায় যোগদান করে যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণ করে দেওয়া তাদের জন্য উচিত এবং এর পরে শুধু দাড়ির কারণে তাদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ করতে

যখন অস্বীকার করা হবে, তখন এই বঞ্চিত হওয়াকেই তারা কবুল করে নিক, তবুও কোনো অবস্থায় তারা যেনো দাড়ি মুণ্ডন না করে। আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন মুসলমান যুবকরা যখন এইভাবে উপর্যুপরি আমল করতে থাকবে, তখন ইন্‌শাআল্লাহ এ কথা প্রমাণ হয়ে যাবে যে, দাড়ি যারা রাখে তারা অযোগ্য নয়, বরং তাদের জন্য চাকুরীর দরজা বন্ধকারী মুষ্টিমেয় অফিসার মূলত চরম সংকীর্ণমনা তথাকথিত 'মোল্লা'। আর তারা সংকীর্ণমনা হওয়ার কারণে নিজ দেশের চাকুরীগুলি থেকে মজবুত চরিত্র ও দৃঢ়মনা নওজোয়ানদেরকে মাহরম করতে চায়। শুধু পেটের জন্য বিবেক ও ঈমান উৎসর্গকারী লোকদেরকেই চাকুরীতে বহাল রাখতে আমাদের সরকার যদি চায়, সমস্ত ঈমানদার এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী লোকদের জন্য চাকুরীর দরজা বন্ধ করে দেওয়াটাই পছন্দ করে তাহলে যতোদিন ইচ্ছা তারা এই ধ্বংসাত্মক পলিসি চালাতে থাকুক। শেষ পর্যন্ত জানতে পারবে, এই নির্বুদ্ধিতার পরিণামে নিজেদের এবং দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি যে তারা সাধন করেছে। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৯, সংখ্যা ৬, মার্চ ১৯৬৫ খৃ.)*

কতিপয় নাস্তিক্যবাদী আধুনিক মতবাদ

প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয় বড় সরকারি চাকুরী করেন। এক সময় ছিলেন বড়ই দীনদার। নিয়মিত নামায রোযা করতেন। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি বই পড়ে তিনি ধর্ম বিরোধী হয়ে উঠেছেন। তার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। নিজের মতবাদ প্রচারে তিনি ক্ষান্ত হচ্ছেন না। তার মোকাবিলায় আমি ইসলামের শিক্ষা ও বিধানসমূহের প্রতিরক্ষায় জোর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন তার সকল প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। তার মতবাদগুলোর সারকথা নিচে পেশ করলাম।

এক. আল্লাহকে তিনি সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন এবং এ বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা স্বীকার করেন। কিন্তু তার মতে আল্লাহ এ বিশ্ব সৃষ্টি করে তারপর একে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই এখন এখানে সব কিছু নিজে নিজেই (automatic) হচ্ছে।

দুই. রসূলকে তিনি একজন সংস্কারক ও রিফরমারের বেশি মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নন। তবে তিনি তাকে সৎ ও অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন বলে স্বীকার করেন।

তিন. কুরআন মজীদকে তিনি (মা'আযাল্লাহ) আল্লাহর রসূলের নিজের লেখা বলেন। কুরআনের অনেক কথাকে তিনি বর্তমানে প্রযোজ্য মনে করেন না। কারণ সেগুলো সেই সময়ের জন্য ছিলো, যখন কুরআন নাযিল হয়েছিল।

চার. ইবাদাত, নামায, রোযা, ইত্যাদিকে কেবল অসৎ কাজ থেকে নিস্কৃতি লাভের সর্বোত্তম উপায় এবং সমাজকে সঠিক পথে চালাবার অস্ত্র মনে করেন।

পাঁচ. শয়তান সম্পর্কিত মতবাদ তাঁর মতে আল্লাহর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ, আল্লাহ নেকীর তওফীক দান করেন, অন্যদিকে শয়তান পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর বাহ্যত শয়তানের বিজয় দেখা যায়।

ছয়. চার বিয়ে, দাসত্ব প্রথা এবং কুরবানীকে তিনি বাজে কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আশা করি কিছু সময় বের করে এ প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে দেবেন, আর যেসব বই পড়ে আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারবো, সেগুলোরও নাম লিখে দেবেন।

জবাব : আপনার আত্মীয় পদস্থ সরকারি কর্মচারীর চিন্তাধারার কথা জেনে আমার বড়ই দু:খ হচ্ছে। আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করুন আর আপনাকে তার প্রভাব থেকে সংরক্ষিত রাখুন। আমার সব বইগুলো পড়ে থাকলে আপনি তার প্রশ্নগুলোর জবাব অতি সহজে দিতে পারতেন। এখনো আমি বইগুলো অধ্যয়ন করে তৈরি থাকার জন্য আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি। কারণ পত্রালাপের মাধ্যমে এতো বড় বড় সমস্যার সমাধান বুঝে নেয়া সহজ ব্যাপার নয়।

সংক্ষেপে এগুলোর জবাব দিচ্ছি।

এক. প্রথম কথা হচ্ছে যে ব্যক্তির চিন্তাশক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি সে কখনো ধারণা করতে পারে না যে, কোনো আইন ও শৃঙ্খলা (Law and order) কোনো প্রবর্তনকারী কর্তৃত্ব (Authority) ছাড়াই প্রবর্তিত হতে পারে এবং জারি থাকতে পারে। বিশ্বে আইন ও শৃঙ্খলা রয়েছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বুদ্ধি কি একথায় সায় দিতে পারে যে, এতো বড় সীমাহীন পর্যায়ে সীমাহীন সময়ে এই কর্তৃত্ববিহীন আইন ও শৃঙ্খলা কায়েম থাকা সম্ভব? কোনো নিরপেক্ষ বিবেক তো একথা মানতে পারে না। কিন্তু দু'টি কারণে বুদ্ধিমান লোকেরাও এই ধরনের মূর্খতার পরিচয় দিয়ে থাকে। প্রথমত তাদের চিন্তা ও দৃষ্টির পরিসর এতো বেশি সংকীর্ণ, যার ফলে তারা যে মহান ও বিপুল ক্ষমতাধর কর্তৃত্ব এই অনাদিকাল থেকে বিশাল বিশ্ব জাহানের আইন ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছেন, তার ধারণা করতে অক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত তারা তাঁকে জানতেই চায় না। কারণ, তাঁকে মেনে নেয়ার পর তাদের জন্য দুনিয়ায় নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার স্বাধীনতা আর থাকে না।

এতো গেলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের চিন্তার গলদের কথা। কিন্তু যারা এ ধরনের কথাবার্তা বলে থাকে তাদেরকে বলুন, এতো বড় বড় বিষয় নিয়ে যারা চিন্তা করে এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করে, তাদের তো কমপক্ষে সততার অধিকারী (Honest) হওয়া উচিত। কিন্তু আপনাদের মধ্যে তাও নেই। আপনারা আল্লাহর রসূল ও কুরআন সম্পর্কে যেসব কথা বলেন সেগুলো ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

কিন্তু এরপরও আপনারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে ফিরছেন। মুসলিম সমাজকে প্রতারিত করার প্রশ্নে আপনাদের মনে একটুও দ্বিধা নেই। আপনারা যদি সত্যিই সততার অধিকারী হয়ে থাকেন, তাহলে যখনই আপনারা এই মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তখনই ইসলাম থেকে নিজেকে সম্পর্কচ্ছেদের কথাও ঘোষণা করে দিতেন এবং নিজেদের নামও পরিবর্তন করে নিতেন। তাহলে মুসলিম সমাজ আপনাদের দ্বারা প্রতারিত হতো না এবং কোনো অমুসলিমের সাথে যে ধরনের লেনদেন ও কাজ কারবার করা পছন্দ করে না, সে রকম লেনদেন ও কাজ কারবার আপনাদের সঙ্গেও করতো না। এই সুস্পষ্ট জালিয়াতি ও প্রতারণার পর ঈমানদার ও আন্তরিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মতামতকে আমরা যে পরিমাণ গুরুত্ব দেই, আপনাদের মতামতকে তেমনি গুরুত্ব দেয়া আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন।

দুই. রসূলের ব্যাপারে তাদের চিন্তা বিপরীতধর্মী। একদিকে তারা রসূলকে সৎ ব্যক্তি বলে স্বীকার করছে। তাদের এ বক্তব্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, তাহলে তারা রসূলকে সাচ্চা ও সত্যবাদী বলেও মেনে নিচ্ছে (তবে মিথ্যাবাদীও সৎ হতে পারে এমন কোনো থিওরী যদি তারা মেনে নিয়ে থাকে তাহলে অন্য কথা) আবার অন্যদিকে তারা রসূলের এ দাবিকেও মিথ্যা বলছে যে, তিনি নিছক একজন সংস্কারক নন, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। একজন সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ঐ দু'টো বক্তব্যকে একসঙ্গে মানতে পারে না। তাদের জানা উচিত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের তেইশটি বছর প্রতি মুহূর্তে নিজের বিরোধীদের সাথে কেবলমাত্র এই একটি বিষয়ের জন্যই সংগ্রাম (Struggle) চালিয়েছেন, যার সারকথা ছিলো তিনি নবুওয়াতের দাবি করছিলেন এবং তার বিরোধী পক্ষ তা মানতে চাচ্ছিলো না। এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি দু'প্রকার মতবাদই পোষণ করতে পারে। প্রথমত, যদি তিনি তাঁকে সাচ্চা ও সত্যবাদী মনে করেন, তাহলে তাঁকে রসূল বলে মেনে নেবেন। আর দ্বিতীয়ত, যদি তাঁকে রসূল বলে মেনে নিতে রাজী না হন, তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) তাঁকে চরম মিথ্যুক ও প্রতারক বলে স্বীকার করবেন। এই দু'টি মতের মাঝখানে একটি তৃতীয় মত প্রকাশ করা এবং তিনি সত্যবাদী ছিলেন আবার রসূলও ছিলেন না, একথা বলা একেবারেই অযৌক্তিক।

এর জবাবে এ ধরনের লোকদের পক্ষ থেকে বড় জোর দু'টি কথা বলা যেতে পারে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম নিছক সংস্কারের উদ্দেশ্যে নবুয়তের দাবি করেছিলেন, এভাবে তিনি নিজের নামে যেসব বিধানের পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করতে পারছিলেন না, আল্লাহর নামে সেগুলোর পক্ষে স্বীকৃতি আদার করতে সক্ষম হবেন। দ্বিতীয় হচ্ছে তিনি নিজের এ দাবির ব্যাপারে আন্তরিক (Sincere) ছিলেন

ঠিকই কিন্তু আসলে তিনি নবী ছিলেন না, বরং তাঁর ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি নবী।

এর মধ্যে প্রথম কথাটি যে ব্যক্তি বলে, আমার মতে নৈতিক দিক দিয়ে সে বড়ই বিপজ্জনক। তার থেকে সবার সাবধান থাকা উচিত। কারণ তার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, তার মতে সৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অসৎ পন্থা অবলম্বন করা কেবল বৈধই নয়, বরং বড়ই সম্মানজনক। তাই সে এমন এক ব্যক্তিকে সংস্কারক ও সৎ মনে করে, যে তার মতে নিছক সংস্কারের জন্য (নাউযুবিল্লা) নবুয়্যত দাবির ন্যায় বিরাট প্রতারণা করেছিল) এ ধরনের নিকৃষ্ট মতবাদের অধিকারী ব্যক্তি যদি আগামীকাল কোথাও কোনো সৎ উদ্দেশ্যে (যাকে সে সৎ মনে করে) চুরি করে, বা কোনো জাল দলিল দস্তাবেজ তৈরি করে অথবা কোনো মারাত্মক ধরনের নৈতিক অপরাধ করে বসে, তাহলে মোটেই বিস্ময়কর হবে না। কারণ, তার মতে একজন প্রতারক যদি সংস্কারের জন্য প্রতারণা করে সৎ ও সংস্কারক হতে পারে, তাহলে সে নিজে সৎ উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্য অপরাধ করা থেকে দূরে থাকবে কেন?

দ্বিতীয় কথাটি যে ব্যক্তি বলে, সে বুদ্ধিগত দিক দিয়ে ঠিক ততটাই নিকৃষ্ট, যেমন নৈতিকতার দিক দিয়ে প্রথম কথাটি ব্যক্তকারী ব্যক্তি নিকৃষ্ট ছিলো। এই ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা খুব কম করে হলেও এতোটুকু বলতে পারি যে, সে অনেক বড় সমস্যা সম্পর্কে অনেক কম চিন্তা করে মতামত প্রকাশ করার রোগে ভুগছে। কারণ স্বল্প বুদ্ধির অধিকারী না হলে সে কখনো এ কথাটির সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করতো না যে, একদিকে এক ব্যক্তির অত্যধিক বুদ্ধি বিবেকের কারণে তার বিরোধীরা তাকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ও সফলতম নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করে না, আবার অন্যদিকে নিজের ব্যাপারে সে নিজে ২৩ বছর থেকে অনবরত বিরাট বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে থাকে এবং এই বিভ্রান্তির ভিত্তিতে নিজের সব কাজ চালাতে থাকে, বরং দিনের পর দিন কুরআনের এক একটা পূর্ণাঙ্গ সূরা রচনা করে দুনিয়াবাসীকে শুনাতে থাকে এবং এর পরও এ সূরাগুলি তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে বলে মনে করতে থাকে। আমার মতে, যে ব্যক্ত এ ধরনের কথাকে সম্ভাব্য ও যুক্তিসংগত মনে করে তার নিজের বুদ্ধি সম্পর্কেই সংশয় জাগে। তার বুদ্ধি যদি ভ্রষ্ট না হতো তাহলে সে নিজেই বুঝতে পারতো যে, কোনো পাগলের পক্ষেই কেবল মাত্র এ ধরনের বিভ্রান্তিতে পড়া সম্ভব। আর কোনো পাগল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় এহেন সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করতে পারে না।

তিন. কুরআন সম্পর্কে তার যে চিন্তা আপনি উদ্ধৃত করেছেন, সে সম্পর্কেও আমি উপরে বর্ণিত একই মত পোষণ করি। অর্থাৎ, তিনি কোনো বিষয়ে পুরোপুরি না

জেনে এবং সে সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা না করেই মত প্রকাশ করতে অভ্যস্ত। তাকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি সারা বছর কতবার গভীর তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করেছেন, যার ফলে সে সম্পর্কে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করলেন? যদি তিনি ঈমানদারীর সাথে মেনে নেন যে, এভাবে কুরআনের তাত্ত্বিক অধ্যয়ন তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তাহলে তাকে জানিয়ে দিন যে, তাত্ত্বিক অনুসন্ধান ছাড়া এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রায় দেয়া কোনো বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ব্যক্তির উপযোগী নয়। আর যদি তিনি ভালোভাবে অনুসন্ধানের পর এ মত ব্যক্ত করার দাবি করে থাকেন, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করুন, কুরআনের মধ্যে তিনি কি এমন সাক্ষ্য পেয়েছেন, যার ভিত্তিতে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কুরআন হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের বাণী? এই সঙ্গে এও জিজ্ঞেস করুন, কুরআনের কোন্ কোন্ কথাকে তিনি অকার্যকর ও কুরআন নাযিলের সময় পর্যন্ত কার্যকর বলে পেয়েছেন? তার কাছ থেকে আগে এ বিষয়গুলো নির্ধারণ করে দিন। তারপর আমাকে লিখুন। তাহলে আমি তার অনুসন্ধান লব্ধ ফলে লাভবান হতে পারবো।

চার. ইবাদত সম্পর্ক তার যে মতবাদ আপনি পেশ করেছেন, তাও মারাত্মক বিভ্রান্ত চিন্তার (Confused thinking) ফসল, বরং চিন্তাহীনতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সম্ভবত তিনি কখনো একথাটি চিন্তাও করে দেখেননি যে, নামায, রোযা, ইত্যাদি আমল যখন আন্তরিকতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, একমাত্র তখনই তা অসৎবৃত্তি ও অসৎপ্রবণতা থেকে বাঁচার এবং সমাজকে সঠিক পথে চালাবার সর্বোত্তম উপায় হতে পারে। আর আন্তরিকতার সাথে মানুষ এগুলো তখনই করতে পারে যখন সে ঈমানদারীর সাথে মনে করে যে, আল্লাহ আছেন, আমি তাঁর বান্দা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই তাঁর রসূল ছিলেন এবং একদিন আখেরাতের জীবন শুরু হবে আর সেখানে আমাকে আমার আমলের হিসেব দিতে হবে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এসব কথাকে উদ্ভট মনে করে এবং একথা মনে করতে থাকে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিছক সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে এই সব মিথ্যার পাহাড় রচনা করেছেন, তাহলে কি আপনি মনে করেন, এ অবস্থায়ও এ ইবাদতগুলো অসৎবৃত্তি থেকে বাঁচার ও সমাজকে সঠিক পথে চালাবার উপায় হতে পারবে? একদিকে এ ইবাদতগুলোর এই সমস্ত কল্যাণকারিতার ফিরিস্তি দেয়া, আবার অন্যদিকে যে চিন্তার উপর কল্যাণ-কারিতাগুলোর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে সেগুলোকে ভেঙ্গে দেয়ার প্রচেষ্টা, ঠিক যেনো কোনো কার্তুজ থেকে সমস্ত বারুদ বের করে নিয়ে একথা দাবি করা যে, এ কার্তুজটি বাঘ শিকারে একেবারে অব্যর্থ।

পাঁচ. শয়তানের ব্যাপারে তার আপত্তি দেখে পরিষ্কার বুঝা যায়, কুরআন মজিদ মানুষ ও শয়তানের ব্যাপারে কি কি তত্ত্বকথা বর্ণনা করেছে তিনি সারা জীবনে একবারও তা জানার চেষ্টা করেননি। একথা না জেনে, কেবলমাত্র শোনা কথার উপর ভিত্তি করে তিনি একটা ভাসা ভাসা কিছু কল্পনা করে তার উপর আপত্তি জানিয়ে বসে আছেন। এ আপত্তিটি আসলে তার নিজের চিন্তার বিরুদ্ধেই উত্থাপিত হয়। কুরআন যে চিন্তা পেশ করেছে তার উপর এর কোনো আঘাত আসে না।

কুরআন যে চিন্তা পেশ করেছে তা হচ্ছে, আল্লাহ্ মানুষকে একটি সীমিত পর্যায়ের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসন দিয়ে এ দুনিয়ায় পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। আর শয়তানকে তার নিজের দাবি অনুযায়ী মানুষের এ পরীক্ষায় তাকে অকৃতকার্য করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা চালাবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবে শর্ত হচ্ছে, শয়তানের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র প্ররোচনা ও লোভ দেখানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। জোর করে নিজের পথে মানুষকে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা শয়তানকে দেয়া হয়নি। এই সঙ্গে আল্লাহ নিজেও জোরপূর্বক মানুষকে নেকী ও কল্যাণের পথে পরিচালনা করা থেকে বিরত থেকেছেন। তিনি কেবল এতোটুকু করেছেন যে, নবী ও কিতাব পাঠিয়ে মানুষের সামনে সঠিক পথটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এরপর মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সে চাইলে আল্লাহর দেখানো পথ নিজের জন্য বেছে নিতে পারে এবং তার উপর চলতে পারে, আবার চাইলে শয়তানের প্ররোচনা গ্রহণ করতে পারে এবং শয়তান তার সামনে যে পথ পেশ করে, তার উপর চলার জন্য নিজের সমস্ত শ্রম ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে পারে। দু'টি পথের যে কোনোটি মানুষ নিজের জন্য বেছে নেয়, আল্লাহ তার উপর তাকে চলার ক্ষমতা ও সুযোগ দান করেন। কারণ, এ ছাড়া পরীক্ষার দাবি পূরণ সম্ভব নয়। এ অবস্থাটি ভালোভাবে বুঝে নেয়ার পর এবার বলুন, শয়তানের চ্যালেঞ্জ আসলে কার বিরুদ্ধে? আল্লাহর বিরুদ্ধে না মানুষের বিরুদ্ধে? আর মানুষদের মধ্যে যারা শয়তানের পথে চলে যায়, তাদের ব্যাপারে শয়তানের জয় হয় কার বিরুদ্ধে? মানুষের না আল্লাহর বিরুদ্ধে? আল্লাহ তো মানুষ ও শয়তানকে স্বাধীনভাবে কুস্তি লড়ার সুযোগ দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, মানুষ জয়লাভ করলে জান্নাতে স্থান পাবে, আর শয়তান জয়লাভ করলে পরাজিত ব্যক্তি ও তাকে ভুল পথে পরিচালনাকারী শয়তান উভয়ই জাহান্নামে যাবে। এখন কি আপনি চান আল্লাহ্ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে জোরপূর্বক মানুষকে সফলকাম করার ব্যবস্থা করবেন?

ছয়. চার বিয়ে, দাসত্ব প্রথা এবং কুরবানী সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলা মুশকিল। এসব বিষয়ে বেশ কয়েকবার বিস্তারিতভাবে আমার মতামত পেশ করেছি। একাধিক বিবাহ সম্পর্কে জানতে হলে আপনি আমার তাফসীর তাফহীমুল কুরআন প্রথম খণ্ডের সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি নির্দেশিকার (Index) সাহায্যে

বের করে (বিয়ে, ইসলামি আইন এবং বিবাহিত জীবন সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি) অধ্যয়ন করুন। এছাড়া, সরকার নিয়োজিত কমিশনের প্রশ্নপত্রের জবাবে আমি যা বলেছিলাম তার মধ্যেও এ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

দাসত্ব সম্পর্কে আপনি আমার নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করুন :

১. রাসায়েল ওয়া মাসায়েল, ১ম খণ্ড, প্রবন্ধ : "যুদ্ধের ময়দানে যৌন অপরাধ"।"
২. রাসায়েল ওয়া মাসায়েল, ২য় খণ্ড, প্রবন্ধ : "ইসলামে দাসত্বকে নিষিদ্ধ করা হয়নি কেন?
৩. তাফহীমাত, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রবন্ধ : "দাসত্বের মসলা" এবং "দাস দাসীদের সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন।"
৪. তাফহীমুল কুরআন প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। সূচিতে 'দাসত্বের'; শিরোনামায় পৃষ্ঠাসমূহের বরাত দেয়া আছে।
৫. মাসিক তরজমানুল কুরআন, জুন সংখ্যা ১৯৫৬ খৃ.। "দাসীর সংজ্ঞা আর হালাল হওয়ার দলিল, একাধিক বিবাহ এবং দাসী।"
৬. কুরবানী সম্পর্কে আপনি আমার রচিত তাফহীমাত ২য় ভাগের মধ্যে কুরবানী সম্পর্কে প্রবন্ধসমূহ পড়ুন। এছাড়া আমার পুস্তিকা "মাসআলায়ে কুরবানী" ইত্যাদি বইগুলিও পড়ুন। এসব বই ও প্রবন্ধ পড়ে ইনশাআল্লাহ নিজে বুঝা ও অপরকে বুঝানোর ব্যাপারে আপনি আরো সহায়তা লাভ করবেন। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৮, সংখ্যা ৩, জুন ১৯৬২ খৃ.)*

পাকিস্তানে খৃষ্টধর্ম প্রসারের মূল কারণ

প্রশ্ন : এদেশে বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা সৃষ্টি হচ্ছে। আর সর্বাধিক বিপদজনক ফিৎনার মধ্যে খৃষ্টবাদ অন্যতম। এজন্য যে, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ছাড়াও সাধারণ মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবনতির কারণে এ ফিৎনা থেকে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা অপর কোনো বিষয় থেকে উদ্ভূত হয় না।

এইসব অবস্থার মধ্যে যখন এই বিরাট ফিৎনার দরজা বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রকার যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হওয়া একান্ত জরুরি ছিলো, তখন আপনার পক্ষ থেকে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না, বরং আপনি এ ফিৎনা থেকে পুরোপুরি দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন। এতোদিন ধরে আপনার এই দীর্ঘ নীরবতার অর্থ আমি এই বুঝেছি যে, আপনার বিবেচনায় ধর্মীয় দিক দিয়ে খৃষ্টান মিশনারীদের বর্তমান তৎপরতা এমন কোনো পাকড়াও করার বিষয় নয় এবং এদেশে এ ফিৎনার প্রচার অভিযান চালানোর হক রয়েছে, তাতে মুসলমানদের মুর্তাদ হয়ে যাওয়ার মত বিরাট দুর্ঘটনাও সংঘটিতই হোক না কেন। মেহেরবানী করে এ অধমের এ সৃষ্ট খটকা দূর করুন।

জবাব : প্রচার ও তাবলীগ দ্বারা যেসব ফিৎনা ছড়ায়, তার মুকাবিলাও একই ধরনের প্রচার তাবলীগের মাধ্যমেই করা সম্ভব। আর এ কাজে জেনে বুঝে আমি কোনো গাফলতি কখনো করিনি। কিন্তু যেসব ফিৎনা ছড়ানোর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ জড়িত তার চিকিৎসা ব্যবস্থা ঐ কর্তৃপক্ষের সংশোধন অথবা পরিবর্তন ব্যতীত আর তো কিছু নযরে আসে না, সেগুলি শুধু প্রচার ও তাবলীগের দ্বারা ঠেকানো যায় না।

খৃষ্টধর্মের ব্যাপারে এ অবস্থাই দেখা দিচ্ছে। আপনি নিজেও আপনার চিঠিতে তা স্বীকার করেছেন। এ দেশে যারা খৃষ্টধর্ম কবুল করছে অথবা পূর্বে যারা কবুল করেছিল, তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই এমন আছে, যারা কোনো বিশেষ দলীলের ভিত্তিতে একথা মেনে নিয়েছে যে, খোদা তিনজন, অথবা হযরত ঈসা আ. খোদার পুত্র, অথবা কোনো এক ব্যক্তির শূলীতে চড়া অন্যের গুনাহের কাফফারা হতে পারে। এ ধরনের আকীদা বিশ্বাসকে সঠিক মনে করে এবং ইসলামের যুক্তিসংগত আকীদা ভুল বুঝে মুসলমান থেকে খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার সংখ্যা কতই বা হতে পারে। আসলে একমাত্র খৃষ্টান মিশনারীদের তাবলীগই লোকদেরকে খৃষ্টধর্মের কোলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা নয়, বরং বিভিন্ন মিশন হাসপাতাল এবং স্কুলসমূহের কর্মচাঞ্চল্যই এর আসল কারণ। আর এর সম্প্রসারণের জন্য আমাদের সরকারের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য বিরাট অংশ আছে। এরপরে আমাদের মহান শাসকবর্গের উপর পাদ্রীদের যে প্রভাব বিরাজমান, তা ঈসায়ী ধর্ম প্রসারে আরো বেশি মদদ যোগাচ্ছে। এসব কারণ দূর করার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমার, আপনার এবং গোটা আলেম সমাজের সম্মিলিত তাবলীগের দ্বারা কোনো বিশেষ ফল হতে পারে না।

ঈসায়ীদের হাসপাতালে গিয়ে যে কোনো লোক নিজের চোখে দেখে আসতে পারে যে, এগুলি না নি:স্বার্থ জনসেবাসমূলক কোনো সংস্থা, আর না ব্যবসায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র, বরং সেখানে খোলাখুলি এবং প্রকাশ্যভাবে ঈমান হরণ করার কাজ চলছে। এসব সংস্থায় মুসলমানদের থেকে মোটা অংকের ফিস গ্রহণ করা হয়, আর খৃষ্টানদের চিকিৎসা হয় সম্পূর্ণ বিনা পয়সায়। তদুপরি অসুস্থদের মধ্যে খৃষ্টধর্মের তাবলীগও করা হয়। এমতাবস্থায়, কোনো দরিদ্র লোক যে নিজের বা তার কোনো আত্মীয়ের চিকিৎসার ক্ষমতা রাখে না, সে চিকিৎসা পাওয়ার সুবিধার্থে নিজ ধর্ম পরিবর্তন করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার লালসা সহজেই পোষণ করতে পারে।

খৃষ্টান মিশনারী স্কুল কলেজের অবস্থাও একই। সেখানেও মুসলমানদের থেকে চড়া ফিস গ্রহণ করা হয় এবং ঈসায়ীদেরকে মুফতে শিক্ষা দান করা হয়, বরঞ্চ তাদেরকে বিদেশেও শিক্ষা গ্রহণ করার নানা প্রকার সুবিধা প্রদান করা হয়। এখানেও গরীব লোকের জন্য একই প্রকার লোভ বর্তমান আছে যে, তারা

বাচ্চাদেরকে নিজেরা যখন শিক্ষা দিতে পারছে না, সে অবস্থায় শুধু ধর্ম পরিবর্তন করে নিলেই শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়ারও বিভিন্ন উন্নতির পথ খুলে যেতে পারে।

এই দুই ধরনের সংস্থাই আমাদের দেশে এক দিকে বৈদেশিক অর্থের সাহায্যে চলছে। অপর দিকে আমাদের নিজেদের সরকারও তাদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে গ্রান্ট (Grant) দেয়া হয়। প্রয়োজনীয় ভূমি দেয়া হয় এবং ঐ সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় যা, মুসলমানদের নিজেদের মাদারাসাগুলোতে (ধর্মীয় শিক্ষাযন্ত্রে) কখনো দান করা হয় না। আর তাদের ব্যাপারে এ প্রশ্ন করা থেকে সম্পূর্ণভাবে চোখ বন্ধ করে রাখা হয় যে, বিদেশ থেকে আগত টাকা পয়সা যা এসব প্রতিষ্ঠানে খরচ করা হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য কি? গ্রাম গঞ্জে চড়িয়ে পড়ে এ টাকা পয়সা দিয়ে তারা যে কাজ করছে, তার পিছনে নিছক ধর্ম প্রচার ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য কাজ করছে? এর স্পষ্ট অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের নিজেদের সরকার ধর্মীয় উদারতার সর্বপ্রকার যুক্তিসংগত সীমা অতিক্রম করে, তাদের এই কাজের উপর শুধু সন্তুষ্টই নয়, বরং এ ব্যাপারে সাহায্যকারীও হয়ে থাকে যে, অন্যরা অর্থ কি শক্তি বলে মুসলমানদের ঈমান খরিদ করে নেয় নিক।

খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রভাব প্রতিপত্তির অবস্থা এই যে, আজ আমাদের গ্রাম্য এলাকার সাধারণ লোক, যারা খৃষ্টান নয়, তাদেরকে জালেমদের যুলুম থেকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থাই নেই। অথচ প্রতিটি এলাকায় খৃষ্টান জনপদের সাহায্যার্থে একজন পাদ্রী মওজুদ রয়েছে। যারা থানা থেকে সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরের এবং প্রত্যেক পদমর্যাদায় শাসকবর্গের নিকট থেকে শুধু ইনসাফই আদায় করে ছাড়ে না, বরং তাদের জন্য অবৈধ সুযোগ সুবিধাও হাসিল করে নেয়। মুসলমানদের কোনো আলেমের পক্ষে ঐসব শাসকের দরবারে সেই প্রবেশাধিকার নেই, যা খৃষ্টান পাদ্রীদের জন্য আছে। এক সময় ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টিতে মুসলমান আলেমরা যেমন ঘৃণ্য ও হেয় ছিলো, আজকে আমাদের এসব শাসকদের চোখেও তেমনই ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয়। কিন্তু খৃষ্টান ফাদাররা ইংরেজ শাসকদের নিকট যেমন 'ফাদার' (Father) ছিলো, আজ এইসব শাসকদের নিকটও তেমনি ফাদার। এটা আর একটি কারণ, যার ভিত্তিতে আজকের অসহায় গ্রামবাসী পুলিশ, জমিদার এবং প্রভাবশালী গুণ্ডাদের যুলুম থেকে বাঁচার জন্য খৃষ্টধর্মের নিকট আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে।

গরীবদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ করার কারণ এইগুলি। এখন স্বচ্ছল শ্রেণীর অবস্থা, এ ব্যাপারে আমাদের সরকারের পলিসির ফলেই স্বচ্ছল লোকেরা নিজেদের সন্তানদের মাতৃভাষা, নিজেদের জাতীয় তাহযীব এবং দীনি শিক্ষা প্রদান

করাকে নিরর্থক মনে করে এবং তাদেরকে এমন শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে, যার কারণে তারা কথাবার্তা, চালচলন ও অভ্যাসের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ইংরেজ অথবা আমেরিকান বনে যায়। এই উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকে এমনসব খৃষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠানে পাঠায়, যেখানকার পুরো পরিবেশ তাদেরকে ইসলাম বিরোধী বানায়, ইসলামি তাহযীব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং ইসলামি শিক্ষাদীক্ষা থেকে শুধু বঞ্চিতই করে না, বরং এ শিক্ষা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক এবং বিদ্রোহী করে তোলে। এরপর এসব নওজোয়ানরা যদিও বা খৃষ্টান হয় না, কিন্তু তাই বলে তারা মুসলমানও থাকে না। বরং মুসলমানদের তুলনায় তারা খৃষ্টানদের নিকটবর্তী হয়ে যায়। শিক্ষা সমাপ্তির পর এরাই বড় বড় অফিসার হয় এবং তাদের জন্যই উঁচু পদগুলি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তাদের সহানুভূতি খৃষ্টধর্মের তুলনায় ইসলামের সঙ্গে বেশি হবে এবং খৃষ্টধর্মকে প্রতিরোধ করার আবেগ তাদের মধ্যে পয়দা হবে, এমনটা কে আশা করতে পারে।

এসব অবস্থাকে সামনে রেখে আপনি নিজেই বলুন, খৃষ্টধর্মের প্রতিরোধে শুধু প্রবন্ধ লিখে এবং গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে এই প্লাবনকে কতক্ষণ পর্যন্ত রুখা যেতে পারে। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৮, সংখ্যা ৩, জুন ১৯৬২ খৃ.)*

ছবির সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা

প্রশ্ন : ১৯৬২ সালের জুলাই মাসের তরজমানুল কুরআন (তাফহীমূল কুরআনে) আপনি কিতাব ও সুন্নতের আলোকে ছবি সম্পর্কিত মাসলার যে অনুপম সমাধান দিয়েছেন, সত্য বলতে কি, মনমস্তিষ্ক মুসলমান হলে সে আলোচনা দ্বারা সত্য কথা অন্তরে প্রবেশ করবেই। ছবি হারাম হয়ে থাকলে আপনার ছবি পত্র পত্রিকায় দেখা গেলে দু:খ লাগারই কথা। সাধারণত ওলামায়ে কেরাম ছবিকে নাজায়েয বলে, কিন্তু তাদের কাজ এর বিপরীত।

জবাব : সম্ভবত আপনি এই চিন্তায় আছেন যে, আজকালও ছবি তখনই উঠে যখন মানুষ নিজে ছবি তোলে, অথচ (বাস্তব অবস্থা এই) আজকের যুগে ছবি ঠিক তেমনিভাবে তোলা হয়, যেমন করে কোনো মানুষকে হঠাৎ করে গুলি মেরে দেয়া হয়। সংবাদপত্রসমূহে আমার যেসব ছবি তোলা হয়েছে, তাতে আমার নিজের ইচ্ছার কোনো দখল নেই। শুরু থেকেই আমি ছবি সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে রেখেছি। এসত্ত্বেও লোকেরা ছবি তুলে নিতে বিরত থাকে না। এখন এর জন্য তারাই দায়ী। এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করার চাইতে আপনার পক্ষে তাদেরকেই জিজ্ঞেস করা উচিত। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৮, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর ১৯৬২ খৃ.)*

নিকাহ শব্দের আসল অর্থ

প্রশ্ন : ১৯৬২ সালের মার্চ সংখ্যা তরজানুল কুরআনে লিখিত তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে আপনি যেসব শরঈ হুকুম আহকাম উদ্ভাবন করেছেন, তার মধ্যে প্রথমেই

নিকাহ্ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, কুরআন নিকাহ্ শব্দের অর্থ শুধু আকদকেই বুঝিয়েছে, অথবা পারিভাষিক অর্থে নিকাহ্‌কে শুধুমাত্র আকদ এর জন্য ব্যবহার করেছে। এই সামগ্রিক নীতি আমাদের এখানকার বহুল প্রচলিত ফিকহী মতবাদ অর্থাৎ হানাফি আলেমদের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়, আর অধিকাংশ মুফাসসীরদের ব্যাখ্যারও খেলাফ। আশ্চর্য, আপনি এমন একটি কথাকে "সামগ্রিক বিধি" হিসেবে ব্যক্ত করেছেন, যার পক্ষে এ পর্যন্ত অন্য কেউ মত প্রকাশ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জবাব : নিকাহের আভিধানিক অর্থ কি, সে বিষয়ের আলোচনা বেশ দীর্ঘ। এ বিষয়ে আরবি ভাষাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। নিকাহের আসল অর্থ সম্পর্কে আলেমদের একদলের মত হচ্ছে, এ শব্দটি শাব্দিক দিক দিয়ে সহবাস এবং আক্দ উভয়ের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত। আর এক দলের অভিমত, অর্থের দিক দিয়ে শব্দটি উভয় অর্থে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তৃতীয় দল বলেন, এর আসল অর্থ বিবাহ বন্ধন (আক্দ), আর সহবাস হলো এর রূপক ব্যবহার। চতুর্থ দলের কথা হলো, এর আসল, অর্থ সহবাস করা, আর আক্দ রূপক অর্থে ব্যবহার। কিন্তু রাগেব ইসফাহানী পরিপূর্ণ জোর দিয়েই এ দাবি করেছেন যে, 'আকদ'ই নিকাহ্ শব্দের মূল অর্থ। তারপর ব্যবহারিক অর্থে একে সহবাসের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, সহবাসের অর্থে যতোগুলি শব্দ আরবি এবং অন্যান্য ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে সবগুলিই অশ্লীল। কোনো শরীফ লোক কোনো ভদ্রমণ্ডলীর বৈঠকে এ শব্দটিকে মুখে উচ্চারণ করাই পছন্দ করবে না। এখন এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, যে শব্দটি প্রকৃতপক্ষে বিশেষ এক কাজের জন্য সৃষ্ট সেটাকে সমাজের শাদী বিয়ের জন্য রূপকভাবে কিংবা অপ্রকৃতভাবে ব্যবহার করা হবে। এ অর্থ বুঝার জন্য দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষায় শালীন শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে, অশ্লীল শব্দাবলী নয়।

সাধারণত হানাফী আলেমগণ এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ বলেন, সহবাস আর রূপক অর্থ বলেন 'আক্দ'। কিন্তু এটাও হানাফীদের ঐক্যমত নয়, হানাফী শায়খদের কেউ কেউ এ শব্দের অর্থ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, এটা সহবাস ও আক্দ দুই অর্থেই মৌলিকভাবে গণ্য। আরপর তাদের মতে নিকাহের 'শরঈ' পরিচয় হচ্ছে,

هو عقد يفيد ملك المتعة قصدا অথবা عقد وضع لتمليك منافع البضع

(অর্থাৎ, বিয়ে এমন এক পারস্পরিক 'বাঁধন' বা 'চুক্তি', যার অন্তরালে মিলন তথা সহবাসের অধিকার অর্জিত হয়। কিংবা বিয়ে এমন এক আকদ বা বন্ধন, যাকে সহবাসের মালিকানা স্বত্ব বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে)।

আমার মতে নিকাহ্ কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বর্ণিত একটি পারিভাষিক শব্দ। বিবাহ বন্ধনই এর অনিবার্য অর্থ এবং একে সাধারণভাবে ব্যবহার করতে গেলে,

এর এই অর্থই গ্রহণ করতে হবে। তবে এর মধ্যে যদি এমন কোনো ইংগিত থাকে, যদ্বারা সহবাস অথবা আক্‌দ ও সহবাস দু'টিই বুঝানো হয়েছে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা, এখন রইল এর অর্থ। আক্‌দ না করেই সহবাস করার কথা তো আভিধানিক অর্থে যদিও নিকাহের অর্থ বলা যেতে পারে, কিন্তু আক্‌দ না করেই 'সহবাস' করাকে কুরআন হাদিস নিকাহ্ বলে স্বীকার করে নিয়েছে, এমন উদাহরণ আমার জানা নেই। আপনার জানা থাকলে পেশ করতে পারেন।

[এর জবাবে প্রশ্নকারী বিভিন্ন ফিকাহ্‌র কিতাব থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি লিখে পাঠান। তার জবাব নিম্নলিখিত রূপে দেয়া হয়] :

আফসোস, কোনো বিষয়ের দীর্ঘ জবাব দানের অবসর আমার নেই। তা সত্ত্বেও আরেকবার আমার দাবিকৃত কথাটি সংক্ষিপ্তভাবে স্পষ্ট করে দিচ্ছি। এর পরেও মনে প্রশান্তি না আসলে আমার আর কিছুই করার নেই। আপনি নিজের মতের উপর কায়েম থাকতে পারেন আর আমি আমার মতের উপর।

নিকাহের দ্বারা 'আক্‌দ' এবং 'আক্‌দের' পর সহবাস, এ অর্থ গ্রহণ করায় কোনো মতভেদ নেই। মতবিরোধ শুধু এই ব্যাপারে যে, বিনা আক্‌দে সহবাস অর্থে কি নিকাহ্ শব্দ ব্যবহার করা যাবে? এ অর্থ গ্রহণ করতে আমার আপত্তি আছে। যেহেতু সে অবস্থায় সহবাসের জন্য জেনা ও সাফাহ্ শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। আর সে অশ্লীল কাজের জন্য নিকাহ শব্দটি ব্যবহার জায়েয স্বীকার করার জন্যে আপনি যে দলিলগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার থেকে আরো মজবুত দলিল প্রয়োজন।

এটাও গ্রহণযোগ্য কথা নয় যে, নিকাহ শব্দটি মূলত সহবাসের জন্যই গঠন করা হয়েছিল, পরে মূল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। সঙ্গম কাজের জন্য দুনিয়ার যে কোনো ভাষাতেই যে কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (অর্থাৎ, যার দ্বারা পরোক্ষ বা আকারে ইংগিতে না বুঝিয়ে অবিকল ঐ কাজটিকেই বুঝায়), তা শ্রুতিকটু ও অশ্লীল এবং কোনো ভাষাতেই তা 'আকদ' এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। উর্দু ভাষায় সে কাজের জন্য যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, সেটা বিয়ের অর্থে ব্যবহার করার ইচ্ছা কে করতে পারে?

আপনার উদ্ধৃত বরাতগুলির মাধ্যমেও একথা প্রমাণিত হয় যে, নিকাহ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ মিলন। এখন একথা কি গ্রহণযোগ্য যে, শব্দটি (আক্‌দ চাই হোক বা না হোক) শুধুমাত্র সঙ্গমক্রিয়ার জন্যই চালু হয়েছিল?

নিঃসন্দেহে অভিধানে এ ধরনের উদাহরণ পাওয়া যাবে, যার দ্বারা এ শব্দটির অর্থ শুধু সঙ্গমই বুঝানো হয়েছে, কিন্তু তা একথার দলিল হতে পারে না যে, এ শব্দটির আসল তাৎপর্য হচ্ছে সঙ্গম এবং 'আকদ' এর জন্য এটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআন ও হাদিস থেকে আপনি যে উদাহরণগুলি পেশ করেছেন, সেগুলিতে একটু চিন্তা করে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, তার মধ্যে একটি উদাহরণও এমন নেই, যার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন, আমি যিনা দ্বারা 'হুরমতে মুসাহারাতের' সমর্থক। কিন্তু আমার মতে কুরআনের আয়াত وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ (তোমাদের পিতারা যাদেরকে নিকাহ্ করেছে, তাদেরকে নিকাহ্ করো না।) এ আয়াতের অর্থ এটা হতে পারে না, যে সব মহিলাদের সাথে তোমাদের পিতারা যিনা করেছে তাদের সাথে যিনাও করোনা, 'আক্দ'ও করো না। বরং আমি এর অর্থ গ্রহণ করি যে, যার সাথে পিতার নিকাহ হয়েছে, তার সাথে ছেলের নিকাহ হতে পারে না। অবশ্য স্বভাবতই এ দ্বারা এ অর্থও বের হয় যে, পিতার সাথে কোনো মহিলার যে কোনোভাবে যৌন সম্পর্ক হয়ে গেলে, সে মহিলা ছেলের জন্য হারাম এবং ছেলের সাথে এ ধরনের সম্পর্ক কোনো মহিলার হয়ে গেলে, সেও পিতার জন্য হারাম। نكح اليه ملعون এ হাদিস অংশের অর্থও আমি এটাই বুঝি যে, হুজুর সা. "নাকেহুল ইয়াদ" বলে হস্তমৈথুনকারীকে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ, অভিশপ্ত হস্ত মৈথুনকারী নিজের হাতকেই যেন বিয়ে করলো। এখানে নাকেহ্ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর হস্তমৈথুনকারীকে নিজের হাত বিবাহকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অন্যান্য উদাহরণগুলিরও এই ধরনের ব্যাখ্যা করা যায়। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৮, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর ১৯৬২ খৃ.)*

প্রকৃত তওবা

প্রশ্ন : পূর্বে আমি গুনাহে কবীরায় লিপ্ত ছিলাম, পরে তওবায়ে নসুহা তথা খালেছ তওবা করেছি এবং আপনার আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আল্লাহর রহমতে একজন সচেতন মুসলমান হওয়ার ভাগ্য হয়েছে। কিন্তু দিবারাত্র আখেরাতের ফলাফল চিন্তা করে হতাশাগ্রস্ত থাকি এবং আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যে, আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই আমার প্রাপ্য সাজা ভোগ করে নেই। কিন্তু আফসোস, ইসলামি শাস্তির আইনই চালু নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন এবং আমাকে যথার্থ পথ নির্দেশ করুন।

জবাব : আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনের প্রতিটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন, যার জন্য সে শরমিন্দা হয়ে খাঁটি মনে তওবা করে এবং ঐ গুনাহের পুনরাবৃত্তি আর না করে। তওবার সাথে সাথে মানুষ যদি কিছু ছদকা করে অথবা এই নিয়তে যদি কুরবানী করে যে, (এর অসীলায়) আল্লাহ্ তায়ালা তাকে মাফ করে দেবেন, তাহলে সে কুরবানী তার তওবা কবুলের ব্যাপারে আরো বেশি সহায়ক হতে থাকে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন তিনি আপনার তওবা কবুল করেন এবং আপনাকে দৃঢ়তা দান করেন। *(তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৬২ খৃ.)*

মহিলাদের পবিত্রতা ও সতীত্বের ভবিষ্যৎ

প্রশ্ন : (করাচীর) মর্নিং নিউজের একটি কাটিং আপনার খিদমতে প্রেরণ করছি। ইংল্যান্ডের তালাক বিভাগীয় আদালতের প্রাক্তন জজ স্যার হার্বার্ট ওয়েলিংটন সেখানে একজন পূর্ণাঙ্গ স্ত্রীর কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। সে কাটিং এর অনুবাদ নিম্নরূপ :

"রোমান ক্যাথলিক তালাক বিভাগীয় আদালতের প্রাক্তন জজ স্যার হার্বার্ট ওয়েলিংটন তার প্রদত্ত এক রায়ে একজন স্ত্রীর চৌদ্দটি গুণ বর্ণনা করেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো এক. আকর্ষণীয় চেহারা, দুই. বুদ্ধিমত্তা, তিন. মুহাব্বাত, চার. বিনয় নম্রতা, পাঁচ. স্নেহপরায়ণতা, ছয়. সুন্দর ব্যবহার, সাত. সহযোগিতা করার আবেগ, আট. সবর ও সহিষ্ণুতা, নয়. চিন্তা ভাবনা, দশ. নিঃস্বার্থপরতা, এগারো. হাসিমুখ থাকা, বারো. ত্যাগ তিতিক্ষা, তেরো. কর্মপ্রেরণা, চৌদ্দ. বিশ্বস্ততা।

স্যার হার্বার্ট তার বিবরণীতে বলেন, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর মধ্যে উপরের সবগুলি গুণই বর্তমান ছিলো। তাকে তিনি বিয়ে করেন ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তার প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর। শত শত অকৃতকার্য বিবাহ বিচ্ছেদের তিনি রায় দিয়েছেন। অত:পর ৮৬ বছর বয়সে স্যার হার্বার্ট ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যু বরণ করেন।

এ কার্টিং দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, স্যার হার্বার্ট উক্ত চৌদ্দটি গুণের মধ্যে সতীত্বকে নামেমাত্র অন্তর্ভুক্ত করাও জরুরি মনে করেননি। এতে মনে হয় সতীত্ব গুণটি এখন আর নারীদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয় না। একজন মহিলা সতীত্ব ব্যক্তিত্ব ব্যতীত কেমন করে স্বামীর নিকট বিশ্বস্ত হতে পারে, তা আমি বুঝতে অক্ষম।

জবাব : আপনার চিঠি পেলাম, যার মধ্যে আপনি ইংল্যান্ডের তালাক বিভাগীয় আদালতের এক জজ সাহেবের অসিয়তনামা লিখে পাঠিয়েছেন এবং সে বিষয়ে আমার মত প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছেন। আসল ব্যাপার এই যে, পাশ্চাত্যবাসীদের নিকটে আজকাল এ ধ্যানধারণা প্রায় খতম হয়ে গেছে যে, নারীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সতীত্বও একটি অন্যতম গুণ। নারী পুরুষের খোলাখুলি এবং অবাধ মেলামেশার অনিবার্য ফলস্বরূপ সেখানে ব্যভিচার এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত প্রচলিত রেওয়াজের সাথে আপোষ করতে তথাকার সমাজ বাধ্য হয়। এখন সেখানে কোনো ব্যক্তি এটা আশাই করে না যে, বিয়ের দিন সে একজন কুমারী স্ত্রী পাবে এবং বিয়ের পরে সে সতী ও বিশ্বস্তই থাকবে। ওখানে তো পুরুষলোক নিজ ভাবী স্ত্রীর সাথে কোর্টশীপ

চলাকালে ব্যভিচার করেই থাকে এবং অধিকাংশ বিবাহই মেয়েরা অন্ত:সত্ত্বা হওয়ার পরই সম্পাদিত হয়। এমতাবস্থায় আপনি কিভাবে আশা করতে পারেন যে, এখন সতীত্ব মেয়েদের জন্য একটি সৎ গুণ বলে বিবেচিত হবে এবং স্ত্রীর জন্য একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে মনে করা হবে।

আমি বলি, তাদের কথা উল্লেখ করে লাভ কি, আমাদের শাসকবর্গ এবং অভিজাত মহলের লোকদের কল্যাণে এখন যে হারে আমাদের নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রসার লাভ করেছে এবং পরিবার পরিকল্পনার নামে জন্ম রোধের পদ্ধতিগুলিকে যেভাবে সর্বসাধারণে প্রচার করা হচ্ছে, সে অবস্থা দেখে আমাদের নিজেদের সমাজেও একই ব্যাধি সংক্রমিক হওয়ার আশংকা অমূলক মনে হয় না। হয় আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে হেদায়েত করুন, নয়তো আমাদের জাতিকে ঐসব লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিন, যারা নিজেরা তো ডুবেছে এবং সমগ্র জাতিকেও ডুবানোর কাজে উঠে পড়ে লেগে আছে। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৮, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর ১৯৬২ খৃ.)*

উর্দু ভাষা এবং বর্তমান সরকার

প্রশ্ন : এ সত্য আপনার ভালো করেই জানা আছে যে, প্রাচ্যের বিরাট এক জনতার ভাষা উর্দু। এটাই একমাত্র ভাষা যাকে পাক ভারতের আন্ত:দেশীয় ভাষা আখ্যায়িত করা যেতে পারে। সাধারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে উর্দুকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা আখ্যা দেয়াও অতিশয়োক্তি নহে। পশ্চিম পাকিস্তানেরও নয়টি এলাকার আন্ত এলাকার ভাষা একমাত্র উর্দু। উর্দুর ধনভান্ডারের প্রশস্ততা, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উর্দুর অবদান এবং বিভিন্ন কার্যালয়ে এর ব্যবহারিক যোগ্যতা আপনার কাছে গোপন নেই। তা সত্ত্বেও দীর্ঘ পনের বছর কেটে গেলো, কিন্তু উর্দু এখনো পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি কাজ, অফিসের যোগাযোগ, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও চালু করা হলো না।

পাক সরকারের আইনমন্ত্রীর উক্তি আপনার নযরে অবশ্যই পড়েছে। এ সম্পর্কিত একটি মন্তব্যে তিনি প্রকাশ করেছেন, ১৯৭২ সাল নাগাদ ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হতে পারে অথবা ইংরেজি ব্যবহার করা হবে। ইংরেজির বিকল্প কি হতে পারে সে বিষয় নির্ধারণ করার জন্য ১৯৭২ সালে একটি কমিশন গঠিত হবে। মন্ত্রী মহোদয়ের এ মন্তব্যে উর্দুর পৃষ্ঠপোষক ও দরদীরা ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছেন। এমনকি তারা প্রায় হতাশই হয়ে পড়েছেন।

আমার মতো কোটি কোটি উর্দু ভক্তের পক্ষ থেকে আপনার সাহায্য সহযোগিতার আজ একান্ত প্রয়োজন। দয়া করে এ বিশেষ অবস্থায় আপনার শক্তিশালী বক্তব্য দ্বারা আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।[১]

---

১. পাঠকবৃন্দ জেনে খুশি হবে যে, এ প্রশ্নটি একটি দীর্ঘ চিঠির সার নির্যাস। এটা একজন অমুসলিম পাকিস্তানীর লিখা এবং এ চিঠিতে উর্দু ভাষা প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখা হয়েছে।

জবাব : উর্দু ভাষার জন্য আপনি যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তার জন্য আন্তরিকভাবে আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

উর্দু ভাষা প্রসারের পথে মূল বাধা হলো আমাদের শাসকদের উঁচু শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। তারা নিজেরা ইংরেজি পরিবেশে লালিত পালিত হওয়ার কারণে উর্দু লেখা এবং বলতে পুরোপুরি সক্ষম নন। সেজন্য তারা চান তাঁদের জীবদ্দশায় ইংরেজি যেনো সমগ্র জাতির উপর কর্তৃত্বশীল অবস্থায় কায়েম থাকে। উপরন্তু এদের সন্তানদেরকেও তারা ইংরেজি পরিবেশেই লালন পালন করছেন এবং এ ব্যবস্থা করছেন যেনো ভবিষ্যৎ সরকারের ক্ষমতার চাবিকাঠি তাদের অধস্তন বংশধরদের কব্জায় নিবদ্ধ থাকে। এজন্য এটাও আশা করা যায় না যে, ১৯৭২ সালেও উর্দুকে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম বানানোর ফয়সালা করা হবে। কমিশনের প্রস্তাব শুধু ছেলে ভুলানোর জন্যই গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে সময় কাটানো যায় এবং দাবি উত্থাপনকারীদের কমপক্ষে দশ বছরের জন্য চুপ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। আমাদের মুসীবত দূর করার এছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই যে, আমাদের দেশীয় সাহেবদের কবল থেকে মুক্তি পেতে হবে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইংরেজরা নিজেরা চলে গেছে বটে, কিন্তু তাদের ভূত আমাদের ঘাড়ে চেপেই রয়েছে। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৯, সংখ্যা ৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ খৃ.)*

'গিলাফে কাবার' প্রদর্শনী ও মিছিল

প্রশ্ন : সম্প্রতি বায়তুল্লাহ শরীফের গিলাফ তৈরি ও তত্ত্বাবধানের যে দায়িত্ব পাকিস্তান এবং আপনি পেয়েছেন সেটা গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয় বৈকি। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো কোনো মহল থেকে কিছু আপত্তিও উঠেছে। সেগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম আপনার নিয়তের উপর হামলা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আসলে আপনি নিজের ও নিজ জামায়াতের কলঙ্ক মুছাতে এবং পাবলিসিটি করতে চান এবং এর মাধ্যমে আগামী নির্বাচনে জয়ী হওয়াই আপনার লক্ষ্য। আর এইজন্য কাজটিকে আপনি নিজের হাতে নিয়েছেন যাতে করে খ্যাতিও অর্জন করা যায়, আবার নির্বাচনের জন্যও লক্ষ লক্ষ টাকা যোগাড় হয়। তারপর আরো কিছু প্রশ্ন আছে, সেগুলি দীনী এবং নীতিগত আকারে পেশ করা হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে:

১. কা'বার গিলাফকে কুরআন হাদিসে আল্লাহর নিদর্শনের পর্যায়ে গণ্য করা হয়নি। সুতরাং কার্যত বা বিশ্বাসগত কোনো দিক দিয়েই এর পবিত্রতা প্রকাশ এবং একে সম্মান প্রদর্শন করা জরুরি নয়। এটা মূলত কাপড়ের একটি টুকরা মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। চাই এটাকে কা'বা শরীফের জন্য বানানো হোক, চাই অন্য কিছুর জন্য। কা'বা শরীফর সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনো জিনিস আল্লাহর নিদর্শন বিবেচিত হয়ে থাকলে এবং তার সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক সাব্যস্ত হলে কা'বা শরীফ নির্মাণকালে ইট পাথর এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য জিনিসও সম্মানযোগ্য বস্তু হবে।

২. কা'বা শরীফের গিলাফ প্রদর্শনী, যিয়ারাত এবং মিছিলসহ প্রেরণ করা একটি বিদয়াত। কারণ, নবী সা. এবং খিলাফাতে রাশেদার জামানায় এমন ব্যবহার কখনো করা হয়নি। অথচ তখনো গিলাফ পরানো হতো। গিলাফ এর প্রদর্শনী এবং এর জন্য মিছিল করা জায়েযই যদি হবে, তাহলে হুদির (কুরবানীর জন্য প্রতীক সম্বলিত) উটের মিছিল বের করা হতো না কেনো? অথচ এগুলিকে কুরআন স্পষ্টভাবে শাআইরুল্লাহু (আল্লাহর নিদর্শন) বলে আখ্যা দিয়েছে।

৩. এখনো পর্যন্ত যে গিলাফ কা'বা শরীফকে পরানো হয়নি, এবং পরানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে, সেটা তো শুধুমাত্র একটি কাপড়। তাহলে সেটা এমন বরকতপূর্ণ হয়ে গেলো কেমন করে যে, তার যিয়ারত করতে হবে, করাতে হবে এবং যত্ন সহকারে তাকে মিছিলসহ রওয়ানা করতে হবে। তারপর যে গিলাফ কা'বা শরীফ থেকে খুলে নেয়া হয়, তাকে সম্মান দেখানো জায়েয করা হয়নি কেনো এবং ফকীহরা সাধারণ কাপড়ের মতো সে কাপড়ের ব্যবহার এবং সে কাপড় থেকে ফায়দা হাসিল করা জায়েয রেখেছেন কেনো?

৪. এ কাজ স্বয়ং দীন ইসলামের মধ্যে নতুন জিনিসের সংযোজন এবং নিষিদ্ধ বিদআত। তাছাড়া একাজ অন্য আরো বহু বিদআত, অপ্রিয় জিনিস এবং দুর্ঘটনার অনিবার্য কারণ। সুতরাং, এভাবে গিলাফের যিআরত এবং প্রদর্শনীর ফলে নারী পুরুষের মিশ্রণ ঘটেছে, মেয়েদের বেপরদেগী এবং বেইজ্জতী হয়েছে, জ্ঞান নষ্ট হয়েছে, নযর নিয়ায পেশ করা হয়েছে, গিলাফকে চুমু দেওয়া হয়েছে, এর চতুষ্পার্শে তাওয়াফ করা হয়েছে, নিজের প্রয়োজন জানিয়ে তা পূরণের জন্য দোয়া করা হয়েছে, এমনকি একে সিজদাও করা হয়েছে। তারপর বাদ্যযন্ত্রসহ গিলাফের মিছিল বের হয়েছে এবং একে হযরত মাখদুম আলী হুজবীরীর মাযারের উপর দিয়েও ঘুরিয়ে আনা হয়েছে।

অভিযোগকারীগণ এমনও বলছে আমাদের জাতি পূর্ব থেকেই নানাপ্রকার বিদআতের মধ্যে নিমজ্জিত এবং সাংগঠনিক অবচেতনায় আচ্ছন্ন। এসব কারণে পূর্বেই আপনার এ বিষয়ে বুঝা ও চিন্তা করা উচিত ছিলো যে, এসব প্রোগ্রামের অনিবার্য ফল এই হতে পারে। সুতরাং এসব ফলাফল ও পরিণতির দায়িত্ব সরাসরি আপনার উপরই বর্তায়।

যেহেতু এ জাতীয় অভিযোগ বারবার তোলা হচ্ছে, এজন্য এগুলোর জবাব দান করাই আপনার পক্ষে সমীচীন এবং উপযোগী মনে করি। এ প্রসঙ্গে মৌলিকভাবে বিদআতের প্রসঙ্গটিকেও স্পষ্ট করে দিন এবং কোন্ কোন্ বিদআত মাকরূহ ও নিন্দনীয় এবং সে কাজগুলিই বা কি জানিয়ে দিন।

জবাব : বিভিন্ন দীনি মহল থেকে এ ব্যাপারে যেসব আপত্তি এবং প্রশ্ন উঠেছে সেগুলি আমি দেখে আসছি। কিন্তু এসব কথা বলতে গিয়ে যে ভাষা এবং বর্ণনা

ভংগী ব্যবহার করা হয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তার মুকাবিলা করা আমার সাধ্যাতীত ছিলো। এজন্য আমি এগুলি নিয়ে মাথা ঘামাইনি। এখন একজন প্রশ্নকারী ভদ্রতা ও যুক্তি সহকারে দাবি করেছে প্রশ্নের মূল কারণগুলির উপর আলোচনা করার জন্য, এ কারণেই এখানে তার জবাব দেয়া হচ্ছে।

যতোগুলি অভিযোগ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলির সবই আসলে একটি ভ্রান্ত কল্পনার উপর ভিত্তি করে উত্থাপিত হয়েছে। প্রশ্নকারীরা নিজেরাই এটা ধরে নিয়েছে যে, আমি নিজেই গিলাফ প্রদর্শনীর সূচনা করেছি এবং আমি নিজেই প্রোগ্রাম বানিয়ে স্পেশাল ট্রেনের সাহায্যে বিভিন্ন শহরে ঘুরানোর স্কীম বানিয়েছি। এরই ভিত্তিতে তারা প্রশ্ন তুলেছেন, শেষ পর্যন্ত এ বিদআত এখানে শুরু করা হলো কোন যুক্তিতে? তারপর তারা নানাবিধ প্রশ্নের বাণে জর্জরিত করে চলেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের ধারণা মূল ঘটনার বিপরীত। গিলাফের ব্যাপারটিকে জনগণের মধ্যে পরিচিত করার কথা আদৌ আমার কল্পনায় ছিলো না, আর মনে কখনো একথা জাগেনি যে, মিছিল সহকারে প্রদর্শনী করার পর ধূমধাম করে এটাকে প্রেরণ করতে হবে। প্রথমত, গিলাফ তৈরির সকল কাজ সম্পূর্ণভাবে গোপনেই হচ্ছিল। গিলাফ পরানোর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সৌদি আরবের কর্মকর্তাদেরকে পাকিস্তানের কারিগরদের সাথে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দিয়ে ঐ দায়িত্ব থেকে সম্পর্কমুক্ত হয়ে যাওয়াই আমার ইচ্ছা ছিলো। এ কাজের তত্ত্বাবধানের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকুক, তাও আমি চাচ্ছিলাম না। আর সংবাদপত্রে এ সম্পর্কিত কোনো খবর প্রকাশ পাক তাও পছন্দ করিনি, অথবা এ ব্যাপারে আমি কোনো কাজ করছি সেটা জনগণের মধ্যে জানাজানি হোক, তাও আমি চাইনি। কিন্তু সৌদি আরবের ব্যবস্থাপকদের সাথে কারিগরদের পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং যে কোনোভাবে তাদের কাজের নমুনা সংগ্রহ করা অপরিহার্য ছিলো। এভাবে ধীরে ধীরে কথা ছড়াতে থাকলো। তারপর হঠাৎ করে এ ঘটনা ঘটে গেলো যে, মক্কা থেকে আগত পুরানো গিলাফের একটি টুকরা নমুনাস্বরূপ কয়েকজন কারিগরকে দেয়া হলো, যাতে করে সে অনুযায়ী তারা কাজ করে নিয়ে আসে। জানি না কিভাবে এ টুকরার উপস্থিতির কথা জনগণের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলো এবং গিলাফের টুকরা দেখার জন্য জনতার ভীড় জমা হয়ে গেল। এরপর বাজারে এর মিছিল বের করা হলো এবং শহরে একথা ছড়িয়ে পড়ল যে, এখানে কা'বা শরীফের গিলাফ প্রস্তুত করার কাজ চলছে। এ ঘটনা পরে এক সংবাদ সরবরাহ সংস্থার নিকট পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং এ সংস্থা সারা দেশে খবর ছড়িয়ে দিলো। অতঃপর সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা নিজেরাই এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠে। সাংবাদিকরা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে খোঁজ নিয়ে গিলাফ তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ের খবর সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে থাকে, এমনকি যখন ইয়াকুব আনছারীর নিকট গিলাফের কাপড় তৈরি করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলো, তখন তার ছবি, তার

কারিগরদের ছবি, তার ফ্যাক্টরীর ছবি, সবকিছু সংবাদপত্রগুলো বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছিল। ফলে জনসাধারণ জেনে গেলো যে, গিলাফ কোথায় এবং কে বানাচ্ছেন। এ সময়ে গিলাফ তৈরি শেষ হওয়ার পূর্বেই লোকেরা ফ্যাক্টরীতে জমা হতে লাগল। এ সব কিছু আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতসারেই হতে থাকে। আমার কোনো ইচ্ছা বা চেষ্টার কোনরূপ দখলই এর মধ্যে ছিলো না।

জনসাধারণের মধ্যে এখবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে গিলাফটি দেখার জন্য এক অদম্য আগ্রহ পয়দা হয়ে গেল । প্রথম দিকে আমি অনুমানই করতে পারিনি যে, এতো বিপুল সংখ্যার লোক এ জিনিসটির ব্যাপারে এতো বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে। এ অপ্রত্যাশিত অবস্থা সামনে আসায় আমি অনুভব করলাম, আমার বা আর কারো পক্ষেই এ তুফান রোধ করা সম্ভব নয়। আর একে বাধা দেয়ার চেষ্টাও অর্থহীন প্রয়াস। কারণ, এটা ছিলো একটি সহজাত আগ্রহ। আর এটা মূলত কোনো নাজায়েয কাজও নয়। উপরন্তু আমাদের দেশ আরব থেকে বহু দূরে অবস্থিত। সেখানে যাওয়া এবং বায়তুল্লাহ যিয়ায়ত অতি অল্প লোকেরই নসীব হয়। এখানকার জনগণ এই প্রথম জানতে পারল যে, এখান থেকে প্রথমবারের মতো একটি হাদিয়া আল্লাহর ঘরের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে হঠাৎ করে তাদের মধ্যে আগ্রহের আগুন জ্বলে উঠে।

সে আগ্রহ কোনো মূর্তির জন্য ছিলো না, কোনো মূর্তির আখড়ার জন্যও ছিলো না, স্বয়ং আল্লাহ তায়লার নিজের ঘরের জন্য ছিলো সে আগ্রহ। একে আল্লাহ পাক নিজেই مَثَابَةً لِّلنَّاسِ বানিয়েছেন এবং এর আশেপাশের লোকদেরকে এ ঘরের জন্য পাগলপ্রায় বানিয়েছেন। فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ এ আগ্রহকে কোনো অবস্থাতেই শিরক বলা যায় না। বরং বুনিয়াদীভাবে এটা আল্লাহ তায়ালার প্রতি অনুরাগের প্রতীক। এজন্য এটাকে নিন্দনীয় আখ্যা দিয়ে থামিয়ে দেয়া বা দাবিয়ে দেয়ার চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের জনসাধারণ দীন ও ইসলামের ইলম এবং দীনী প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকায় এবং ইসলাম ও কুফরীর সীমারেখা অজ্ঞাত থাকার কারণে, বন্যার মতো উথলে উঠে একটি জায়েয আগ্রহ তাদের নিজেদের ইচ্ছামতো চলার প্রেক্ষিতে সেটা ভুল পথে চলে যেতে পারে। এসব দিক চিন্তাভাবনা করে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এমন একটি জায়েয এবং স্বভাবজাত আগ্রহকে ভুল পথে যাওয়া থেকে রোধ করা দরকার। তাদেরকে সঠিক দিকে চালু করা অপরিহার্য, যার আগুন কারো জ্বালিয়ে দেয়ার কারণে প্রজ্জলিত হয়নি, বরং নিজের থেকে জ্বলে উঠেছে। এমতাবস্থায় এর যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া না হলে পরিণামে এটি এমন এক পথ বেছে নেবে, যা শরঈ দৃষ্টিতে আপত্তিকর এবং দীন ও নৈতিকতার দিক দিয়ে দারুণ ক্ষতিকর হওয়া অসম্ভব নয়।

এসব দিক চিন্তা করে গিলাফ তৈরির কাজ শুরু হওয়ার প্রারম্ভে শহরের গণ্যমান্য লোকদের একত্রিত করি এবং সবার সম্মতিক্রমে কয়েকজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। যাতে করে জায়েয সীমার মধ্যেই জনগণের আগ্রহের উপশম হয় এবং অনিয়ম, যিয়ারত ও মিছিল করার সুযোগ না আসে। এ কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের শামিল করা হয় :

১. মওলানা আব্দুর রহমান সাহেব (মওলানা মুফতী মুহাম্মদ হাসান মরহুম ও মগফুরের ছাহেবজাদা এবং জামেয়া আশরাফিয়ার সহকারি সুপারিন্টেডেন্ট, ইনি দেওবন্দী ওলামার প্রতিনিধি)।
২. মুফতী মুহাম্মদ হুসায়েন নায়ীমী সাহেব (জামেয়া নায়ীমীয়ার মুহতামিম, ইনি বেরেলবী ওলামা দলের প্রতিনিধি)।
৩. মওলানা হাফেজ কেফায়েত হুসায়েন সাহেব। (শিয়া ওলামার পক্ষ থেকে)।
৪. হাজী মুহাম্মদ ইসহাক হানীফ সাহেব। (জময়ীয়াতে আহলে হাদিস এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের নাজেম, এ কমিটির সদস্যপদের জন্য তার নাম পেশ করেছিলেন 'আল-ইতিসাম' এর সম্পাদক নিজেই)।
৫. চৌধুরী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব (লাহোর কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারমান)।
৬. চৌধুরী মুহাম্মদ আমীন সাহেব (লাহোর কর্পোরেশনের কাউন্সিলার)।
৭. মুহাম্মদ ওমর খান সাহেব বাসমল (Headmasters' Association Lahore)।
৮. নাসরুল্লাহ শেখ সাহেব (সভাপতি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ)।
৯. হাজী মুহাম্মদ লতীফ সাহেব (সভাপতি, শাহ আলম মার্কেট)।
১০. শেখ তাজ দ্বীন সাহেব (সভাপতি, আজম ক্লথ মার্কেট এসোসিয়েশন)।
১১. হাজী মে'রাজ দীন সাহেব (চেয়ারমান, Union Council Shoe Market)।
১২. মালিক মুবারক আলী সাহেব (চেয়ারমান, Union Committee, Chawk Vizir Khan)।
১৩. শামশির আলী সাহেব (Ladies own choice, Anarkali)।
১৪. শেখ ফারহাত আলী সাহেব (Farhat Ali Jwellers, Mall Road)।
১৫. শেঠ ওলী ভাই সাহেব (Bombay Cloth House, Anarkali)।
১৬. রানা ইলাহ্ দাদ খান সাহেব (RANA MOTORS, Mall Road)।
১৭. আজীজুর রহমান সাহেব (Science House, Maclegan Road)।
১৮. জনাব কাওসার নিয়াজী (Editor, SHIHAB)।

এ পুরো কমিটির মধ্যে জামায়াতে ইসলামির মাত্র দুইজন সদস্য ছিলেন। বাকি লোকদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ।

নিজেকে আমি আদৌ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিনি। তবে কমিটির অনুরোধক্রমে আমি এর দু'টি বৈঠকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করেছিলাম। এসব বৈঠকাদিতে লাহোরের ডেপুটি কমিশনার, এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও উপস্থিত ছিলেন এবং সবার পরামর্শক্রমে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছিল। গিলাফ মক্কা পাঠানোর পূর্বে পুরুষদেরকে তিন দিন এবং মহিলাদেরকে চার দিন দেখার সুযোগ দেয়ার কথা সিদ্ধান্ত হয়। আর কোনো অবস্থাতেই এ প্রদর্শনীকালে নারী পুরুষের অবাধ মিশ্রণ হতে দেয়া যাবে না। প্রদর্শনী স্থলে কিছু কর্মী (মেয়েদের জন্য মহিলা এবং পুরুষদের জন্য পুরুষ) এমনভাবে নিযুক্ত থাকবে, যারা লোকদেরকে জায়েয সীমার মধ্যে থাকার জন্য উপদেশ দিতে থাকবে এবং নাজায়েয কার্যসমূহ থেকে বিরত রাখবে। লোকদেরকে নযরানা পেশ করতে নিষেধ করা হবে এবং তাদেরকে বিশেষভাবে জানানো হবে যে, গিলাফ দর্শনকালে যেনো আল্লাহর যিক্‌র করা হয়, কলেমায়ে তায়্যেবাহ পড়া হয় এবং দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়। এর সাথে আল্লাহর কাছে যেনো দোয়া করা হয়, যে আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করে যে ঘরের গিলাফ দেখার সুযোগ দিয়েছেন, সে পবিত্র ঘরটি যিয়ারতের সৌভাগ্যও তিনি যেনো দান করেন। তারপর মিছিল সহকারেই গিলাফ প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে। (কারণ এ ব্যবস্থা না করলে মিছিল অবশ্যই বেরুবে এবং নাজায়েয পন্থায় বের হবে) তবে, যে রাস্তা দিয়ে মিছিল অতিক্রম করবে, তার দু'পাশের যাবতীয় অশ্লীল ছবি অপসারণ করার ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে। গানের রেকর্ডিং বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তাকবীর, তাহলীল ও আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালার প্রশংসার আওয়াজ এতো জোরে বুলন্দ করতে হবে, যেনো গোটা শহর গুঞ্জরিত হয়ে উঠে। এ মিছিলে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

এটা ছিলো সেই প্রোগ্রাম, যা লাহোর শহরের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই নতুন এক অবস্থার মুকাবিলা আমাদেরকে করতে হয়। সেটা হলো, গিলাফ দেখার জন্য মানুষের আগ্রহাতিশয্য শুধু লাহোর শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং বিভিন্ন স্থান থেকে লোকেরা দলে দলে এসে ফ্যাক্টরীতে ভীড় জমাতে থাকে। এ কারণে কারখানার কর্মীদের পক্ষে কাজ করাই মুশকিল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে লোকেরা যে কোনোভাবে হোক ফ্যাক্টরী থেকে গিলাফের থান সংগ্রহ করতে শুরু করে দিলো এবং বিভিন্ন শহরে নিয়ে গিয়ে মিছিল বের করে স্বরচিত পদ্ধতি অনুসারে 'যিয়ারত করাল। আমার সন্দেহ হলো, যে বিষয়কে আমরা রুখতে চেয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত তাই-ই হয়তো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। তদুপরি আশংকাও হলো যে, এভাবে কোনো থান হারিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এ কারণেই বাইরের লোকদেরকেও যথাযথভাবে এর যিয়ারতের সুযোগ দেয়া জরুরি মনে করা হয়। সুতরাং পাকিস্তান ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের সহযোগিতায় দু'টি

স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হলো। ট্রেন দু'টির প্রত্যেকটির সাথে বারজন করে রেলওয়ে স্কাউট, প্রতিটির সাথে তিনজন করে সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক এবং জামায়াতে ইসলামির তিনজন করে কর্মী পাঠানো হলো। এর মধ্যে লাউড স্পীকার স্থাপন করা হলো এবং কর্মীদের বিশেষভাবে বলে দেয়া হলো যে, যে স্থানেই গিলাফ যিয়ারতের জন্য ট্রেন থামানো হবে, সেখানে উচ্চস্বরে যেনো আল্লাহর যিকরের ধ্বনি তোলা হয়, যাতে করে অন্য কোনো শ্লোগান দেওয়ার সুযোগ না থাকে, যিয়ারতকারীদের সব রকমের শেরেকী কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে, নারী পুরুষের একত্র সমাবেশ রুখতে হবে। নযরানা পেশ করতে নিষেধ করা হয়, শৃঙ্খলার সাথে যেনো গিলাফ দেখানো হয়। যাতে করে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে এবং জনগণকে যেনো বুঝানো হয় যে, এটা আল্লাহর ঘরের জন্য নির্মিত একটি কাপড় ব্যতীত আর কিছুই নয়, এটাকে দেখুন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যেনো তিনি তাঁর ঘরের যিয়ারতও নসীব করেন।

ঘটনাবলীর এ বিস্তারিত বিবরণ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা আমার নিজের ভালো বা মন্দ উদ্দেশ্যে রচিত কোনো প্রোগ্রাম ছিলো না। বরং এ প্রোগ্রাম তখনই তৈরি করা হয়েছিল, যখন জনগণের মধ্যে এর জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ঠিকরে পড়েছিল। আর এ কর্মসূচি তৈরির পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিলো জনতার আবেগের উচ্ছ্বাসের বন্যা ভুল খাতে প্রবাহিত হতে না দিয়ে একে কল্যাণকর ও জায়েয পন্থায় সম্পন্ন হতে দেয়া। আমি এই মনে করে এতে সক্রিয় অংশ নিয়েছি যে, প্রথম থেকে এ পরিকল্পনা নেয়া না হলে জনতার এ আবেগ উচ্ছ্বাস ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার প্রবল আশংকা ছিলো, যার প্রতিরোধ কারো পক্ষে সম্ভব হতো না।

এখন সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমি সংক্ষেপে এও বলে দিতে চাই যে, প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল আর পরবর্তীতে একে কি রূপ দেয়া হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে লাহোর শহরের সামরিক ছাউনীতে এ প্রদর্শনী একেক দিন করে আলাদাভাবে তিন দিন ছিলো পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য ছিলো চার দিন। এসময়ে গিলাফ সেজদা করা বা এর তাওয়াফ করার কোনো ঘটনা ঘটেনি। কর্মীরা শরিয়তের সীমা দর্শকদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছে এবং এ সীমা অতিক্রম না করার জন্য বিশেষভাবে লোকদেরকে অনুরোধ জানিয়েছে। কোনো প্রকারের নযরানা বা হাদীয়া পেশ করতে দেয়া হয়নি। তাদের প্রায় সকলেই কর্মীদের উপদেশ মেনে নিয়েছে এবং সীমা ঠিক রেখেছে, কিন্তু লাখ লাখ লোকের সমাবেশ কোনো এক ব্যক্তিকেও সীমা লংঘন করতে দেয়া হবে না, এ দাবি করা সম্ভব ছিলো না। হাজারো নিষেধ সত্ত্বেও এ ভীড়ের মধ্যে থেকে কোনো কোনো ব্যক্তি যদি গিলাফকেও চুমু দিয়ে থাকে, অথবা আল্লাহর কোনো বান্দাহ

যদি গিলাফের নিকটেই কোনো জিনিসের জন্য আকাঙ্ক্ষা পেশ করে বসে অথবা পুরুষের সমাবেশে স্বামী বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে কোনো মহিলা যদি প্রবেশ করেই বসে, তাহলে তার দায়িত্ব কি ব্যবস্থাপনার লোকদের উপর বর্তাবে?

লাহোরের মিছিলটি আমি নিজেই দেখেছি এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌছুতেই ছয় সাত লাখ লোক মিছিলে শরিক হয়ে গেলো। আট মাইল দীর্ঘ রাস্তার পুরোটা থেকেই সিনেমা ও দোকানের মধ্যে রক্ষিত এবং রাস্তার দু'পাশে লাগানো মেয়েদের ছবি এবং অন্যান্য সব রকমের উলংগ ছবি অপসারিত হলো অথবা ঢেকে দেয়া হয়েছিল। রেডিওর সমস্ত গানের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গোটা মিছিলের লোকেরা আল্লাহ আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র যিকর ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না। এতোবড় বিরাট জনসমাবেশে কোনো এক ব্যক্তির পকেট মার যায়নি, কেউ সিগারেট পান করেনি, কোনো গুণ্ডামীর ঘটনা সংঘটিত হয়নি, মহিলারা নিষেধ করা সত্ত্বেও এসেছিল, কিন্তু তাদেরকে উত্যক্ত করার কোনো একটি সামান্যতম ঘটনাও শোনা যায়নি।[১] এসময়ে গোটা শহরে নেকী অর্জনের আগ্রহ এতো বেশি ছিলো যে, মিছিল চলতে গিয়ে মল রোডে যাদের জুতা ছুটে গিয়েছিল এয়ারপোর্ট থেকে কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরে এসেও ঠিক সেখানেই তাদের জুতা পেয়েছে, যেখানে হারিয়ে গিয়েছিল। এতোবড় কল্যাণের মধ্যে হঠাৎ করে কোনো মুশরেকী অথবা বেদয়াতী ঘটনা ঘটে গিয়ে থাকলে তা আপত্তিকারীদের নযরে পড়ে গেলো, অথচ এ ধরনের লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে কে এমন গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা দিতে পারত যে, সেখানে একটি লোকও ভুলত্রুটি বা কোনো অন্যায় কাজ করবে না। অগ্রসরমান এই গণসমাবেশের মধ্য থেকে কিছু লোক লাফ দিয়ে উঠে যদি গিলাফে চুমু দিয়েই বসে, অথবা কেউ যদি কোনো ভুল ধ্বনি তুলে থাকে অথবা অন্য কোনো অশোভন কাজ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে শুধু কি এ কারণে ঐ বিরাট কল্যাণকে মুছে ফেলা হবে, যা লাহোর শহরে সেদিন জনসমক্ষে এসেছিল? এটা তো মাছির দশাই হলো, সকল পাক পবিত্র জিনিস বাদ দিয়ে সে কেবল আবর্জনা ও মলমূত্রই খুঁজে বেড়ায়, আর তার একটু ছিঁটেফোঁটা কোথাও পেলে সেখানে গিয়েই বসে।

বাইরে যেসব স্পেশাল ট্রেন পাঠানো হয়েছিল, তারও বিস্তারিত রিপোর্ট আমি গ্রহণ করেছি। আর শুধু জামায়াতে ইসলামির কর্মীদের কাছ থেকেই নয়, বরং সিভিল ডিফেন্স এবং এই ট্রেন দু'টির সাথে সফররত রেলওয়ে স্কাউটদের কাছ থেকেও

---

১. লাহোর শহরের ডেপুটি এস. পি. নিজে আমার কাছে বলেছেন, এই মিছিলে পকেটমার যাওয়া, গুণ্ডামী ও মেয়েদের উত্যক্ত করার কোনো ঘটনা আমাদের কাছে পৌছায়নি।

রিপোর্ট নিয়েছি।[১] তাদের যুক্ত বিবৃতি হলো, বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার লোকের ভিড় হয়। কোনো জায়গায় তো লাখ লাখ মানুষ গিলাফ দেখার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল। সবখানে আল্লাহর যিকরই গুরুগম্ভীর আওয়াজে উচ্চারিত হচ্ছিলো। অন্যান্য শ্লোগান কদাচিৎ উঠে থাকতে পারে। প্রত্যেক স্থানেই পুরুষ ও মহিলাদের সমাবেশ পৃথক ছিলো, আর খুব কম জায়গাই এমন ছিলো, যেখানে প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে নারী পুরুষের এলোমেলো হয়ে যাওয়াকে ঠেকানো যায়নি। সবখানেই নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে যিয়ারত হয়েছিল এবং খুব কম জায়গায়ই দু'একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার কারণ উদাসীনতা ছিলো না, বরং প্রচণ্ড ভীড়ের কারণেই এমনটি হয়েছিল। যথেষ্ট সংখ্যায় মহিলারা এসেছিল বটে, কিন্তু কদাচিৎ তাদেরকে উত্যক্ত করার কোনো ঘটনা ঘটেছে। এতো বিপুল সমাবেশে কারো পকেটমারা যাওয়ার ঘটনা শোনা যায়নি। জনসাধারণকে যথেষ্ট পরিমাণে নেকী ও কল্যাণের উপদেশ দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে গিলাফ যিয়ারতের শরয়ী পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে। জনগণ সাধারণভাবে সেসব নিয়মের কথা মনে রেখেছে এবং বেশির ভাগ লোককে এ দোয়া করতে দেখা গিয়েছে যে, হে আল্লাহ! যে ঘরের গিলাফ দেখার তৌফীক আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন, সে ঘরটিও দেখার তৌফীক আমাদেরকে দিন। গিলাফ বহনকারী ট্রেন দু'টির তাওয়াফ আদৌ কেউ করেনি। গিলাফে সিজদা করতেও কাউকে দেখা যায়নি। এখন এই লাখ লাখ মানুষের সমাবেশের মধ্য থেকে, কোনো ব্যক্তি যদি গিলাফ বা গিলাফ বহনকারী ট্রেনকে চুমু দিয়ে থাকে, অথবা কেউ যদি ট্রেনের ইঞ্জিনকে ইঞ্জিন শরীফই বলে থাকে অথবা কর্মীদের নিষেধ করা সত্ত্বেও যদি কেউ ট্রেনের মধ্যে পয়সা ছুড়ে থাকে, অথবা ভীড়ের প্রচণ্ডতার কারণে যদি নারী পুরুষের কোনো সময় একত্রিত হয়ে যাওয়াটা ঠেকানো সম্ভবপর না হয়েই থাকে তো ব্যস, আমাদের দীনদার ভাইয়েরা আপত্তি তুলবার জন্য এই কয়েকটি ঘটনাকেই বেছে নিয়েছেন এবং এর উত্তম ও কল্যাণকর দিকসমূহ থেকে সম্পূর্ণ চোখ ফিরিয়ে রেখেছেন।

অত:পর ঐ অভিযোগ উত্থাপনকারী হযরতগণ শুধু কীট বাছাই করেই তৃপ্ত হননি, বরং যেখানে কীট ছিলো না, সেখানে নিজেদের পক্ষ থেকে কীট প্রবেশ করানোতেও দ্বিধাবোধ করেননি। উদাহরণস্বরূপ ব্যবস্থাপনা কমিটির জানা ও অনুমতি ব্যতিরেকে সেই মহল্লার লোকেরা যেখানে গিলাফ তৈরি ফ্যাক্টরী অবস্থিত ছিলো, সেখানে নিজেরাই গিলাফ নিয়ে মিছিল বের করে। এ মিছিলকে কেন্দ্র করে বড় বড় মুত্তাকী ও নেক লোকেরা এই দোষারোপ করছেন যে, এর সম্মুখ ভাগে

১. রিপোর্টের সারাংশ 'এশিয়া' ও 'শিহাবে' ছাপা হয়েছে। আমার সামনে শুধু সেই লিখিত সারকথাগুলিই আছে তা নয়, বরং তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে মৌখিক যে বিবৃতি আমার সামনে পেশ করেছিল, তাও রয়েছে।

বাজনা বাজানো হচ্ছিল এবং গিলাফ নিয়ে গিয়ে হযরত আলী হুজবিরী রহ. এর মাজারে গিলাফ চড়ানো হয়েছিল, অথচ দ্বিতীয় কথাটি একেবারে নির্জলা মিথ্যা। মাজারে গিলাফ চড়ানোর খবরের আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। তবে বাজনা বাজানো সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী সংবাদ পাওয়া গেছে। কেউ বলেছে বাজনা বাজানো হয়েছিল, কেউ বলেছে হয় নাই। আবার কেউ বলে মিছিল অতিক্রম করার সময় একটি বিয়ের বরযাত্রী এসে যায় এবং তাদের সাথে বাজনা ছিলো। এতদসত্ত্বেও বাজনা বাজানো হয়ে থাকলেও তার দায়িত্ব আমার বা ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর বর্তায় না। কারণ, আমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে শুধু নয়, আমাদের নিষেধ করা সত্ত্বেও মিছিল করা হয়েছিল। এটা স্পষ্ট কথা যে, যাদের মহল্লায় গিলাফ তৈরি হচ্ছিল, তাদের থেকে কিছুতেই একে রক্ষা করতে সক্ষম ছিলাম না। হ্যাঁ, পারা যেতো, যদি একটি হেলিকপ্টার সংগ্রহ করে সেখান থেকে গিলাফ বের করে উড়িয়ে নিয়ে আসা যেতো।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো লাহোরে যে গিলাফটি তৈরি হয়েছিল, তাদের সমস্ত মাথাব্যথা শুধু সেইটার ব্যাপারে ছিলো। করাচীতে এর যে অংশ তৈরি হয়েছিল, তারও প্রদর্শনী হয়েছিল এবং বিভিন্ন শহরে তা ঘুরানো হয়েছিল, কিন্তু সে ব্যাপারে কারো শোকবাণী শোনা যায়নি। বরং তার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছিল, পূর্বাপর তাল রেখে সে কিসসা এমন নিপুণ হাতে সাজানো হয়েছিল, যার ভাবভঙ্গীতে বুঝা যাচ্ছিল যে, তার জন্যও আমি এবং জামায়াতে ইসলামিই দায়ী।

যাই হোক এ কথাগুলি তো বাহ্যিক ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত। আজব ব্যাপার হলো আমাদের এসব দীনদার হযরতগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার অন্তরের গভীর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। আর আমি কোনো নিয়তে কা'বা শরীফের গিলাফের প্রদর্শনীর এতসব ব্যবস্থা করেছিলাম, তাও তাঁরা জেনে ফেলেছিলেন। আমার নিয়ত যে কেমন করে তাদের নিকট প্রকাশ পেলো, তা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। তাঁরা যদি অন্তরের খবর জানার দাবিদার হয়ে থাকেন, তাহলে তো যে শিরক ও বিদআতের উপর তারা আমাদেরকে পাকড়াও করছেন, তাদের ব্যবহার এর থেকেও জঘন্য। আর যদি তারা শুধু কল্পনা ও অনুমানের ভিত্তিতে আমার নিয়তের উপর হামলা করে থাকেন, তাহলে এটাই বলতে হবে যে, কুরআন হাদিসে হয়তো তারা শুধু শিরক ও বিদআতের খারাবীর উল্লেখ পেয়েছেন, মিথ্যা দোষারোপ এবং মিথ্যা বাণী তৈরি করে কারো উপর আরোপ করা সম্পর্কে যে হুকুম আহকাম বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি হয়তো তাদের নযরেই পড়েনি।

এসব বাস্তব ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দানের পর আমি এবারে সেই নীতিগত প্রশ্নাবলীর জবাব দিতে চাই, যেগুলোর উপর আলোকপাত করার জন্য শ্রদ্ধেয় প্রশ্নকারী অনুরোধ করেছেন।

১. শাআইরুল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে জিনিসগুলো বুঝিয়েছেন, তার অর্থ শুধুমাত্র সেগুলো নয়, বরং প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বুঝান হয়েছে, যা আল্লাহ তায়লার বন্দেগীর নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর আল্লাহ পাকের দরবারে যে কোনো জিনিস হাদিয়াস্বরূপ পেশ করার নিয়ত করা হোক না কেনো, তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যথার্থ ও সঠিক। এ শ্রদ্ধা মূলত উক্ত জিনিসটির প্রতি নয়, বরং সেই মাবুদের প্রতি, যাঁর উদ্দেশ্যে এটাকে বিশেষিত করার নিয়ত করা হয়েছে। কা'বা ঘরের জন্য যদি কাঠ পাথরও একত্রিত করা হয়, অতঃপর লোকেরা যদি আদব ও সম্ভ্রমের সাথে এটা তোলে, আর তা উঠানো, নিয়ে যাওয়া এবং নির্মাণ কাজের খিদমত আনজাম দিতে গিয়ে যদি অজুসহ থাকা ও আল্লাহর যিকির করার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে এটা কিসের ভিত্তিতে আপত্তিকর হবে? অবশ্য কেউ যদি সীমা অতিক্রম করে এগুলির তাওয়াফ করা শুরু করে বা এগুলি সামনে রেখে সিজদা করে, অথবা এর কাছেই প্রার্থনা জানায় বা সাহায্য চায়, তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা শিরক হবে।

২. কোনো কাজ খারাপ ও গর্হিত বিদআত হওয়ার জন্য শুধু এতোটুকুই যথেষ্ট নয় যে, নবীর সা. যুগে একাজটি হয়নি, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক নতুন কাজই বিদআত, কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় ঐ বিদআতকে বিভ্রান্তিমূলক (দলালাত) বিদআত বলা হয়েছে, যা এমন এক নতুন কাজ, যার সমর্থনে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো যুক্তি নেই, যা শরিয়তের কোনো বিধানের সঙ্গে সংঘর্ষশীল। যার দ্বারা শরিয়ত সম্মত ফায়দা হাসিল করা বা কোনো ক্ষতি দূর করার চিন্তা না করা হয়, শরিয়ত যাকে সমর্থন করে, যে বিষয়ের প্রবর্তক নিজের উপর এবং অপরের উপর তা এমনভাবে ঘোষণা দিয়ে বাধ্যতামূলক করে নেয় এবং দাবি করে যে, এটার পাবন্দ না হওয়া গুনাহ আর পালন করা ফরয। এই অবস্থা না হলে শুধুমাত্র এই দলিলের ভিত্তিতেই কোনো কাজ গুমরাহকারী বিদআত বলা যায় না যে, হুজুর সা. এর যুগে কাজটি করা হয়নি। ইমাম বুখারি কিতাবুল জুমআয় চারটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। এগুলিতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. এবং প্রথম দুই খলিফার আমলে জুমআর আযান একবারই দেয়া হতো। হযরত ওসমান রা. নিজ শাসন আমলে আর একটি আযান বাড়িয়ে দিলেন, অথচ একে কোনো ব্যক্তিই বিদআতে দলালাত (গুমরাহকারী বিদআত) আখ্যা দেননি, বরং সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদী সা. এর নতুন বিষয় কবুল করে নিয়েছেন। বিপরীতে হযরত ওসমান রা. ই 'মিনা'তে কসর নামায না পড়ে পুরো নামাযই পড়েছিলেন। এতে আপত্তি তোলা হলো। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর নিজে দুহার নামাযকে

বিদআত এবং একে একটি নতুন সংযোজন বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'লোকেরা যেসব ভালো কাজ বের করেছে এটা তাদের অন্যতম।' إِنَّمَا لمِنْ اَحْسَنِ مَا اَحْدَثُوْا 'এটা নতুন কাজ, তবে চমৎকার ভালো কাজ'। بِدْعَةٌ وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ 'লোকেরা যেসব ভালো কাজ নতুনভাবে করেছে, তার মধ্যে এটা আমার নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়।' مَا اَحْدَثَ النَّاسُ شَيْئًا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهَا হযরত ওমর রা. তারাবিহ সম্পর্কে যে নিয়ম চালু করেছিলেন তা নবী করীম সা. ও হযরত আবু বকর রা.'র আমলে ছিলো না। তিনি নিজেই এটাকে নতুন কাজ বলেছেন এবং এটাও বলেছেন, 'এটা চমৎকার এক নতুন কাজ'। نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু নতুন হওয়ার কারণেই কোনো কাজ মন্দ বিদআত হয়ে যায় না, বরং একে মন্দ বিদআত বানানোর জন্য কিছু শর্ত আছে।

ইমাম নববী তাঁর 'কিতাব شرح مسلم কিতাবুল জুময়াতে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, বিদআত (অর্থাৎ অভিধান অনুসারে নতুন কাজ) পাঁচ প্রকার প্রথম বিদআত ওয়াজিব, দ্বিতীয়টি. পছন্দনীয়, তৃতীয়, নিষিদ্ধ বিদআত (হারাম), চতুর্থ, মাকরূহ, পঞ্চম, মুবাহ (অনুমোদিত)। আমার এ উক্তি হযরত ওমর রা.'র ঐ কথা দ্বারা সমর্থিত, যা তিনি তারাবিহ নামায সম্পর্কে বলেছেন।

আল্লামা আইনী 'উমদাতুল ক্বারী' নামক গ্রন্থে (কিতাবুল জুময়ায়) আব্দ্ বিন হুমাইদ-এর এই রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন, যখন মদিনার লোকসংখ্যা বেড়ে গেলো এবং বহু দূরে পর্যন্ত বাড়িঘর তৈরি হয়ে বসতি গড়ে উঠলো, তখন হযরত ওসমান রা. তৃতীয় আযানের (যে আযান আজকাল জুমআর দিন সর্বাগ্রে দেয়া হয়) হুকুম দিলেন এবং এ ব্যাপারে কেউ আপত্তি তুলেনি। কিন্তু 'মিনা'তে (কসরের বদলে) পুরো নামায পড়ার ব্যাপারে আপত্তি উঠলো।

আল্লামা ইবনে হাজর ফাতহুল বারী (কিতাবুত তারাবীহ)-তে হযরত ওমরের উক্তি نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ (এটা চমৎকার বিদআত) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আগে নজীর নেই এমন প্রত্যেক নতুন কাজকে বিদআত বলা হয়। কিন্তু শরিয়তে সুন্নতের মুকাবিলায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর এ কারণেই বিদআতকে দূষণীয় বলা হয়। অন্য কথায়, একে এভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে مُسْتَحْسَنٌ যে নতুন কাজ ভালো হওয়ার যোগ্য, তাকে পছন্দনীয় বলা হয়েছে। আর শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা মন্দ তাকে মন্দ বলতে হবে, অন্যথায় মুবাহ-এর শ্রেণীভুক্ত হবে।

এই নীতিগত ব্যাখ্যার পর আমি আরয করতে চাই, গিলাফের কাপড়ের মিছিল বের করা এবং তার প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে একটি নতুন কাজ, যা নবী পাকের সা. যুগে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের জামানায় ছিলো না। কিন্তু আমি মূলত প্রদর্শনী করার ইচ্ছা নিয়ে এ কাজ করিনি, অথবা প্রথম থেকেই আমার স্কীমের মধ্যেও একে ধূমধামের সাথে পাঠানোর কথা ছিলো না। বরং এ প্রোগ্রাম আমি তখনই তৈরি করলাম, যখন সারা দেশের জনগণের মধ্যে আপনা থেকেই অস্বাভাবিক আবেগ ও আগ্রহ উছলে উঠলো। আর আমার ভয় হলো, যদি এ আগ্রহ নিজ থেকে নিজের পথ রচনা করে নেয়, তাহলে এ আগ্রহাতিশয্য বিরাট ধরনের গুমরাহী ছড়ানোর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং, যতো জায়গাতেই এই গোমরাহী সুযোগ পেয়েছে, তা নিজের পথ রচনা করেছে এবং সেখানে অত্যন্ত জঘন্যরূপে তা প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে শরিয়ত বিরোধী সে ক্ষতি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আমি সে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। এজন্য আমি এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করেছি, যার মাধ্যমে জনগণের আবেগ বান শরিয়তের সীমার মধ্যে থাকতে পারে। এই আবেগকে খারাবীর বদলে এমন কিছু নেক কাজের দিকে ঘুরাবার চেষ্টা করা হয়েছে, যা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে পছন্দনীয়। এ ব্যাপারে অবশ্যই আমার এ দাবি ছিলো না যে, লোকদেরকে গিলাফ দেখতেই হবে এবং এর মিছিলে শরিক হতেই হবে, না আসলে গুনাহগার হবে, আর আসলে এই সওয়াবেরও প্রতিদান পাওয়া যাবে। আমার এ ইচ্ছাও নেই যে, আগামীতে যদি পাকিস্তানেই গিলাফ বানানো হতে থাকে, আর তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকে তো আমি যিয়ারত করানোর জন্য যত্ন নেবো বা মিছিল করানোকে একটি স্বতন্ত্র এবং স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবো। এখন আমি জানতে চাই, ফিকাহর কোনো বিধান মতে আমি গুমরাহকারী বিদআতের জন্য দায়ি। কোনো ব্যক্তি যদি গালিগালাজ না করে যুক্তি দ্বারা আমাকে বুঝিয়ে দেন যে, আমার কাজটি বিদআত দলালাত (গুমরাহকারী বিদআত) পর্যায়ের, তাহলে তাতে আমার শরমিন্দা হতে এবং তওবা করতে এতটুকু দ্বিধা থাকবে না। আমি এমন অহংকারী নই যে, গুনাহকে গুনাহ বলে জানা সত্ত্বেও কথার মারপ্যাচ ব্যবহার করে সেই গুনাহের মধ্যে জিদ ধরে বসে থাকবো।

৩. যে কোনো কাপড় কোনো অবস্থাতেই এতো বরকতময় হতে পারে না যে, তাকে ছুঁতে হবে, চুমু দিতে হবে, তার জিয়ারত করতে ও করাতে হবে এবং তাকে ধুমধাম করে পাঠাতে হবে। সে কাপড় কা'বা শরীফের উপর চড়ানোর উদ্দেশ্যে তৈরি করা হোক বা চড়ানোর পর সেখান থেকে নামিয়ে আনা হোক। বরং ফিকাহবিদগণ তো কা'বা শরীফ থেকে খুলে আনা পর্দা দ্বারা পোশাক প্রস্তুত করাকেও জায়েয রেখেছেন। অবশ্য এই শর্তে যে, তাতে কালেমায়ে তৈয়্যেবা, কুরআনের আয়াত অথবা আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম লিখিত না থাকা চাই। কিন্তু

লোকেরা যদি নিজ থেকে শুধুমাত্র এইজন্য একে সম্মান দেখায় যে, এই জিনিসটি আল্লাহর ঘরের জন্য যাচ্ছে (কোনো শরয়ী হুকুম বা ফতোয়ার হিসেবে নয়, অথবা সেখান থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে এ জন্যও নয়) তাহলে সম্মান প্রদর্শনকে অন্যায় বলা যাবে না। এ সম্মান আসলে আল্লাহর ঘরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাওয়ার কারণে। এর পিছনে আল্লাহ তায়ালাকে বড় জানা এবং মুহাব্বাতের অনুভূতি ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস উৎসাহকারী হিসেবে সক্রিয় থাকবে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি এ সম্মান প্রদর্শনকে ওয়াজিব বা এ উদ্দেশ্যে বিশেষ কোনো পদ্ধতিকে বাধ্যতামূলক করে নেয়, তাহলে সেটা ভুল হবে। আবার কেউ যদি এটাকে নিন্দনীয় বলে এবং শিরক আখ্যা দেয়, তাহলে এটাও বাড়াবাড়ি হবে। এখন রইলো এর জিয়ারত করা এবং এর জন্য মিছিলের আয়োজন করা। এর জবাব হলো, যে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ কাজ করা হয়েছিল, উপরে আমি তার ব্যাখ্যা দান করেছি। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৬০, সংখ্যা ১, এপ্রিল ১৯৬৩ খৃ.)*

ভালো কাজের নির্দেশ দানের দায়িত্ব কিভাবে আদায় করা যাবে?

প্রশ্ন : বহুদিন থেকে আম্‌র বিল মারূফ (ভালো কাজের নির্দেশ দান) এবং নাহী আনিল মুনকারের (মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার) ব্যাপারে পেরেশান আছি। নাহী আনিল মুনকার সম্পর্কে শরিয়তের হুকুম আহকামের যে কড়াকড়ি দেখি এবং অন্যদিকে দুনিয়ায় বিরাজমান অন্যায় কাজের অবস্থা ও প্রবণতার দিকে খেয়াল করলে বাস্তবে কি প্রকারে এ হুকুম পালন করা যাবে, তা কিছুই বুঝতে পারি না। অন্যায় দেখে চুপ থাকার পরিবর্তে মুখ দিয়ে নিষেধ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, (কারণ হাত দিয়ে না হোক, মুখ দিয়ে বারণ করার ক্ষমতা ক্ষেত্রবিশেষ ছাড়া প্রায় হয়েই থাকে) তাহলে সে অবস্থায়, মানুষকে এই কাজেই সারাক্ষণ লেগে থাকতে হবে। কারণ মুনকার (অন্যায় কাজ) থেকে কোনো জায়গাই মুক্ত নেই। কিন্তু এ কাজে বড় বাধা হলো, যাকেই নিষেধ করা হোক না কেনো, সে এটাকে কল্যাণ কামনা হিসেবে মেনে না নিয়ে বরং অসন্তুষ্টই হয়ে বসে। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা এটাই যে, যতো নরম কথায় এবং শুভ কামনার সাথেই কাউকে কিছু নিষেধ করা হোক না কেনো, সে কখনই সেটাকে পছন্দ করে না, বরং এতে কেউ কেউ একবারেই অগ্রাহ্যের ভাব দেখায়, কেউ বা উল্টো জবাব দিয়ে দেয়। কেউ যদি এটাকে গ্রাহ্য করেও তবে বড়জোর সে চুপ হয়ে যায়। অবশ্য খারাপ তারও লাগে এবং কোনো প্রভাব পড়ে না।

যেমন, পথে চলতে গিয়ে কোনো মহিলাকে বেপর্দা অবস্থায় দেখে উপস্থিত ক্ষেত্রে রাস্তার উপরই যদি তাকে নিষেধ না করা হয়, তো পরে এ অপরিচিতা মহিলাকে নিষেধ করার সুযোগ মিলতে পারে না। এমতাবস্থায় আপনার বিবেচনায় তাকে পথের মধ্যে থামিয়ে বুঝানো সমীচীন হবে কি? এভাবে যে নারীর চালচলন সঠিক

নয়, তাকে কিভাবে নসীহত করা যাবে? কোনো স্ত্রীলোক সর্বসাধারণে যতো বদনামই হোক না কেন, তাকে উপদেশ দিতে গেলে সে খারাপ মনে করবেই। কোনো দরসের বৈঠকে অথবা কোনো এজতেমাতে ডাকলেও সে আসবে না। তাহলে তাদের ব্যাপারে ঐ ফরয কাজ আদায় করার উপায় কি হবে? পরিশেষে এটাও মেহেরবানী করে অবহিত করবেন যে, মেয়েদের পক্ষে পুরুষদের উপর তাবলীগ করাও কি জরুরি?

জবাব : আম্‌র বিল মারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার-এর হুকুম সবার জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এ নির্দেশ পালনে মানুষকে হিকমত অবলম্বন করতে হবে। স্থান কাল পাত্র বা সময় সুযোগ না বুঝে সর্বস্থলে একই ধরনের গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাজ করলে কোনো কোনো সময়ে উল্টা ফল হয়। আপনাকে নির্দিষ্ট এমন কোনো পদ্ধতি বলে দেয়া আমার পক্ষে কঠিন, যার উপর আপনি চোখ বুঁজে চলতে পারেন। আসলে এটাই দরকার যে, আপনি ধীরে ধীরে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষা লাভ করবেন এবং ক্রমান্বয়ে নিজের মধ্যে এমন হিকমত গড়ে তুলবেন, যাতে স্থান কাল পাত্রের অবস্থা বুঝে আম্‌র বিল মারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার-এর খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার একটি উপযোগী পদ্ধতি এখতিয়ার করতে পারেন। এ কাজে প্রথম প্রথম আপনার দ্বারা ভুলও হবে, আর কোনো কোনো সময় হয়তো আপনার ভুল হবেও না, কিন্তু অপর পক্ষ থেকে অযথা জবাব দেয়া হবে। কিন্তু এসব অভিজ্ঞতাই আপনাকে সঠিক পদ্ধতির পথ দেখাবে। তবে শর্ত হলো, আপনি মন খারাপ করে এ কাজ পরিত্যাগ না করেন। এরপর প্রত্যেকবারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে, আপনার দ্বারা যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, তো সেটা কি, আর প্রতিপক্ষ উল্টা বা হঠকারিতাপূর্ণ কোনো ব্যবহার যদি আপনার সাথে করেই বসে, তাহলে তাকে সঠিক পথে আনার উপায় কি হতে পারে। এখানে এ খেয়ালও রাখতে হবে যে, এ কাজে খুব বেশি ধৈর্যের প্রয়োজন। বিপরীত কিছু দেখলে যদি বুঝেন যে, এ সময়ে তাকে কিছু বলা ঠিক হবে না, তাহলে তখন এড়িয়ে যান এবং তার জন্য অন্য কোনো উপযোগী সুযোগ তালাশ করতে থাকুন। এছাড়া এ কাজের জন্য অপর পদ্ধতি হলো, কোনো জায়গায় হয়তো এমন কোনো খারাবি আছে, যা শুধরাতে যাওয়া আপনার পক্ষে মুশকিল। এমতাবস্থায় সেখান থেকে সরে পড়ুন এবং এধরনের কোনো সমাবেশ বা অনুষ্ঠান হলে আপনি তার থেকে পৃথক থাকুন। এ ধরনের সমাবেশ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণ লোকেরা নিজেরাই আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। সে সময়ে সুযোগমতো অতিশয় নম্রতার সাথে আপনার (বিচ্ছিন্ন থাকার) কারণটি জানিয়ে দেবেন এবং একথাও বলে দেবেন যে, আপনাদেরকে বিরত রাখার

ক্ষমতা তো আমার নেই, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অমান্য করার কাজে শরীক হওয়ার দু:সাহসও আমার হয় না।

আপনি নির্দিষ্ট যে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন তার জবাব হচ্ছে, পথচারী বেপর্দা নারী দেখলে তাকে সেখানে থামিয়ে বুঝানো যথার্থ নয়। এটা এক সাধারণ মুসীবত, ব্যক্তিগতভাবে এর সমাধান এখন সম্ভব নয়। এটা বরং এখন সম্মিলিত সংশোধনী প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঠিক করা যেতে পারে। আপনার কাজ হচ্ছে নিজের পরিচিত মহিলাদের মধ্যে থেকে যারা এ ব্যাধিতে ভুগছে, আপনি তাদের পর্যন্ত আল্লাহর রসূলের নির্দেশাবলী পৌছানোর চেষ্টা করুন।

যার চালচলন খারাপ তাকে বুঝানোর জন্য আপনি এমন পদ্ধতি গ্রহণ করুন, যেনো তার মধ্যে এ সন্দেহ না জাগে যে, আপনি তাকে দুশ্চরিত্রা মনে করে নিয়েছেন। উপরন্তু দুশ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে কোনো উপদেশ না দিয়ে প্রথমে ঈমান, আল্লাহর ভয় এবং আখেরাতের জবাবদিহির অনুভুতি তার মধ্যে পয়দা করার চেষ্টা করুন। বৈঠকে তারা না আসলে এমন কোনো অনুষ্ঠান করুন যেখানে তারা শরীক হয় এবং সেখানেই তাদেরকে কেয়ামত, আখেরাত এবং বেহেশত দোযখ সম্পর্কে কথা শুনান এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হওয়ার অনুভূতি তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলুন।

আম্‌র বিল মারুফ এবং নাহী আনিল মুনকার-এর কাজ করার নির্দেশ নারী পুরুষ সবার জন্য সমান। কিন্তু মহিলাদেরকে এ ফরযটি পালন করার কাজ নিজেদের পরিবেশের মধ্যেই করতে হবে। তাদের আত্মীয় পুরুষ যাদের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্তা বলা সম্ভব, তাদেরকে অবশ্যই তারা বলতে পারবে। সর্বসাধারণ পুরুষ লোকদেরকে নসীহত করা মহিলাদের উপর ফরয নয়, অবশ্য প্রকাশযোগ্য লেখনীর আকারে এ খেদমত সম্পন্ন করা যায়। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৬, সংখ্যা ৩, জুন ১৯৬৩ খৃ.)*

হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) ও কা'বা ঘর সম্পর্কে অমুসলমানদের ভুল ধারণা

প্রশ্ন : এখানে (লন্ডনের ইসলামিক কালচার সেন্টারে) জুমআর দিন কয়েকজন ইংরেজ তরুণী এসে অপেক্ষমান ছিলো। খুব নিবিষ্ট চিত্তে তারা নামায পড়া দেখছিল। পরে তারা আমাদের জিজ্ঞেস করলো, আপনারা দক্ষিণ পূর্ব দিকে মুখ করে কেন নামায পড়েন? অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়েন না কেন? কা'বাকে এতো গুরুত্ব দেয়ার কারণ কি? কালো পাথরকে চুমু দেন কেন, সেটাও তো অন্যান্য পাথরের মতো একটি পাথর? এভাবে এটাও তো হিন্দুদের ন্যায় মূর্তিপূজাই হয়ে গেলো। তারা মূর্তির সামনে নিয়ে পূজা করে, আর মুসলমানরা

তার দিকে মুখ করে সিজদা করে। একথার সন্তোষজনক জবাব আমরা দিতে পারিনি। মেহেরবানী করে এ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন, যেনো পুনরায় এমন কোনো সুযোগ আসলে প্রশ্নকারীদেরকে বুঝানো যায়।

জবাব : সম্প্রতি প্রায় এ ধরনেরই আরো কয়েকটি প্রশ্ন ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে আমার কাছে এসেছে। এতে বুঝা যায়, আজকাল মুসলমানদের কাছে অনেক জায়গাতেই এ ধরনের প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এসব প্রশ্নকারীদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে, যাদের উদ্দেশ্যই হলো ইসলামের উপর কোনো না কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা। বস্তুত দুনিয়ার কোনো জবাবই তাদের কাছে তৃপ্তিজনক হয় না। অবশ্য কিছু লোক এমনও আছে যাদের অন্তরে সত্য ও সঠিক অবস্থা না জানার কারণে নেক নিয়তের সাথে সন্দেহ পয়দা হয়ে যায়। এ ধরনের লোকদেরকে অবশ্যই যুক্তি সহকারে সঠিক অবস্থা অবহিত করে দেয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

মূর্তিপূজার আসল ব্যাপার হলো, মুশরিকদের বিভিন্ন সম্প্রদায় কোনো কোনো সত্তাকেও আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী ও ক্ষমতার অংশীদার হিসেবে গণ্য করে। অথবা চিন্তা করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর এই ভুল আকীদার বশবর্তী হয়ে তারা ঐসব সত্তার মূর্তি তৈরি করে এবং আস্তানা বানিয়ে সেখানে বিভিন্ন পূজার অনুষ্ঠান পালন করে। (অবশ্য) আজ পর্যন্ত কোনো মুশরিক জাতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার মূর্তি তৈরি করেনি। আর তাঁকে পূজা করার জন্য তাঁর কাল্পনিক কোনো মূর্তি তৈরি করে তার সামনে সিজদা করার পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয়নি। দুনিয়ার প্রায় সকল মুশরিক স্পষ্টভাবেই একথা বুঝেছে যে, আল্লাহ তায়ালা যে কোনো আকার আকৃতির উর্ধ্বে। তাদের ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস এবং পূজা পার্বণের মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালা এবং অন্যান্য উপাস্যদের মধ্যকার পার্থক্য স্বীকার করা হয়েছে। এ কারণে অন্যান্য মা'বুদদের মূর্তি তৈরি করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার কোনো মূর্তি বানানো হয়নি।

মূর্তি পূজার এই তত্ত্বকথা উত্তমরূপে যে ব্যক্তি অনুধাবনে সক্ষম, তার পক্ষে এহেন ভ্রান্তির শিকার হওয়া সম্ভব নয় যে, মুসলমানদের কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়া অথবা হজ্জের সময় কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা এবং হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার মধ্যে মূর্তিপূজার সাথে নিম্নতম কোনো সাদৃশ্য আছে। ইসলাম খাঁটি তৌহিদী ধর্ম, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মা'বুদই স্বীকার করে না। আর এ কথাও মানে না যে, আল্লাহ তায়ালা কারো মধ্যে প্রবেশ করে একাকার হয়ে গেছেন, অথবা কোনো বস্তুগত সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। অমুসলমানেরা কা'বা শরীফকে না দেখলেও কোনো না কোনো সময়ে তার ছবি দেখেছে। তারা কি সত্য মনে এ কথা বলতে পারে যে, এটা আল্লাহর তায়ালার মূর্তি। আর আমরা এর পূজা করছি? কোনো সঠিক সচেতন সজ্ঞান ব্যক্তি একথা

বলতে পারে যে, চার দেয়ালের এ ইমরাতটি আল্লাহ তায়ালার আকৃতি অনুসারে নির্মিত হয়েছে? এখন রইল হাজরে আসওয়াদ এর কথা, এটা তো নিছক একটি ছোট্ট পাথর, যা কা'বা শরিফের চার দেয়ালের এক কোণে মানুষ পরিমাণ সোজা উপরে স্থাপিত। মুসলমানরা এর দিকে ফিরে সিজদা করে না, বরং কা'বা ঘরের তাওয়াফ এখান থেকে শুরু করে এখানেই শেষ করা হয়। প্রতিটি তাওয়াফ শুরু হয় একে চুমু দিয়ে বা চুমু দেওয়ার ইশারা করে। মূর্তি পূজার সাথে এর সম্পর্কটা কিসের?

এবার প্রশ্ন রয়ে গেলো, সারা দুনিয়ার মুসলমানরা কা'বা ঘরের দিকেই মুখ করে নামায পড়ে কেন। এর সরল সোজা জবাব হলো, এটা শুধু এককেন্দ্রীকরণ ও শৃংখলার প্রয়োজনেই। সারা দুনিয়ার জন্য একটি দিক ঠিক করে যদি না দেয়া হতো, তাহলে প্রতিটি নামাযের সময়েই নানা প্রকার গণ্ডগোল হতো। একাকী অবস্থায় নামায পড়াকালীন কারো মুখ পশ্চিমে, কারো মুখ পূর্বদিকে থাকতো। আবার কারো মুখ উত্তরে, আর কারো মুখ থাকতো দক্ষিণে। আর মুসলমানরা জামায়াতসহ নামায পড়তে গেলে প্রতি ওয়াক্তে এবং প্রতিটি মসজিদে একটি কনফারেন্সের মাধ্যমে ঠিক করতে হতো আজ কোন দিকে মুখ করে নামায পড়তে হবে। শুধু তাই নয়, বরং প্রত্যেক মসজিদ নির্মাণের সময় প্রত্যেক মহল্লায় ঝগড়া হতো এর মুখ কোন্ দিকে রাখা হবে। একটি কেবলা নির্ধারণ করে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা চিরদিনের জন্য এই গোলমালের অবসান করে দিয়েছেন। আর কেবলাও এমন স্থানে বানানো হয়েছে যে, ঐ স্থানটি প্রকৃতিগতভাবে কেন্দ্র হওয়ার যোগ্য ছিলো। এর কারণ, আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের এই আন্দোলন এখান থেকেই শুরু হয়েছিল এবং দুনিয়াতে এক আল্লাহর বন্দেগীর জন্য সর্বপ্রথম একেই ইবাদতগাহ বানানো হয়েছিল। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৬১, সংখ্যা ২, নভেম্বর ১৯৬৩ খৃ.)*

অর্থনৈতিক প্রশ্ন

অর্থনৈতিক বিষয়ে কতিপয় বাস্তব প্রশ্ন

সুদ বর্জিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে যখন ব্যবসা বাণিজ্য, এমনকি গোটা অর্থনৈতিক জীবন সুদের উপর নির্ভর করে চলেছে এবং রন্ধ্রে রন্ধ্রে যখন সুদ ঢুকে গেছে, এ অবস্থায় বাস্তবে সুদ ব্যবস্থা তুলে দেয়া সম্ভব কি? সুদ বন্ধ করে দিয়ে সুদ বর্জিত ভিত্তিসমূহের উপর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করা যেতে পারে কি?

জবাব : কোনো মুসলমান যদি মনে করে যে, সুদ একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা এবং এ ছাড়া বর্তমান জামানায় কোনো কাজ চলতেই পারে না, তাহলে আমার মতে এ ধারণা একেবারেই ভুল। মৌলিকভাবে এ ধারণা শুধু ভুলই নয় বরং এটা আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে একটি কুধারণা পোষণ করা, যাঁর সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসই হলো, তিনি আমাদেরকে এমন কোনো বিষয় গ্রহণ করতে নিষেধ করেননি, যা মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য এবং যার অভাবে দুনিয়ার কাজ কারবারই চলতে পারেনা। কিন্তু আমি শুধু এতোটুকু জবাব দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করবো না বরং এটাও আরয করবো যে, স্বয়ং বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক জীবনের মূলনীতি ও মতবাদসমূহও এই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে যে, সুদের পরিমাণ যথাসম্ভব কম করতে হবে। এমনকি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনে একে একেবারেই তুলে দিতে হবে। আর এ কারণেই আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন দ্রুত গতিতে সুদের হার কমে যাচ্ছে এবং দুনিয়া সুদের অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ আমার প্রণীত সুদ নামক গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

একটি ইসলামি রাষ্ট্র বাস্তব এ সমস্যার সমাধান কিভাবে দিতে পারে, সেটা আমি এখানে সংক্ষেপে বলে দিতে চাই। আমার মতে এর জন্য এটাই সুষ্ঠু পদ্ধতি যে, প্রথমে দেশের মধ্যেই সুদ রহিত করে দিতে হবে। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে, বৈদেশিক বাণিজ্যে সুদ বন্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে সরকার আইনত সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে এবং নিজেরাও সুদের লেনদেন পরিত্যাগ করবে। কোনো আদালত সুদের ডিক্রি দেবেনা। কোনো ব্যক্তি সুদী কারবার করলে তাকে ফৌজদারী আইনে অপরাধী সাব্যস্ত করতে হবে। একেবারে শুরুতে এরূপ সিদ্ধান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা পর্যন্ত সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো সম্ভাবনা আদৌ সৃষ্টি হতে পারে না। একটি উদাহরণের মাধ্যমে

এ সত্য বুঝা যেতে পারে। কোনো রেল কোম্পানী তার গাড়িতে সফরের জন্য যদি টিকিট করা জরুরি বলে স্থির করে আর তারপর বিনা টিকিটে ভ্রমণের সুযোগও যদি টিকিয়ে রাখে, তাহলে টিকিটওয়ালা যাত্রী কমই মিলবে। কিন্তু বিনা টিকিটের ভ্রমণ যদি ফৌজদারী অপরাধ হয়, সে অবস্থায় টিকিট না নিয়ে কেউই ট্রেনে ভ্রমণ করতে সাহস করতে পারবেনা। একইভাবে যতোদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে আইনত সুদ বৈধ থাকবে, যতোদিন সুদভিত্তিক লেনদেনের অনুমতি বহাল থাকবে, আমাদের সরকার নিজে যতোদিন পর্যন্ত সুদী লেনদেন করতে থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত আমাদের আদালতগুলি সুদের ডিক্রি জারি করতে থাকবে, ততোদিন এ সম্ভাবনা আদৌ নেই যে, সরকার বা অন্য কোনো সংস্থা এমন ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করতে কৃতকার্য হবে, যা সুদের পরিবর্তে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। তবে ব্যাংকের সুদভিত্তিক আদান প্রদানকে যদি শুরুতেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তাহলে আমরা পুরোপুরি আশা রাখি যে, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেই এধরনের একটি সিস্টেম চালু হতে পারে।

অংশীদারিত্ব বলতে আমি বুঝাতে চেয়েছি লাভ ও লোকসানে অংশীদাররা সমানভাবে অংশীদার হবে। আভ্যন্তরীণভাবে সুদকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে বৈদেশিক আদান প্রদানেও এথেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এজন্য ইনশাআল্লাহ ঝগড়া করার প্রয়োজন দেখা দিবে না, বরং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রেখেই অন্যান্য দেশকে এতে রাজি করানো সম্ভব।

ইসলামি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা

প্রশ্ন : জাতীয়করণের (Nationalisation) ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রের কি পলিসি গ্রহণ করা উচিত?

জবাব : ইসলামের আলোকে এ বিষয়ে যতোটা আমি পড়াশোনা করেছি, তাতে আমি এইটুকু বলতে পারি যে, ইসলাম মৌলিকভাবে উৎপাদনের উপায় উপকরণ জাতীয়করণের পক্ষপাতী নয়। এ বিষয়টি ইসলামের গোটা সামগ্রিক ব্যবস্থা ও চেতনার বিপরীত। ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমস্যার সঠিক সমাধান সমস্ত উপায় উপাদান জাতীয় সম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে সম্ভব নয়। অবশ্য কোনো শিল্প অথবা বাণিজ্যিক কোনো বিভাগ সম্পর্কে যদি অভিজ্ঞতা দ্বারা বোঝা যায় যে, সেটাকে ব্যক্তি মালিকানায় রাখলে এর প্রসার বা উন্নতি সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় সেটাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেয়া যেতে পারে।

ইসলামি রাষ্ট্র এবং দায়িত্বহীন কর্মচারী

প্রশ্ন : বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং দায়িত্ববোধের অনুভূতিই কম। একটি ইসলামি রাষ্ট্র তাদের দ্বারা কিভাবে কাজ আদায় করবে?

জবাব : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাষ্ট্রের কর্মচারীবৃন্দ এবং জাতির অন্যান্য কিছু লোকের নৈতিক চরিত্রের অবস্থা পুরো জাতিকে একেবারে অথর্ব করে দিয়েছে। এটা নাজুক এবং জটিল সমস্যা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সর্বপ্রথম এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চারিত্রিক দোষক্রটিগুলি অনিবার্যভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয় না থাকা ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতার বিষফল। এটা সকল অন্যায়ের মৌলিক কারণ। তাছাড়া আরো অনেক কারণ আমাদের সামাজিক জীবনে পাওয়া যায়, যার দরুন এ মন্দ বিষয়গুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন, আমাদের সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেরা অত্যন্ত বিলাসী ও অপচয়কর জীবন যাপন করে থাকে। এই শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা শুধু খাওয়া পরা, বিলাসিতাপূর্ণ বাসস্থান ও বাচ্চাদের শিক্ষাদান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নেই, বরং আরো বহু প্রকার কাজের জন্য তাদের হাজার হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। দেশ পরিচালকরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত নিয়ম এই যে, উপর তলার লোকদের আচার আচরণ নিম্নস্তরের লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী উঁচু শ্রেণীর প্রভাব গ্রহণ করে এবং নিম্নশ্রেণী ও আরো নিচের লোকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং একেবারে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কার্যত নিজেদের জীবনের মান ঠিক রাখার জন্য ন্যায় অন্যায় সব রকমের উপায় উপকরণ গ্রহণ করতে একপ্রকার বাধ্য হয়ে যায়।

এখন আপনি যদি এসব যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে চান, তাহলে কোনো এক শ্রেণীর সংশোধন দ্বারা সবার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তাও আবার আইনের জোরে, এটা কিছুতেই আশা করতে পারেন না। এ রোগের জীবানু সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামের নীতি হলো, সামাজিক খারাবী দূর করার উদ্দেশ্যে সে শুধু আইনের উপরই নির্ভর করে না, ইসলাম বরং প্রতিটি দিক এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগ থেকে সামাজিক অনাসৃষ্টির উপর আক্রমণ চালায়। আইনের শাসন ও প্রভাবসহ শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে, তাবলীগ ও উপদেশ দ্বারা, সংশোধনী প্রচেষ্টা ও প্রতিরোধমূলক যাবতীয় তদ্বীরের মাধ্যমে অন্যায়কে দূর করে। সমাজ সংস্কারের জন্য একটি ইসলামি রাষ্ট্রকে একাজগুলির সবই করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাপাখানা, সংবাদপত্র ও প্রচারযন্ত্রের সকল শক্তিগুলিকেই এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। এরপর সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো উপরের শ্রেণীর লোকদের চরিত্র থেকে অপচয়ের কারণগুলি বাস্তবে দূর করতে হবে। এ শ্রেণীর মধ্য থেকে যারা উচ্চ পদে বহাল আছে, তাদের বেতন বৃদ্ধি করার পরিবর্তে কমাতে হবে। কারণ অধিক হারের বেতনই তাদেরকে অতিরিক্ত খরচের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে, নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে, কারণ কোনো কোনো সময় প্রকৃত প্রয়োজনের তাগিদেই তারা অন্যায় কাজ করতে বাধ্য হয়। আমার অনুমান নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ লোক

সাধারণভাবে ঘুষ ও অন্যান্য অসৎ কাজে লিপ্ত হতে চায় না, কিন্তু কোনো কোনো সময় অবস্থার চাপে তারা অন্যায় পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। যাই হোক, এ সকল পদক্ষেপই অবস্থার সংশোধনের জন্য অপরিহার্য। এসব ব্যবস্থার সবগুলি গ্রহণ করার পরও যদি কেউ ঘুষ ও আমানতের খেয়ানত করা থেকে বিরত না হয়, তাহলে সেই সব অপরাধীদের জন্য এমন সব আইন প্রয়োজন, যার মাধ্যমে তাদেরকে শহরের চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো ব্যক্তি এ প্রশ্নও তোলে যে, এ কাজ করতে গেলে হঠাৎ করে বাজেট বেড়ে যাবে। এর জবাবে আমি বলবো, যদি আমাদের সরকারি ও আধা সরকারি কর্মচারীরা সবাই ঈমানদার হয়ে যায় এবং তাদের দারিদ্র্যও না থাকে, তাহলে রাষ্ট্রের আয় কমপক্ষে দ্বিগুণ বেড়ে যেতে পারে। কারণ ঘুষ, প্রতারণা ও খেয়ানতের কারণে সরকারের আয়ের অনেকাংশ কোষাগার পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারে না। সরকার এগুলি থেকে বঞ্চিত না হলে সহজেই বেতন বৃদ্ধির চাপ সহ্য করতে পারবে। অবশ্য একাজের সূচনা করতে গিয়ে হয়তো সরকারকে জনগণের নিকট থেকে বিনা সুদে ঋণ চাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তবে জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতি নির্ভরতা এবং আস্থা বর্তমান থাকলে, একটি সংস্কারমূলক স্কীমের উদ্দেশ্যে বিনা সুদে ঋণ হাসিল খুব কঠিন নয়। সরকার, কর্মচারী এবং জনসাধারণ এ অভিযানে বিশ্বস্ততার সাথে পরস্পরকে সহায়তা করলে হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে ঘুষ ও খেয়ানতের নাম নিশানাও মিটে যাবে এবং বৈধ উপায়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনসমূহ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে।

আগাম লেনদেন

প্রশ্ন : ইসলামের দৃষ্টিতে আগাম লেনদেন কি (Forward Transaction) কি জায়েয?

জবাব : এটা একটি দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। তবে এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে, আগাম বেচাকেনা একটি মাত্র অবস্থাতেই জায়েয বলে ইসলাম স্বীকার করে, যার নাম হচ্ছে বাইয়ে সালাম। বাইয়ে সালামের মধ্যে কয়েকটি শর্ত পূর্ণ হওয়া জরুরি।

১. যে দ্রব্যের কেনাবেচা হচ্ছে তার নাম ও ঐ জিনিসের ধরন পুরোপুরি নির্দিষ্ট হতে হবে এবং বাজারেও তার নমুনা থাকতে হবে।

২. দাতা ও গ্রহীতা নির্ধারিত হতে হবে।

৩. ঐ জিনিসের পরিমাণ, মূল্য এবং গুণাগুণ নির্দিষ্ট হতে হবে।

৪. যে সময়ে বিক্রেতা ক্রেতাকে মাল সরবরাহ করবে, সে সময়ও নির্ধারণ করা জরুরি।

৫. আগাম খরিদ করার ব্যাপারে পুরোপুরি মূল্য পরিশোধ হতে হবে। এ শর্তগুলি যে কোনো একটি শর্ত পূরণ না হলে, বেচাকেনা ফাসেদ বা বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

সুদ ও বৈদেশিক বাণিজ্য

প্রশ্ন : বিদেশী ব্যবসায়ীরা আমাদের থেকে বিনা সুদে মাল গ্রহণ করতে বাধ্য হলে নিজেদের পক্ষের মূল্য কি বাড়িয়ে দেবে না? এভাবে সুদের লেনদেন বন্ধ করে দেয়ায় কার্যত বাণিজ্য কি অলাভজনক হয়ে যাবে না?

জবাব : বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের প্রাপ্য মূল্য পাওয়ার নিশ্চিত এবং বিশ্বস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেলে সম্ভবত তারা নিজেদের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করবে না। কিন্তু তাদের পণ্যের মূল্য কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, এ কথা ধরে নিলেও আমাদের ব্যবসা তো হারামের কদর্যতা থেকে বেঁচে গেলো। আর এটা প্রকৃতপক্ষে লোকসান নয়, বরং খুবই লাভজনক কারবার। তা ছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে সংঘটিত ইসলামি বিপ্লব সারা দুনিয়ার জন্যই শিক্ষাপ্রদ হবে। আমাদের বাস্তব উদাহরণ দ্বারা ইনশাআল্লাহ গোটা বিশ্বের জাতিসমূহ একথার সমর্থক বরং সন্তুষ্টির সাথে স্বীকার করে নেবে যে, সুদ জায়েযও নয়, অপরিহার্যও নয়।

প্রশ্ন : বর্তমান বৈদেশিক বাণিজ্যে এটাও একটি বাস্তব অসুবিধা যে, এর জন্য ব্যাংকে letter of credit খোলা জরুরি হয়ে থাকে এবং সুদ ব্যতীত সেটা খোলা সম্ভব নয়।

জবাব : এটা সত্য যে, বর্তমান অবস্থায় লোকেরা অন্যান্য দেশের সাথে ব্যবসা করতে চাইলে সে ব্যাপারে কিছু না কিছু জটিলতা অবশ্যই আছে। আর এ জটিলতা চলতেই থাকবে, যতোক্ষণ না দেশের সরকার আপনাকে সাহায্য করবে এবং নিজেরাও বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে সুদ থেকে বাঁচার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সুতরাং, সরকার যদি বিভিন্ন দেশের সাথে সুদবিহীন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করে, দেশের অভ্যন্তরেও সুদ বিহীন অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নেয় এবং বিদেশী রাষ্ট্রসমূহে দেশীয় ব্যবসায়ীদের দেনার ব্যাপারে সহায়তা করার নীতি অবলম্বন করে, তাহলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

বৈদেশিক পুঁজির উপর সুদ

প্রশ্ন : একটি ইসলামি রাষ্ট্র দেশে সুদভিত্তিক বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের অনুমতি দিতে পারে কি? অনুমতি না দেয়া অবস্থায় দেশের শিল্পোন্নতি কি থেমে যাবে না?

জবাব : একটি ইসলামি রাষ্ট্রে কোনো মুসলিম অমুসলিম দেশী বিদেশী পুঁজিপতিকে সুদভিত্তিক ব্যবসা করার আদৌ অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। দেশের অভ্যন্তরে সুদ বন্ধ করে দিলে বিদেশী পুঁজি নিজেই পালাতে শুরু করবে।

এ পদক্ষেপ ইনশাআল্লাহ আমাদের পক্ষে উপকারীই হবে। ইতিহাসে আমরা এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাইনি যে, কোনো দেশ বিদেশী পুঁজির উপর ভিত্তি করে উন্নতি করার চেষ্টা করতে যেয়ে উল্টো আরো বেশি সংকটাবর্তে দীর্ঘদিনের জন্য আবদ্ধ হয়ে যায়নি। আমাদেরকে নিজের দেশের পুঁজি দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ানোর এবং শিল্প কারখানা গড়ে তোলার চেষ্টা করাই উন্নতির পূর্বশর্ত।

যাকাতের পরও কি আয়কর আরোপ করা বৈধ?

প্রশ্ন : ইসলাম কি যাকাত উসুল করার সাথে সাথে আয়কর আরোপ করারও অনুমতি দেয়?

জবাব : জি হ্যাঁ, ইসলামি রাষ্ট্রে এ দু'টিই এক সাথে জায়েয হতে পারে। যাকাতের ব্যয়খাত পুরোপুরি নির্ধারিত। সূরা তওবায় এগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি এর নিসাব (অর্থাৎ সর্বনিম্ন যে পরিমাণ সম্পদের উপর যাকাত আরোপিত হয়) এবং হারও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এসব ব্যাপারে কোনো প্রকার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন জায়েয নয়। বলাবাহুল্য, এরপর রাষ্ট্র অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধ করলে সেজন্য দেশবাসীর নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। এ সাহায্য গ্রহণ যদি বলপূর্বক হয়, তাহলে তা ট্যাক্সে পরিণত হয়। যদি স্বেচ্ছামূলক হয়, তাহলে তা পরিণত হয় চাঁদায়। আর যদি ফেরত দেবার শর্ত থাকে, তাহলে হয় ঋণ। যাকাত ও অন্যান্য ট্যাক্স পরস্পরের পরিপূরক হতে পারেনা এবং এদের একটি অন্যটিকে বাতিলও করতে পারেনা।

এ হচ্ছে এ প্রশ্নটির নীতিগত জওয়াব। কিন্তু এই সঙ্গে আমি আপনাকে এতোটুকু নিশ্চয়তা দান করতে পারি যে, আমাদের দেশে একটি যথার্থ ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেলে এবং বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর সাথে তার যাবতীয় ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকলে, আজকের মতো এতোরকম কর আরোপের প্রয়োজন থাকবেনা। বর্তমান যুগে ট্যাক্সের ব্যাপারে যতো রকম দুর্নীতি ও জালিয়াতি হয়, তা সবই আপনি জানেন। একদিকে যে উদ্দেশ্যে ট্যাক্স লাগানো হয় তার বড়জোর শতকরা দশভাগ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একে ব্যয় করা হয়। আবার অন্যদিকে ট্যাক্স থেকে নিস্কৃতি লাভের (Evasion) একটা সাধারণ প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজেই ব্যবস্থা যদি গলদমুক্ত হয়ে যেতে পারে, তাহলে বর্তমান প্রচলিত ট্যাক্সের এক চতুর্থাংশই যথেষ্ট বিবেচিত হবে এবং এর কল্যাণকারীতাও কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। *(সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪)*

সুদ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন : আমি অর্থনীতির ছাত্র। এ কারণে ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কিত যতোগুলি বই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলি আমি অধ্যয়ন করেছি। সুদের কতিপয় অধ্যায় আমি কয়েকবার করে পড়েছি, কিন্তু তবুও কোনো কোনো বিষয় আমি বুঝতে পারিনি।

ক. অধিক ব্যয় করার নীতি

কিছু দিন পূর্বে আপনাকে প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছিলাম যে, আপনি খরচ করার উপর যতো গুরুত্ব দান করেন তার ফল একমাত্র এই দাঁড়াবে যে, ইসলামি রাষ্ট্রে পুঁজি ঘাটতি দেখা দিবে এবং দেশে শিল্পের উন্নতি থেমে যাবে। এর জবাব আপনার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল যে, "সুদ গ্রন্থে এর জবাব দেওয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলি পুনরায় অধ্যয়ন করা হোক।" আমি আরো কয়েকবার ঐ অধ্যায়গুলি পাঠ করেছি, তা সত্ত্বেও আমার প্রশ্ন রয়েই গেছে। সুতরাং, আপনার দেয়া দলিলসমূহ নিজের ভাষায় বিবৃত করছি আর এর সাথে নিজের প্রশ্নও পেশ করছি।

আপনার যুক্তি হচ্ছে লোকেরা অকাতরে খরচ করলে প্রতিটি জিনিসের চাহিদা বেড়ে যাবে। ফলে যোগানদাতা (producers) নিজেদের উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ, আরো অধিক কর্মচারীর কর্মসংস্থান হবে। শ্রমিকদের অতিরিক্ত আমদানির ফলে জিনিসের চাহিদা আরো বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, জীবিকার স্বচ্ছলতার এমন আবর্তন চলতে থাকবে যে, একদিকে যেমন কর্মচারীদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির আমদানি এবং জীবনের মান উন্নত হতে থাকবে। অপরদিকে মালিক পক্ষের পণ্য বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

এরপরে আপনি বলেছেন, শিল্প কারখানাগুলির জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মুনাফা এবং প্রবৃদ্ধির আমদানির অবশিষ্টাংশ থেকে প্রয়োজনীয় পুঁজি আহরিত হবে।

এখন আমি আমার আপত্তিগুলি পেশ করছি। আমি প্রথমেই একথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, সুদভিত্তিক সঞ্চয় করার ধারাবাহিকতা বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো খটকা নেই। আমার একমাত্র আপত্তি হলো, বেশি বেশি খরচ করার পলিসি সঠিক পলিসি নয়।

আপনার যুক্তি প্রদানের মূলে এই অনুমান কাজ করছে যে, দেশ প্রথম থেকেই শিল্পবাণিজ্যে পুরোপুরি উন্নতি করে ফেলেছে, এখন শুধু বাৎসরিক মূল্যহ্রাস (Depreciation) এবং পুনস্থাপন (Replacement) এর জন্য পুঁজির প্রয়োজন। অপর অনুমানটি হচ্ছে, লোকদের সঞ্চয় করার অভ্যাসের কারণে দেশের বর্তমান শিল্প দক্ষতাও পুরোপুরি ব্যবহার করা হচ্ছেনা।

প্রথম পরিণতিটি আমি গ্রহণ করেছি। আপনি বলেন, মূলত কারখানার আভ্যন্তরীণ মুনাফাই পুঁজির স্বল্পতাকে পূরণ করে দিবে। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব, যখন গোড়া থেকেই কারখানা উন্নত পর্যায়ে এসে যায়। কিন্তু যদি কারখানার অস্তিত্ব আদৌ বর্তমান না থাকে, অথবা থাকলেও প্রাথমিক পর্যায়ের হয় তাহলে সে অবস্থায় আভ্যন্তরীণ পুঁজি অথবা বাইরের যৎসামান্য পুঁজি মিলিয়ে প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানের ষষ্ঠশালা পরিকল্পনাকে সামনে রাখুন। যদিও

আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় এ পরিকল্পনা অতি নগণ্য এবং এতে দেশের প্রয়োজন মেটানোর তুলনায় পুঁজি বৃদ্ধির প্রসঙ্গ সামনে রাখা হয়েছে, কিন্তু তবুও এ পরিকল্পনাকে পূর্ণতা দান করতে গিয়ে কারখানার পুঁজি, দেশের পুঁজি ও বৈদেশিক পুঁজি সবগুলি একত্র করেও প্রয়োজন পূরণ হচ্ছেনা। ফলে সরকার ঘাটতি বাজেট বানাতে বাধ্য হচ্ছে। হিন্দুস্তান (ভারত), ইন্দোনেশিয়া ও জাপানের অবস্থাও একই। উন্নয়নশীল দেশগুলির কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ পুঁজি তার শিল্প কারখানার প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় এ কথা বলা কিভাবে সঠিক হতে পারে যে, কারখানার আভ্যন্তরীণ পুঁজি এবং বাকী সামান্য কিছু বাইরের পুঁজি শিল্পের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট হবে, এরই প্রেক্ষিতে I.B.D.R.I.M.E ইত্যাকার সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় অনুমানটি আমি এইভাবে করেছি, আপনার কথা, বেশি খরচ করলে রোজগার বাড়বে, উৎদানকারীরা অধিক শ্রমিকের উৎপাদন থেকে জীবিকা সংগ্রহ করবে। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন অতিরিক্ত শিল্প শক্তি বর্তমান থাকবে। অতিরিক্ত শক্তি মজুদ না থাকলে, অর্থাৎ কারখানা যদি নিজ উৎপাদন শক্তি থেকে কম উৎপন্ন না করে, অথবা কারখানার অস্তিত্ব আদৌ যদি না থাকে, যেমন অনুন্নত দেশসমূহে সাধারণভাবে হয়ে থাকে, সে অবস্থায় বেশি খরচ করার পরিণতি মুদ্রাস্ফীতি ব্যতীত আর কিছুই হতে পারেনা। অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিন, আমাদের নিজেদের দেশেই এর বিস্তর তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালে লোকেরা দিনরাত কাজ করছিল প্রাচুর্যের কারণে মানুষ খরচও করছিল দেদার, কিন্তু এতে শিল্প কারখানায় নামমাত্র উন্নতিই হয়েছিল। অবশ্য (INFLATION) যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় বেশি খরচ করলে প্রসার ঘটবে, একথা বলা কেমন করে সঠিক হতে পারে? তাহলে একথা বলাই ঠিক হবেনা যে, আপনার অর্থনীতিই পশ্চাতগামী, উন্নয়নশীল নয়? হ্যাঁ, আপনার ব্যবস্থাপত্র উন্নত দেশগুলিতে কার্যকর হতে পারে, অনুন্নত দেশের জন্য নয়।

উপরে বর্ণিত কথাগুলি ছিলো আপনার যুক্তিসমূহের পর্যালোচনা। এখন এর উপর আমার আপত্তি, বেশি খরচ করার পলিসির বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে চাই।

১. সব ধরনের খরচ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপকারী নয়। নিজের অতিরিক্ত মুনাফা কলকারখানায় বিনিয়োগ না করে যদি মূল্যবান বাড়ি, দামী পোশাক, বিলাসবহুল আসবাবপত্র ইত্যাদির পিছনে খরচ করা হয়, তাহলে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের কোনো উপকার হবে না। বরং উল্টো ক্ষতিই হবে। কারণ ঐ সম্পদ শিল্প পুঁজি হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি, বরং ঐ পরিমাণ সম্পদ কারখানার উৎপাদনে বিনিয়োগও হতে পারল না। এভাবে অতোটা মাল বিক্রিও হতে পরল

না। আর এ খরচগুলি হারাম নয় বলে খরচ করার পলিসি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নয়।

২. বেশি খরচ করার পলিসি অনুন্নত দেশগুলির জন্য ক্ষতিকর। এমন দেশে দেশীয় শিল্প নামমাত্রই হয়ে থাকে। এ কারণে খরচের অধিকাংশটাই বিদেশ থেকে আমদানিকৃত জিনিসের উপর ব্যয় হয়, ফলে বৈদেশিক মুদ্রার উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। একেতো এ সব দেশের বৈদেশিক উপকরণ থাকে সীমাবদ্ধ তার উপর অতিরিক্ত ব্যয়কারীদের খরচের চাপ। ফলে কলকব্জা আমদানির জন্য খুব কমই উপায় উপাদান থেকে যায়। সুতরাং বেশি খরচ করার পলিসি দ্বারা শিল্পোন্নতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খরচের চাপ বেশি বেড়ে গেলে ভোগ্য পণ্যের (consumption goods) আমদানি তো আর বন্ধ করে দেয়া যায় না। কারণ, তাতে দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। এ দু'টি অবস্থারই অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে। ফজলুর রহমান সাহেবের O.GL ছিলো প্রথম অবস্থার অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় অবস্থার অভিজ্ঞতা ১৯৫৩ সাল থেকে হয়ে আসছে এবং উভয় প্রকারের অভিজ্ঞতার ফল সবার সামনে আছে।

৩. বেশি বেশি খরচ করার পলিসি এবং দ্রুত শিল্প প্রসার ঘটার ইচ্ছা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী কথা। প্রত্যেক দেশের উপায় উপাদান সীমিতই হয়ে থাকে। এসব উৎপাদন দুই ভাবে ব্যয় করা যায়, ভোগ (Consumption)- এর উপর এবং উৎপাদন (production)-এর উপর। ভোগের চাহিদা (Consumption demand)- কে পূরণ করতে গিয়ে যতোটা বেশি উপায় উপকরণ ব্যয় করা হবে, ততোটাই কম রয়ে যাবে উৎপাদনের চাহিদা (production demand) পূরণ করার জন্য।

এখানে কোনো আলাদীনের জাদুর চেরাগ নেই যে, যখনই যতোটা এবং যে উদ্দেশ্যেই পুঁজি চাওয়া হবে, সাথে সাথে তা যোগাড় হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতের জন্য কোনো চিন্তা করা লাগবে না। এ কথাটি প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। আমি শুধু সাধারণ বোধগম্য একটি উদাহরণ পেশ করাই যথেষ্ট মনে করবো। এখনো ইংল্যান্ডে বাসোপযোগী বাড়ির যথেষ্ট কমতি আছে। এর কারণ, লোকদের বাড়ি বানানোর কাজে অনীহা নয়, বরং উপায় উপকরণের স্বল্পতাই বাড়ি তৈরি করতে অনুমতি দেয় না। লোহা সিমেন্টের জন্য যতোটা সম্পদ খরচ করা হবে, ততোটাই অন্যান্য শিল্পে ব্যয়ের জন্য ঘাটতি পড়বে। এজন্যই "অর্থনীতি কাউন্সিল" প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সকল কর্মচারীর কোটা নির্দিষ্ট করে দেয়, যাতে করে প্রত্যেকে কিছু না কিছু অংশ পেতে পারে এবং কোনো কাজ বন্ধ না হয়ে যায়।

৪. কোনো অনুন্নত দেশ (consumption expenditure) হ্রাস না করে এবং নিজেদের জাতীয় আয়ের একটি বিশেষ অংশ সঞ্চয় না করে উন্নতি করতে পারে

না। বৈদেশিক সাহায্য এবং বৈদেশিক পুঁজি যতো বেশিই হোক না কেনো, তদ্বারা দেশের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়। এসব দেশ (consumption expenditure) যদি হ্রাস না করতে চায় এবং বেশি বেশি সঞ্চয় করতে যদি প্রস্তুত না থাকে, তাহলে তারা শিল্পের উন্নতির শুধু স্বপ্নই দেখতে থাকবে। সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে বহু সময়ের প্রয়োজন এবং এর জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এ দাবির উৎকৃষ্ট প্রমাণ রুশ ও জাপান জাতিদ্বয় পেশ করেছে। যদিও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে তুলনামূলক হারে আকাশ পাতাল ব্যবধান, কিন্তু অর্থনীতিতে উভয় দেশই একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এ দু'টি দেশই আমাদের মতো দুরাবস্থাগ্রস্ত ছিলো। এরা কেউই বৈদেশিক পুঁজি পায়নি এবং এরা উভয়ই দ্রুত গতিতে শিল্পের উন্নতি কামনা করছিল। এ কারণে (consumption expenditure) হ্রাস করে জাতীয় আয়ের একটি বিরাট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে এরা বাঁচিয়ে ঐ অংশ দিয়ে নিজেদের শিল্পসংস্থা গড়ে তুলেছে।

খ. ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

আপনার সুদ গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে ১২১ থেকে ১২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ব্যাংকিং আলোচনার উপর আমার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি। উক্ত পুস্তকের ১২১-১২৩ পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাংকিং-এর ইতিহাস পর্যালোচনার এক পর্যায়ে আপনি স্বর্ণকারদের লেনদেনের কথা বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, তারা পুঁজি বিনিয়োগকারীদের স্বর্ণ ঋণ হিসেবে দিতে লাগলো। তারপর এই স্বর্ণের উপর ঋণ আরো দশগুণ বেশি দিতে থাকলো। আপনি বলেছেন, এইভাবে তারা শতকরা নব্বই ভাগ জাল টাকা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কারেন্সী আকারে বানিয়ে ফেললো, আর কারো ইচ্ছার পরওয়া না করে যুক্তিহীনভাবে তারা এগুলির মালিক বনে গেলো এবং সমাজের মাথার উপর এই কারেন্সীকে ঋণ আকারে চাপিয়ে দিয়ে এর উপর শতকরা দশ বারো টাকা সুদ আদায় করতে লাগলো। এ সকল স্বর্ণকারেরা এই অব্যাহত জালিয়াতী দ্বারা দেশের শতকরা নব্বই ভাগ সম্পদের মালিক হয়ে গিয়েছিল। এ আলোচনার সবটুকুর উপরেই আমি সরাসরি ভিন্নমত পোষণ করি। ব্যাংকিং এর ইতিহাস সম্পর্কিত আপনার বিবৃতির সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। আমার মতভেদ ঐ সব কথায়, যা আপনারই শব্দসমষ্টির আলোকে আমি লিপিবদ্ধ করেছি। আমি একথা বলি যে,

১. ঐগুলি জাল পুঁজি ছিলো না,

২. ব্যাংকারের মালিকানা ছিলো না,

৩. ঐগুলিকে ঋণ আকারে সমাজের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়নি,

৪. ব্যাংক দেশের সম্পদের শতকরা ত্রিশ ভাগেরও মালিক হয়ে যায়নি এবং

৫. ব্যাংকিং প্রথা চালু হওয়ার শুরুতেই টাকা নির্মাণের (টাকশাল) কাজ আরম্ভ হয়নি। বরং এটা দৈনন্দিন ক্রমান্বয়ে সাধিত হয়। এ দাবি প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, যেভাবে আমি বুঝেছি সেইভাবে কথাগুলি তুলে ধরা,

B = O A B C S + 100 +100 - 100 + 100 - 100

এক ব্যক্তি ব্যাংক খুলেছে কিন্তু তার কাছে তার নিজস্ব কোনো পুঁজি নেই। তার কোনো বিনিয়োগকারীও কোনো পুঁজি তাকে দেয়নি। যেহেতু ব্যাংক গড়ে উঠেছে শূন্য থেকে তার (B = O) তার কাছে A এলো এবং ১০০ টাকা কর্জ চাইলো, ব্যাংক তার দরখাস্ত মঞ্জুর করলো ঠিকই, কিন্তু তাকে নগদ কিছু না দিয়ে তার নামে নিজের খাতায় একশত টাকা দিয়েছে বলে জমা লিখে রাখলো (A+100) এখন A বাজারে গিয়ে C-এর কাছ থেকে কিছু মাল খরিদ করলো এবং তাকে ১০০ টাকার চেক দিয়ে দিলো। C চেকটি ব্যাংকে জমা করে দিলো। ব্যাংক A-র খাতায় একশত টাকা বিয়োগ দিয়ে রাখলো (A+00-100 = 0) এবং C এর নামে জমা রাখলো ১০০ (C+100) । বাজারে C থেকে A এর কাছে ১০০ টাকার জিনিস চলে গেলো, এর বদলে ষ্টেট ব্যাংকের একখানা নোটও দান করা হলো না, বরং B-এর খাতায় ১০০ টাকা লিখে দেয়া হলো। ব্যাংকের B-র কাছে পূর্বেও কোনো অংশ ছিলোনা, এখনো কিছু নেই। এখন C মাল খরিদ করলো এবং S কে ১০০ টাকার চেক দিয়ে দিলো। ব্যাংক C-র খাতায় ১০০ টাকা কমিয়ে রাখে এবং S-এর নামে জমা করে দেয়। যাই হোক, এইভাবে ব্যবসার চাকা ঘুরতে থাকে। আপনি লক্ষ্য করছেন যে, ব্যাংকারের নিজের কাছে কিছু ছিলোনা, তা সত্ত্বেও সে একশত টাকা কর্জ দিয়ে দিলো এবং ব্যাংকের ঋণ বাজারের কারেন্সীর নোটের মতোই চলতে লাগলো। এখন ঐ অংক দ্বারা সেরকমই বেচাকেনা হচ্ছে, যেমন করে সাধারণ নোটের দ্বারা হয়ে থাকে এবং ব্যাংক শূন্য থেকে শুরু করে একশত টাকার সুদের মালিক হয়ে যায়। এসব দেখে আপনি চীৎকার করে উঠেন যে, ব্যাংক জালিয়াত। সে নিজেই জাল টাকা বানিয়ে টাকার মালিক হয়ে সমাজের ঘাড়ে ঋণ আকারে চাপিয়ে দিলো। এভাবে দেশের এতো সম্পদ তার কব্জায় চলে গেলো। আমার প্রশ্ন, এ আপত্তি বাস্তবিকই কি সঠিক?

আমি ব্যাংকারের শূন্য পুঁজি থেকে এজন্য শুরু করেছি যে, আপনার দোষারোপের গুরুত্ব পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে বাগিয়ে আসুক এবং টাকা বানানোতে ১ = ১০ এর সম্পর্কের শর্তও যেনো অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। পুরোপুরি টাকার অংক এক ব্যক্তির নাম থেকে অন্য ব্যক্তির নামে দিয়ে দেয়ার মধ্যে আসল উদ্দেশ্য ছিলো হিসাবকে সহজসাধ্য করা।

এখন আমার উদাহরণের অবস্থা হচ্ছে এই যে, ব্যাংকের কাছে এক কানাকড়িও নেই। কিন্তু তবুও ব্যাংক A থেকে একশত টাকা পাচ্ছে, কারণ এ অংকটি সে

ব্যাংক থেকে কর্জ নিয়েছিল। এ অংকের সাথে ব্যাংক সুদও পাবে। এর সংগে আবার ব্যাংকের খাতায় S এর নামে একশত টাকা জমা আছে। অর্থাৎ, ব্যাংক যদি এক দিকে ১০০+সুদ পায়, তো অন্য দিকে সে ১০০ টাকা দেনাও আছে। এখন সম্পূর্ণ কথাটি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে,

১. ব্যাংক যে টাকার অংশ তৈরি করেছিল তা তার নিজের সম্পদ নয়, বরং সেটা হচ্ছে জমাকারী S-এর সম্পদ। ব্যাংক শুধু সুদের অংকের মালিক।

২. সুতরাং ব্যাংক কোনো জাল পুঁজি বানায়নি। সে শুধু সঞ্চয়কারীর সম্পদের অংককে ঋণ হিসেবে কাজে লাগিয়েছে।

৩. ব্যাংক সমাজের সম্পদের শতকরা নব্বই ভাগের মালিক হয়ে বসছে না।

৪. ব্যাংক সমাজের মাথার উপর জবরদস্তি কোনো ঋণ চাপিয়ে দিচ্ছে না। সম্পদ সংরক্ষক যে দিন খুশি এই লেনদেনের আবর্তনকে বন্ধ করে দিতে পারে। A ব্যাংক থেকে তার একশত টাকা নগদ দাবি করে বসলো, ব্যাংক A কে বললো,"আমার প্রদত্ত ঋণ ফেরত দাও। A একশত টাকা সুদসহ ফেরত দিয়ে দিলো ব্যাংক S কে একশত টাকা দিয়ে দিলো এবং সুদের কিছু অংশ নিজে রাখলো এবং কিছুটা S কে দিলো। এখন ব্যাংক পুনরায় শূন্য হয়ে গেলো, সে কারো নিকট পাওনাদার রইলো না, আর তার কাছেও কেউ পাওনাদার থাকলনা।

ব্যাংক জাল টাকা বানাতে পারলে কখনো সে ব্যর্থ হতো না। জাল টাকা বানাতে পারেনা বলেই ব্যাংক ফেল হয়। সঞ্চয়কারীরা নিজেদের টাকা চেয়ে থাকে এবং ব্যাংক নিজের প্রদত্ত কর্জ ঋণ কোনো কোনো সময় তাৎক্ষণিকভাবে ফেরত পায় না। জমাকারীরা নগদ টাকা চাইবামাত্র পাওয়ার দাবি করে বসে, এজন্য জমাকারীর পুরো টাকা ব্যাংক পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে লালবাতি জ্বালিয়ে দেয়।

আপনার লেখায় এটাও মনে হচ্ছিলো যে, আপনার ধারণা ঋণদাতা মহাজনরা নিজেদের উন্নতির প্রথম যুগে এক টাকায় দশ টাকা বানিয়েছে, এখন সে রীতি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু না, প্রকৃতপক্ষে এখনো সে পদ্ধতি চালু আছে। দৈনিকই প্রত্যেক ব্যাংক এক টাকার উপর নির্ভর করে দশ টাকা ঋণ দেয়। পার্থক্য শুধু এই যে, পূর্বে ব্যাংক নিজের নোটের আকারে ঋণ দিতো, এখন চেকরূপে দেয়। কিন্তু নোট ও চেক উভয়ের প্রকৃতি এবং উভয়ের তত্ত্ব (Theory) একই। দু'টিই ব্যাংকের দায়িত্বে আদায় আবশ্যকীয় অংকের প্রমাণ বহন করে। টাকা তৈরি (creation of money) কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে আপনি সম্যক অবগত হওয়ার কারণে তার পুনরাবৃত্তি নিরর্থক। আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে, আমার কম বুঝার কারণে অথবা আপনার লেখার বিশেষ ধরনের কারণে আমার মনে হয়েছে যে, আপনি এ কাজকে ব্যাংকিং ইতিহাসের এক পুরাতন অধ্যায় মনে করেন। আমার এ ধারণা কি ঠিক?

গ. মুদ্রাসৃষ্টি

৩. আমার তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্নটি কোনো অভিযোগ নয়, বরং একটি ফিকহী মসলার ব্যাখ্যা প্রার্থনা। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বাণিজ্য ব্যাংকগুলিতে মুদ্রা গঠনের অনুমতি দেয়া হবে কি হবেনা? একাজের শরঈ দৃষ্টিভংগী কি? এর অনুমতি না থাকলেও বিশ্বাসযোগ্য লেনদেনের মধ্যে স্থিতিশীলতা কি উপায়ে সৃষ্টি করা যাবে?

আশা করি আমার প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক জবাব দান করে আমার মনমগজকে শান্ত করবেন।

জবাব : আপনার প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি, বিস্তারিত আলোচনা করার মতো অবসর নেই, শুধুমাত্র ইশারা ইঙ্গিত দান করাই যথেষ্ট মনে করছি।

আপনার প্রথম প্রশ্ন দুটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এক, 'খরচ কর' এর প্রচারের ফল এই হবে যে, লোকেরা বেপরওয়াভাবে খরচ করতে শুরু করে দেবে এবং টাকা বাঁচানো বা কাজে লাগানোর সমস্ত প্রবণতাই শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়, 'খরচ করা'র অর্থ বুঝা হয় নিজের প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করা এবং প্রয়োজন শেষে বিলাসব্যসনের খরচ করা, অথচ এ দুটোর কোনোটাই সত্য নয়। খরচ করার প্রবণতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। এ সময়ের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য চেষ্টা চালু থাকলে তার জন্য টাকা পাওয়া যেতে থাকবে এবং এ দুটোর ভারসাম্যপূর্ণ পরিচর্যার কারণে শিল্পকারখানা বাড়তে থাকবে। সাথে সাথে এগুলির উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধি পেয়ে বাজারের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। এর ফলে কারখানাগুলির জন্য আরো বেশি উন্নতির উপাদানের ব্যবস্থা হতে থাকবে। তারপর খরচ করার দ্বারা আমি শুধু ব্যক্তিগত কাজে খরচ করাকেই বুঝাইনি বরং আল্লাহর পথে খরচ করাকেও বুঝিয়েছি। এ কারণেই টাকার একটি বড় অংশ ঐ শ্রেণীর মধ্যে ব্যয়িত হবে, যাদের বর্তমান ক্রয় ক্ষমতা সীমিত ও দুর্বল। পরে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে থাকবে। এর ফলে সর্বপ্রকার শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে। আমার সে দুটি বিশ্লেষণের সমর্থনে একথা নীতিগত ও মৌলিক ধারণা হিসেবে কাজ করেছে যে, দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা যেমন দক্ষ ও দূরদর্শী লোকদের হাতে থাকতে হবে, যারা এক দিকে জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র সংশোধন করবে, সুস্থ মন মানসিকতা গড়ে তুলবে, অপর দিকে, দেশের অভ্যন্তরীণ সম্ভাব্য উপকরণগুলি সতর্কতার সাথে কাজে লাগাতে থাকবে।

ব্যাংকিং সম্পর্কে আমি যা লিখেছি, তার মধ্যে প্রথমে নতুন ব্যাংক কিভাবে শুরু করা হবে সে বিষয়ে আলোচনা এসেছে। তারপর বলা হয়েছে, ধীরে ধীরে জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতার দরুন এখন এ কারবার কিভাবে এগিয়ে চলেছে।

এতে আমার দৃষ্টিতে স্বয়ং ব্যাংকিং এর উপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা উদ্দেশ্য ছিলো না। কিন্তু মূলত আমি চেয়েছিলাম সে সিস্টেমের ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলি নির্দেশ করে সেগুলি দূর করতে এবং তাকে আসল প্রয়োজন পূরণে ব্যবহার করতে, যার জন্য একটি ব্যাংকিং সিস্টেম প্রয়োজন ছিলো। এজন্য আমি বিস্তারিত কোনো আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনি। আপনি প্রশ্ন উত্থাপন করার সময় খেয়াল করেননি যে, আমি ব্যাংকিং এর সূচনা ও উন্নতিকে তিনটি স্তরে বর্ণনা করেছি। আর আপনি সমগ্র আলোচনাকে একই স্তরের বানিয়ে দিয়ে প্রাথমিক যুগের সাথে সম্পৃক্ত কথাগুলিকে বর্তমান অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বুঝে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বর্তমান অবস্থাকেও আপনি নিছক একটি কাল্পনিক ব্যবস্থা হিসেবে পেশ করেছেন। অথচ আমি 'তৃতীয়' স্তরের শিরোনামায় যে আলোচনা করেছি সেটা ব্যাংকের ঐ কর্মপদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত, যার উপর এখন কাজ চলছে। আপনার কাছে উক্ত বইটি থেকে থাকলে সমস্ত আলোচনাটিকে সেইভাবে ভাগ ভাগ করে পড়ুন, যেভাবে আমি শিরোনামা দাঁড় করিয়ে সে অনুসারে আলোচনা রেখেছি। তারপরই আপনি অনুভব করতে পারবেন যে, আপনার প্রশ্ন দ্বিতীয়বার উত্থাপিত হবে না। আপনার এ ধারণাও ঠিক নয় যে, মুদ্রা তৈরি (Creation of money) কে আমি ইতিহাসের একটি পুরাতন অধ্যায় মনে করছি। আমি জানি যে, এ কাজ এখনো চালু আছে। কিন্তু তৃতীয় স্তরের আলোচনায় আমি এজন্যই তার উল্লেখ করিনি যে, যে দাবির উপর আমার এসব আলোচনা, তার সাথে এর সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। আমি উপরের আলোচনায় ইংগিত দিয়েছি যে, আমার আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যাংকিং এর উপর বিষয়ভিত্তিক কথা বলা নয়, বরং ইসলামের আলোকে তার ত্রুটিগুলি তুলে ধরে সংশোধনের কাঠামো পেশ করাই উদ্দেশ্য।

আপনার শেষ প্রশ্নটির জবাব হচ্ছে, মুদ্রা নির্মাণের পিছনে সুদ ও ধোঁকাবাজি না থাকলে তা হারাম হওয়ার কোনো কারণ নেই। এখন এটা দেখা আপনাদের (অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের) কাজ যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মুদ্রা নির্মাণের ত্রুটিমুক্ত একটি সুস্থ পদ্ধতি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। *(তরজমানুল কুরআন, শাবান রমজান, ১৩৭৬ হি., জুন ১৯৫৭ খৃ.)*

প্রেফারেন্স শেয়ার

প্রশ্ন আমি একটি টেক্সটাইল মিলের শেয়ার হোল্ডার। প্রতি বছরই পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় একই হারে লভ্যাংশ এসেছে। এবছর আমি উক্ত মিলের অফিস থেকে জানতে চাইলাম প্রত্যেক বছর লভ্যাংশ একই অংকে সীমাবদ্ধ থাকার কারণ কি? জবাব এলো, আপনার শেয়ারগুলো প্রেফারেন্স শেয়ার। বস্তুত, প্রেফারেন্স শেয়ারে ক্ষতির কোনো আশংকা নেই। এতে আপনি সর্বদা একই হারে নির্দিষ্ট মুনাফা পেতে থাকবেন। আমার মতে এ মুনাফা নির্জলা সুদ। মেহেরবানী করে এ

বিষয়ে আপনার মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন। যাতে সুদ হলে আমার অংশ বিক্রি করে দিয়ে জান বাঁচাতে পারি।

জবাব : এ ধরনের শেয়ার নিঃসন্দেহে সুদের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। আপনি হয় এ শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিন, নয় ঐধরনের অংশের দ্বারা বদলে নিন, যার মধ্যে নির্দিষ্ট মুনাফার পরিবর্তে মুনাফার হার কমবেশি হয়। *(তরজমানুল কুরআন, রজব ১৩৭৫ হি., মার্চ ১৯৫৬ খৃ.)*

অমুসলিম দেশ থেকে বাণিজ্যিক ও শিল্পঋণ গ্রহণ

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে যখন এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে উন্নতি করতে পারে না, তখন কোনো ইসলামি রাষ্ট্র বিদেশের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক, সামরিক বাহিনীর জন্য টেকনিক্যাল সাহায্য সামগ্রী অথবা আন্তর্জাতিক ব্যাংক থেকে সুদের হারে ঋণ গ্রহণ করাকে কি একেবারেই হারাম সাব্যস্ত করবে। তা ছাড়াও বস্তুগত, শিল্প, কৃষি ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য উন্নত (Advanced) দেশসমূহ এবং মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে ইসলামি দেশগুলির মধ্যে, অথবা এই আনবিক যুগে Haves এবং Haves not দের মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে তা কি করে দূর করা যাবে?

অধিকন্তু দেশের অভ্যন্তরেও কি সমস্ত ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্স (ব্যাংক ও বীমা) ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেয়ার হুকুম দেওয়া হবে? সুদ, সেলামী, মুনাফা, লাভ, সুনাম (Goodwill) এবং বেচাকেনার দালালী ও কমিশনের জন্য ইজতিহাদ করে কোনো পথ বের করা যেতে পারে? ইসলামি দেশগুলি সুদ, মুনাফা, লাভ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে কোনো অবস্থায় ঋণের আদান প্রদান করতে পারে কি?

জবাবঃ কোনো সময়ই ইসলামি দেশগুলি অমুসলিম দেশের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদের পলিসি গ্রহণ করেনি, আজও করবে না। কিন্তু ঋণের অর্থ ঋণ চেয়ে বেড়ানো নয়, তাও আবার তাদের প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে। এধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে আজকের যুগের হীনমনা লোকেরাই। কোনো দেশে ইসলামি সরকার কায়েম থাকলে বস্তুগত উন্নতির পূর্বে সে সরকার নিজ জাতির নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের চেষ্টা করবে। নৈতিক অবস্থার সংশোধন বলতে বুঝায়, দেশের শাসক, শাসনতন্ত্র পরিচালনার কর্মচারীবৃন্দ এবং জনগণ ঈমানদার (বিশ্বস্ত) হবে। অধিকার আদায়ের কথা চিন্তা করার পূর্বে নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে ব্রতী ও সচেতন হতে হবে এবং সবার সামনে একটি উন্নত মহান লক্ষ্য থাকবে যার জন্য জান মাল, সময় শ্রম এবং যোগ্যতা সবকিছু কুরবানী করার জন্য তারা তৈরি থাকবে। উপরন্তু, শাসকবর্গ জনগণের উপর এবং গোটা জাতি শাসকবর্গের উপর আস্থাশীল থাকবে এবং তারা বুঝবে যে, তাদের শাসকরা তাদেরই কল্যাণের জন্য

কাজ করছেন। এ অবস্থা একবার পয়দা হয়ে গেলে কোনো জাতির পক্ষে বিদেশ থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের অবস্থাই সৃষ্টি হতে পারে না। দেশের মধ্যে ধার্যকৃত ট্যাক্সের শতকরা একশত ভাগই আদায় হবে এবং তার পুরোটাই জাতির উন্নতির কাজে ব্যয়িত হবে, আদায় করার সময়ও কোনো অসততা হবে না এবং ব্যয় করার সময়ও অন্য পথে ব্যয় হবে না। এর পরও ঋণের প্রয়োজন হলে গোটা জাতি পুঁজির এক বড় অংশ স্বেচ্ছায় চাঁদা আকারে, একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সুদবিহীন ঋণ আকারে এবং এক অংশ লাভক্ষতির ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব গ্রহণ আকারে যোগাড় করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। আমার অনুমান, পাকিস্তানে যদি ইসলামি মূলনীতির ভিত্তিতে লেনদেনের অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়, তাহলে সম্ভবত খুব শীঘ্রই পাকিস্তান অন্যদের থেকে ঋণ গ্রহণ করার পরিবর্তে ঋণ দানের যোগ্যতা অর্জন করবে।

ধরে নেয়া যাক, কোনো অবস্থায় সুদের শর্তে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ যদি অপরিহার্যই হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করা যদি একান্তই দরকার হয়ে পড়ে এবং এর জন্য দেশের মধ্যে থেকে কোনো পুঁজির ব্যবস্থাও না হয়, তাহলে সে অবস্থায় বিদেশ থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তবু দেশের অভ্যন্তরে সুদের লেনদেন জায়েয হওয়ার কোনো পথ নেই। দেশের মধ্যে সুদের লেনদেন বন্ধ করা যেতে পারে এবং পুরো আর্থিক ব্যবস্থা (Financial system) সুদ ছাড়া চালানো যায়। আমার প্রণীত 'সুদ' বইটিতে আমি এটা প্রমাণ করেছি যে, ব্যাংক ব্যবস্থা সুদ ব্যতীত লভ্যাংশের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেও চালানো যেতে পারে। একইভাবে বীমা ব্যবস্থায়ও এমন সংস্কার করা যেতে পারে, যার দ্বারা অনৈসলামী ব্যবস্থা গ্রহণ না করেও বীমার সমস্ত উপকার হাসিল করা যেতে পারে। দালালী, মুনাফা, সেলামী, কমিশন অথবা সুনাম (Goodwill) ইত্যাদির পৃথক পৃথক শরঈ মর্যদা রয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্র বাস্তবায়িত হলে তখন অবস্থা পর্যালোচনা করে, হয় সাবেক অবস্থাকে বহাল রাখা হবে, অথবা জরুরি সংশোধন করা হবে। *(তরজমানুল কুরআন, খণ্ড ৫৭, সংখ্যা ২, নভেম্বর ১৯৬১ খৃ.)*

রাজনৈতিক প্রশ্ন

রাজনৈতিক বিপ্লব আগে না সমাজ বিপ্লব আগে?

প্রশ্ন : আমাদের দেশে সাধারণভাবে এ অনুভূতি বিরাজিত যে, ইসলামের মূলনীতি এবং নির্দেশাবলী পছন্দনীয় ও উত্তম বটে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা কার্যকর করার মতো পরিবেশ নাই। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ইসলামের সাথে আবেগময় সম্পর্ক আছে ঠিকই, কিন্তু দীন ইসলামের সঠিক বুঝ এবং আমল করার ইচ্ছা অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম চিন্তা ও চরিত্রের যে সম্পর্ক দাবি করে তার আলোকে এ আশংকা সৃষ্টি হয় যে, ইসলামি আইন কানুন চালু হয়ে গেলে এর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। তাই সময়ের এহেন প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে সামাজিক বিপ্লব জরুরি এবং সংশোধনের চেতনা বাহির ও উপর থেকে সৃষ্টি করার পরিবর্তে ভিতর থেকে সৃষ্টি করা জরুরি। এহেন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি অসময়োপযোগী হয়ে যায় নাতো?

জবাব : এ সমস্যাকে পুরোপুরি এবং স্পষ্ট করে আলোচনা করতে গেলে এর বিস্তারিত জবাব দেয়া দরকার। তবুও সংক্ষিপ্ত জবাব হলো: নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে একটি তামাদ্দুনিক, সামাজিক এবং নৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজন। ইসলামি বিপ্লবের এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি। আর নিঃসন্দেহে এটাও সত্য যে, ইসলামের নির্দেশাবলী এবং আইন কানুন শুধু উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয় না, বরং তা পালন ও অনুসরণ করার জন্য ভিতর থেকে একটি আন্তরিক আগ্রহও সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক সে বিপ্লব সধিত হয়েছে। এখন এ প্রশ্ন তোলা অবান্তর ও অর্থহীন যে, সর্বপ্রথম সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করা দরকার, তারপর রাজনৈতিক বিপ্লব। এখন বরং এ প্রশ্নই উঠতে পারে যে, যতোদিন পর্যন্ত গোটা জাতির মধ্যে চিন্তা ও চরিত্রের বিপ্লব সৃষ্টি না হচ্ছে ততোদিন আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুফরী নীতির ভিত্তিতে ব্যবহার করবো, নাকি ইসলামি মূলনীতির ভিত্তিতে কাজে লাগাবো? রাজনৈতিক ক্ষমতায় কোনো না কোনো ব্যবহার ক্ষেত্র যে কোনোভাবেই হোক আমাদেরকে স্থির করতেই হবে। যাই হোক, নৈতিক বিপ্লব সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিকল করা যেতে পারে না। যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উপর বিশ্বাসী, যার সামষ্টিক ও জাতীয় জীবনের লাগাম নিজের নিয়ন্ত্রণে, নিজের জীবন ব্যবস্থা নিজেই

নির্মাণ করতে সক্ষম এবং অনৈসলামী কোনো শক্তি তার উপর কুফরী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার মতোও না থাকে, সে জাতির লোকদের জন্য এটা কি করে জায়েয এবং বৈধ হতে পারে যে, তারা একে অপরকে নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার জন্য শুধু ওয়াজ নসীহত করতে থাকবে আর নিজেদের শাসন কাঠামো অনৈসলামী নীতিতে চালানোর জন্য ছাড় দিয়ে দেবে। আমি মনে করি আমরা যদি এ অবস্থা সহ্য করে যাই, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে মুর্তাদ হওয়ার অপরাধে অপরাধী না হলেও সমষ্টিগত ও জাতীয়ভাবে মুর্তাদ আমাদের হওয়াই লাগবে।

তারপর এ বিষয়ের আরো একটি দিক হলো আপনি সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে চাইলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে এ বিপ্লবের মাধ্যম ও উপায় উপাদান কি হতে পারে? এটা পরিষ্কার যে, শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ সংস্কার, নৈতিক সংশোধন এবং এই ধরনের আরো বহু বিষয় ঐসব উপায় উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির সাথে আরো রয়েছে রাষ্ট্রের আইনগত ও রাজনৈতিক মাধ্যম ও উপায় উপকরণ। সংশোধনের জন্য রাষ্ট্রশক্তি শুধু একটি বড় মাধ্যমই নয়, বরং এটা সমগ্র সংস্কারমূলক ব্যবস্থা ও চেষ্টাকে আরো অধিক প্রভাবশালী, ফলদায়ক এবং ব্যাপকরূপ দেয়ার বলিষ্ঠ উপায়ও। এখন নৈতিক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উপায় উপকরণও ব্যবহার না করার কারণ কি হতে পারে। আমাদের ভোট, আমাদের দেয় ট্যাক্স এবং অর্থের উপর ভিত্তি করেই তো রাষ্ট্রের সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এখন এ মূর্খতা ও বোকামি আমরা কেন করতে যাবো যে, একদিকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের সমাজ বিপ্লবের পর প্রশস্ত করার চেষ্টা করতে থাকবো, অপরদিকে রাষ্ট্রের সমস্ত মাধ্যম ও উপায় উপকরণ জাতির নৈতিক চরিত্র ধ্বংস ও সর্বনাশের মূলে ইন্ধন যোগাবে, অধিকন্তু নানা প্রকার নৈতিক অপরাধ ছড়ানোর কাজে লেগে থাকবে। (অথচ এগুলি দূর করার কোনো বাস্তব পদক্ষেপই আমরা গ্রহণ করবো না)? *(তরজমানুল কুরআন, জিলহজ্জ ১৩৭৩ হি., সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ খৃ.)*

হাত কাটার শাস্তি

প্রশ্ন : ইসলামে চুরির শাস্তি হাত কেটে দেয়া। আজকাল প্রতিদিন শত শত চুরি হচ্ছে। তাহলে কি প্রতিদিন শত শত হাত কাটা যাবে? বাহ্যত এ শাস্তি কঠোর ও অবাস্তব মনে হচ্ছে।

জবাব : হাত কাটা ও ইসলামের ফৌজদারী আইন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে গেলে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। এ বিষয়টি সম্পর্কে আমার 'ইসলামি আইন' গ্রন্থে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমি কেবল এতোটুকু বলতে চাই, চোরের হাত কাটার পদ্ধতি জারি হবার পর ইনশাআল্লাহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে আর শত শত

হাত কাটার প্রশ্ন দেখা দেবে না। একজন চোর আশা করে, সে দশ হাজার টাকা চুরি করে ধরা পড়লে কিছুদিন সরকারি রুটি খাবার পর আবার ফিরে আসবে। এবং সে সময়ও তার কাছে যথেষ্ট পুঁজি হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য এ ধরনের লোক জেল থেকে বের হয়ে আসার পর প্রথম সুযোগে আবার চুরি করবে। আমাদের দেশে এ ধরনের দাগী অপরাধীদের সংখ্যা অনেক বেশি। এদেরকে অপরাধ থেকে বিরত রাখাও এখন কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু চোর যদি জানতে পারে, একবার চুরি করে ধরা পড়ার পর একটি হাত কাটা যাবে এবং দ্বিতীয়বার চুরি করে ধরা পড়লে দ্বিতীয় হাতটি কাটা যাবে, তাহলে সে সহজে চুরি করতে উদ্যত হবে না। তারপর যে চোরের হাত একবার কাটা যাবে সে যেখানেই যাবে তার এই কর্তিত হাত চিৎকার করে তার হাত কাটার কাহিনী সর্বত্র বলে বেড়াতে থাকবে। ফলে সে ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে না। বর্তমান অবস্থায় তো পেশাদার চোর ও ডাকাতরা সভ্য নাগরিকদের বেশে চারদিকে শিকারের তালাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ তাদের চিনতে পারে না। আমার চূড়ান্ত মত হচ্ছে, চুরি বন্ধ করার জন্য এ আইনটির প্রবর্তন অপরিহার্য। আধুনিক সভ্যতার নানান দোষের মধ্যে একটি দোষ হচ্ছে এই যে, তার সমস্ত সহানুভূতি দেখা যায় অপরাধীর জন্য, কিন্তু যে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধীরা তৎপর থাকে, তার ব্যাপারে আধুনিক সভ্যতার কোনো সহানুভূতি দেখা যায় না। চোরের হাত কাটা যাবে, কেবল একথা শুনেই এ সভ্যতার বরপুত্রদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়, কিন্তু মারাত্মক ধরনের অপরাধসমূহ সমাজদেহে দিনের পর দিন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে এ খবর শুনেও তারা কানে তালা দিয়ে থাকে।

সর্বশেষে আমি এ কথাও বলে দিতে চাই, ইসলাম কেবল চোরের হাতই কাটে না, একই সঙ্গে যাকাত ও সাদকার বিশাল ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছে। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনও পূর্ণ করে। সে দেশের নাগরিকদের নৈতিক শিক্ষা ও অনুশীলনেরও ব্যবস্থা করে। লোকদের হালাল ও বৈধ পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করারও শিক্ষা দেয়। এর পরও এক ব্যক্তির হালাল উপার্জনকে যদি কেউ হারাম পথে চুরি করে তাহলেই তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হয়। *(তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫৪)*

ইসলামি রাষ্ট্রে রসূলের সা. নিন্দাকারী যিম্মীর মর্যাদা

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে আমি আপনার রচিত 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' বইখানি অধ্যয়ন করেছি। 'ইসলামে সন্ধি ও যুদ্ধ নীতি' অধ্যায়ে ২৪০ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট (৬)-এ আপনি লিখেছেন, যিম্মী যে ধরনের অপরাধই করুক না কেন তার যিম্মা (নিরাপত্তার অধিকার) নষ্ট হয় না, এমনকি জিযিয়া কর প্রদান বন্ধ করে দেয়া, কোনো মুসলমানকে হত্যা করা, নবী সা. শানে বেয়াদবী করা অথবা কোনো

মুসলমান মহিলার শ্লীলতাহানি করা ইত্যকার কাজগুলোও তার 'যিম্মা' তথা 'নিরাপত্তা' ভংগকারী' হবে না। অবশ্য, দু'টি অবস্থা এমন যার কারণে 'যিম্মীর সাথে কৃত চুক্তি অবশিষ্টই থাকে না। এক, সে দারুল ইসলাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে যদি দুশমনদের সাথে যোগ দেয়। দুই, যদি ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করে।

এ বিষয়ে আমি অধম ভিন্নমত পোষণ করি এবং মনে করি আপনার এ মত কুরআন হাদিস সমর্থিত নয়। এ বিষয়ে আমার গবেষণার আলোকে বুঝতে পেরেছি যে, নবী সা. শানে বেয়াদবী এবং আপনার বর্ণিত অপরাধসমূহ দ্বারা যিম্মীর চুক্তি ভেঙ্গে যায়। নিজের সমর্থনে আপনি 'ফাৎহুল কাদীর' ৪র্থ খণ্ড এবং 'বাদায়ে' ১১৩ পৃষ্ঠার বরাত দিয়েছেন। অপর দিকে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া 'আস্সারেমুল মাসউল আলা শাতিমির রসূল' নামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা এ বিষয়ের উপর লিখেছেন। জাদুল মাআদ, তারীখুল খুলাফা, আওনুল মাবুদ, নাইলুল আওতারের মতো গ্রন্থরাজিতে প্রথম যুগের আলেমদের দলিল আপনার মতের বিপরীত। এখানে একটি হাদিসের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيْهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَبَطَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا

হযরত আলী রা. কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন জনৈক ইহুদী স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহকে সা. গালিগালাজ করতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটনা করতো। এক ব্যক্তি তার গলা এমনভাবে টিপে ধরলো যে, সে মরে গেলো। নবী সা. তার রক্তের বদলা পরিশোধ করা হবে না বলে ঘোষণা দিলেন। *(আবু দাউদ, মিশকাত বাবু ক্বাতাল আহলির রাদ্দাতি ওয়াল আফসাদ, ৩০৮ পৃ.)*

প্রসংগক্রমে আরো জানাচ্ছি যে, এখানকার স্থানীয় জনৈক আহলে হাদিস মতাবলম্বী আলেম আপনার এ অভিমতের বিরুদ্ধে 'মওলানা মওদূদীর একটি ভুল' নামে নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন এবং তার মধ্যে বেশ করেকটি হাদিস ও কিছু ওলামার ফতোয়া সংযোজন করেছেন।

জবাব : এ বিষয়টি বিতর্কিত। এ বিষয়ে আপনি অথবা অন্যান্যরা যে মত ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন এবং যুক্তি প্রমাণও পেশ করতে পারেন। অপর দিকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলেম আছেন এবং তাঁদের নিকটও যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণ রয়েছে। কর না দেয়া, নবী সা. কে গালি দেয়া বা কোনো মুসলিম মহিলার শ্লীলতা হানি করার আইনানুগ অপরাধে সাজা দেয়া হবে কিনা এ বিষয়ে মূলত কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ বরং এ ব্যাপারে যে, এ অপরাধগুলি প্রচলিত আইন বিরোধী, নাকি রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র বিরোধী? এক ধরনের অপরাধ হলো যা করে

কোনো নাগরিক কেবল ব্যক্তিগতভাবে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। আর এক ধরনের অপরাধ হলো যার কারণে কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্বই খতম হয়ে যায়। হানাফীরা যিম্মীদের এসব অপরাধকে প্রথম ধরনের অপরাধের মধ্যে গণ্য করেন। আবার কোনো কোনো আলেমের নিকট এসব অপরাধ দ্বিতীয় পর্যায়ের। এটা এক শাসনতান্ত্রিক আলোচনা, যার জন্য দু'পক্ষের নিকটেই যথেষ্ট দলিল প্রমাণ রয়েছে। এতে কারো অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয়। প্রবন্ধ লেখক এ ব্যাপারে শুধু আমার কথাকে ভুল সাব্যস্ত করে আসলে ইনসাফ করেননি। এটা ভুল হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের আরো অনেকে এ ভুল করেছেন। আমার দোষ শুধু এই যে, কোনো মসলা মাসায়েলের ব্যাপারে হানাফীদের সমর্থন করি তাতে আহলে হাদিসরা অসন্তুষ্ট হন। আবার কোনো ব্যাপারে আহলে হাদিসদের সমর্থন করি, তাতে হানাফীরা পিছনে লেগে যান। *(তরজমানুল কুরআন, যিলকাদা ১৩৭৪, জুলাই ১৯৫৫ খৃ.)*

ইসলামি গণতন্ত্র এবং সরকারি কর্মচারীদের অবস্থা

প্রশ্ন ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসের তরজমানুল কুরআনের 'ইশারাত' শিরোনামের অধীনে আপনি যে মত পেশ করেছেন তার অংশবিশেষ সম্পর্কে আমি ভিন্নমত পোষণ করি। আমার সন্দেহগুলি নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. গণতন্ত্রকে আপনি কুরআন ও সুন্নাহর লক্ষ্য হিসেবে পেশ করেছেন। আপনি ভালো করেই জানেন যে, আমাদের যুগে গণতন্ত্র এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে যার ভিত্তি রচিত হয়েছে জনগণের নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর, আর এটাকে আমরা কুরআন ও হাদিসের লক্ষ্য হিসেবে কিছুতেই মেনে নিতে পরি না। আপনি গণতন্ত্র শব্দটিকে তার সাধারণ প্রচলিত অর্থ থেকে সরিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। আপনি নিজেই ইসলামি শাসন পদ্ধতি বুঝাতে গিয়ে 'দি ডেমোক্রেসি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এখন সে পরিভাষা পরিত্যাগ করে পুনরায় ডেমোক্রেসির দিকে ফিরে এলেন কেন?

২. আপনার ধারণা অনুসারে সরকারি কর্মচারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়– কথাটা মূলত অস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত। আপনিও কি রাজনীতিক ও ধর্মের কৃত্রিম বিভক্তি স্বীকার করেন?

৩. ইসলামি শিক্ষা অনুসারে আপনার একথাও সঠিক নয় যে, সরকারি কর্মচারীরা অধিকাংশ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত যে কোনো সরকারের আনুগত্য করবে, জনগণ আইনত যাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেছে। সরকারি কর্মচারী বা সাধারণ নাগরিক যেই হোক না কেন একজন মুসলমানের পক্ষে তারই আনুগত্য করা জরুরি, যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদিসের অনুসারী। মুসলমানদের আনুগত্য লাভ করার জন্য আইনত ক্ষমতার মসনদে বসে যাওয়াই যথেষ্ট হতে পারে না।

জবাব : আমার লেখনি ও বক্তৃতা বিবৃতিসমূহে বারবার আমি ভালোভাবে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, ইসলামে গণতন্ত্রের মূল প্রাণশক্তি অবশ্যই আছে। কিন্তু ইসলামি গণতন্ত্রের ধ্যান ধারণা এবং পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধ্যান ধারণার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম জনগণের নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না, বরং একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীন খেলাফত স্বীকার করে। জনগণের এই প্রতিনিধিত্ব যেহেতু কোনো ব্যক্তি, বংশ অথবা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সামগ্রিকভাবে গোটা জাতির হাতে আবর্তিত হয় এবং তারাই যাকে ইচ্ছা এ ক্ষমতা ব্যবহারের পাত্র হিসেবে নির্বাচন করে। এজন্য স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র থেকে পৃথক করার জন্য ইসলামের শাসন পদ্ধতিকে গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি বলা যেতে পারে। এটাই ইসলামের বিশেষ গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা। সারা দুনিয়ায় যে একই ধরনের গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা পরিচিত এবং চালু আছে এ দাবিও সঠিক নয়। পাশ্চাত্য জগতেও গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের ধারণা আছে। যেমন পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ইত্যাদি। এগুলোর মুকাবিলায় ইসলামের শাসন পদ্ধতিকে ইসলামি গণতন্ত্র আখ্যা দেয়া যায়। এহেন ইসলামি গণতন্ত্রকেই আমি 'দি ডেমোক্রেসি' আখ্যা দিয়েছি। এ পরিভাষা দ্বারা গণতন্ত্রেরই একটি ধরনকে বুঝানো হয়েছে যার ভিত্তি ইসলামের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সরকারি কর্মচারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের যে বিরোধিতা আমি করেছি তার কারণ এবং যুক্তিগুলিও আমি তুলে ধরেছি। আপনি সে যুক্তিগুলি পরখ করার কষ্ট স্বীকার করেননি এবং এমন দিকগুলো সম্পর্কে আপত্তি তুলতে শুরু করেছেন মূল বিষয়ের সাথে যার সম্পর্ক নেই। সরকারি কর্মচারীদের একটি অবস্থা ব্যক্তিগত পর্যায়ের এবং অন্য আর একটি অবস্থা রয়েছে কর্মচারী হিসেবে। ব্যক্তিগতভাবে নাগরিক হিসেবে একজন লোক রাজনীতি থেকে পৃথক থাকবে একথা কেউ বলে না। এ কারণেই যে কোনো সাধারণ নাগরিকের ন্যায় তারাও ভোট প্রয়োগের আইনসিদ্ধ অধিকারী। কিন্তু সরকারি কর্মচারী হিসেবে তাদের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে হস্তক্ষেপ করা, সরকারি ব্যবস্থাপনার যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাদের উপর ন্যস্ত রয়েছে সেটাকে দেশে বিরাজিত রাজনৈতিক নানা মতবাদ এবং বিভিন্ন দলের মধ্য থেকে কারো পক্ষে আবার কারো বিপক্ষে ব্যবহার করা নীতিগতভাবে সিদ্ধ হতে পারে না। এটা কার্যত দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকরও। পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং সিভিল সেক্রেটারিয়েটের লোকেরা দলবদ্ধভাবে কোনো মতবাদ গড়ে তুলুক এবং তারাই দেশের উপর অধিকার বিস্তার করে নিজ মতবাদ জবরদস্তি চালু করে দেয়ার সিদ্ধান্তনিক এবং তাদের মতবিরোধী কোনো দল ক্ষমতাসীন হলে তাদের শাসন ক্ষমতাকে বিকল করে দিক, এটাকে আপনি সঠিক মনে করতে সম্মত হবেন কি?

এটা ঠিক যে, একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় একজন সরকারি কর্মচারীর সেই সরকারের আনুগত্য করাই কর্তব্য, যে সরকার কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী। কিন্তু যে সরকার কুরআন ও সুন্নাহর পাবন্দ নয় তার অধীনে চাকরি তো করা যাবে, কিন্তু আনুগত্য করা হবে না, এটাও কি যুক্তিসঙ্গত? আমি যে পূর্বাপর অবস্থাকে সামনে রেখে একথা বলেছিলাম তা হচ্ছে এই যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা প্রদান করবে কর্মচারীদের উচিত তার আনুগত্য করা। সে সময়ে গণতান্ত্রিক মূলনীতি বলে দেয়ার সাথে সাথে আমি ইসলামের মূলনীতিসমূহও তুলে ধরেছিলাম। আমার কথাগুলোকে উক্ত অবস্থার সাথে সম্পর্কিত রেখেই বুঝা দরকার ছিলো। কিন্তু আপনি সে অবস্থা বাদ দিয়ে চিন্তা করলেও আমার কথা হলো, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা যদি এমন লোকদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে দেয়, যারা কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরে আছে, এমতাবস্থায় একজন দীনদার সরকারি কর্মচারীকে আমি পরামর্শ দেবো এ পরিস্থিতিতে তার চাকুরি ছেড়ে দেয়া উচিত। তবুও চাকরি করবে অথচ কর্তৃপক্ষের আনুগত্য এড়িয়ে যাবে, এহেন দ্বৈত নীতি সমর্থনযোগ্য এবং যুক্তিসঙ্গত হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। *(তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উখরা ১৩৭৫ হি., ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ খৃ.)*

ইসলামি জিহাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত একটি সন্দেহ

প্রশ্ন : 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' শিরোনামে আপনার একটি প্রবন্ধ তাফহীমাতের প্রথম খণ্ডে এবং 'জিহাদের হাকিকত' নামক গ্রন্থদ্বয়ে ছাপা হয়েছে। এ প্রবন্ধের এক স্থানে আপনি নিম্নলিখিত কথাগুলিও লিখেছেন :

"কোনো মুসলিম দলের পক্ষে জরুরি হলো, তারা কোনো একটি ভূখণ্ডে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করাকেই যথেষ্ট মনে করবে না, বরং যতোদূর তাদের শক্তিতে কুলায় সে ব্যবস্থাকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে যাবে। রসূলুল্লাহ সা. এবং তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশেদীন এই নীতি অবলম্বন করেছেন। মুসলিম পার্টি গঠিত হয়েছে যে আরব দেশে, সেদেশকেই সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনাধীনে আনা হলো। এরপর রসূলুল্লাহ সা. আশেপাশের দেশগুলিকে নিজ মত ও পথের দিকে আহ্বান জানান। কিন্তু দাওয়াত কবুল করা হচ্ছে কি হচ্ছে না এর পরওয়া না করে শক্তি সঞ্চয় করার সাথে সাথে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই শুরু করেছিলেন।"

উপরের কথাগুলি সম্পর্কে কতিপয় লোকের আপত্তি হলো, এ শিক্ষা ইসলাম ও ইসলামি ইতিহাসের সঠিক প্রতিনিধিত্ব এবং তাতে 'ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রসার লাভ করেছে, এ অপবাদ শক্তিশালী হয়ে উঠে। ঐ কথাগুলি দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন এবং তার সপক্ষে কি কি যুক্তি আছে তরজমানুল কুরআনে আপনি এর ব্যাখ্যা দান করুন।

জবাব : সে উক্তি দ্বারা আমি একটি ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরেছি যার পক্ষে রয়েছে নবী সা. এর উৎকৃষ্ট আদর্শ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মসমূহ। হাদিস ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ থেকে আমি একথার কোনো প্রমাণ পাইনি যে, রোম ও অনারব দেশসমূহে সেনাবাহিনী প্রেরণের পূর্বে সাহাবায়ে কেরামকে সে সকল দেশে তাবলিগী অভিযানে পাঠানো হয়েছে এবং তারপর সেই দাওয়াত ও তাবলীগের ফলাফলের অপেক্ষা করা হয়েছে। নবী করীম সা. রাজা বাদশাহদের নামে শুধু পত্র প্রেরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, এর সাথে তিনি রোম ও ইরানের বাসিন্দাদের সম্বোধনের প্রয়োজন বোধ করেননি। অথবা তাদের জবাবেরও অপেক্ষা করেননি। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও এই অবস্থাই বর্তমান ছিলো। প্রথমে রোমের দিকে মুতা অভিযান এরপর তাবুক অভিযান এবং সর্বশেষে উসামা বাহিনীর অভিযান এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ। ইরানের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকরের রা. যুদ্ধ এবং মিশরের উপর হযরত ওমরের রা. আক্রমণও একথার প্রমাণ।

সে দেশগুলির জনগণকে সম্বোধন না করে শুধুমাত্র তাদের শাসকদেরকে কেন সম্বোধন করা হয়েছিল একটু চিন্তা করলেই এর কারণও সহজেই বুঝা যায়। কারণ ছিলো এই যে, ঐসব দেশে স্বৈরতন্ত্র চালু ছিলো এবং স্বৈরাচারী শাসকরাই ক্ষমতাসীন ছিলো। তাদের ক্ষমতাসীন থাকাটাই ইসলাম প্রচারের পথে তখন সর্বাপেক্ষা বড় বাধা ছিলো। তাদের বর্তমানে দেশের জনগণের কাছে সাধারণভাবে দাওয়াত পৌছানো সম্ভবও ছিলো না আর দেশের জনগণের এ স্বাধীনতাও ছিলো না যে, সত্য বুঝে আসার পর তারা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারবে বা স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে সক্ষম হবে। এ অবস্থাতে শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে যথাযথভাবে ইসলাম প্রচার করা সম্ভবও ছিলো না বা তার সুফল পাওয়ার ও কোনো উপায় ছিলো না। এ কারণেই বাদশাহদের নামে প্রেরিত পবিত্র পত্রসমূহে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের দাওয়াত কবুল না করা বা আনুগত্য না করার কারণে প্রজাদের ভুল পথে চলার খেসারত তোমাদেরকেই দিতে হবে।

নবী করীম সা. ও সাহাবাদের এ কাজ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়, যদি কোনো দেশে এমন সরকার কায়েম থাকে যে, তার বর্তমানে জনসাধারণের পক্ষে ইসলামের দাওয়াত শুনে তা গ্রহণ করা কার্যত: অসম্ভব, তাহলে সে অবস্থায় ঐ সরকারকে উৎখাত করা জরুরি। আর সে সরকারকে উৎখাত করার অর্থ জনগণের আকীদা ও আমলকে আজাদী দান করা। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে, বরং উদ্দেশ্য হবে সে দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে ঐ সব প্রতিবন্ধক অপসারিত করা, যা সত্যানুরাগী ও সত্যানুসরণের পথে বাধা হয়ে থাকে।

এখানে এ কথারও ব্যাখ্যা দেয়া জরুরি যে, আপনি আমার যে পংক্তির উপর প্রশ্ন তুলেছেন তার মধ্যে ইসলামি দাওয়াত ও তাবলীগ এবং যুদ্ধ ও সন্ধির আইন কানুনের পরিপূর্ণ বিধান আলোচনা করা হয়নি। একটি সামগ্রিক সমস্যার প্রতি সাধারণ ইংগিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষভাবে আমার রচিত গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত যে আলোচনা করেছি সেগুলি বাদ দিয়ে একটি আনুষঙ্গিক আলোচনার মধ্য থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দেয়া ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হতে পারে না। *(তরজমানুল কুরআন, শাওয়াল ১৩৭৫ হি., জুন ১৯৫৬ খৃ.)*

দারুল ইসলামের নতুন সংজ্ঞা

প্রশ্ন : আমার দু'টি প্রশ্ন জনাবের খিদমতে পেশ করছি। আশা করি সন্তোষজনক জবাবদানে সুখী করবেন :

১. দারুল কুফর, দারুল হারব ও দারুল ইসলামের সঠিক সংজ্ঞা কি? দারুল কুফর এবং দারুল ইসলামের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়াদির মধ্যে কোনগুলোকে মৌলিক বলে চিহ্নিত করা যায়? মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী সাহেবের নিম্নলিখিত বক্তব্য পড়ে আমি এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

> "কোনো দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যদি কোনো অমুসলিম দলের হাতে থাকে, কিন্তু মুসলমানরাও সে ক্ষমতার মধ্যে অংশীদার থাকে এবং তাদের ধর্মীয় ও দীনি অনুষ্ঠানগুলির সম্ভ্রমও রক্ষিত হতে থাকে সে দেশ হযরত শাহ সাহেবের অর্থাৎ শাহ আবদুল আজীয সাহেবের রহ. মতে নি:সন্দেহে দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে। শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সে দেশকে নিজের দেশ মনে করা, এর সার্বিক কল্যাণ কামনা করা এবং এর মঙ্গল চিন্তা করা মুসলমানদের উপর ফরয। *(নাকশে হায়াত, ২য় খণ্ড, ১১ পৃ.)*

আশা করি আমাকে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিয়ে বাধিত করা হবে।

২. কুরআনের সূরা ইবরাহিমে وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ আয়াতে উল্লেখিত লা-য়াল্লাহুম শব্দটি 'সন্দেহবোধক পদ। অথচ আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞানী, নিখিল বিশ্বের সকল বিষয়ে তাঁর নিশ্চিত জ্ঞান রয়েছে। এমতাবস্থায় এর ব্যাখ্যা কি হবে?

জবাব : আপনার প্রথম প্রশ্নটি আমার কাছে না করে মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাহেবের নিকট করাই উত্তম ছিলো। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, বর্তমান ভারত সরকারের শাসনামলে দেশ পরিচালনায় মুসলমানদের যতোটা প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় ও দীনি আচার অনুষ্ঠানের যে পরিমাণ মর্যাদা দেয়া হয়, বৃটিশ

শাসনকালে মুসলমানদের হাতে এর চাইতে বহুগুণ বেশি কর্তৃত্ব ছিলো, তদুপরি তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং মান মূল্যবোধের মর্যাদাও এর তুলনায় অধিক পরিমাণে বজায় রাখা হতো। এ ব্যাপারে কেউ অস্বীকার করতে চাইলে বৃটিশ শাসনামলে মুসলমান মন্ত্রীবর্গ, একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যবর্গ, সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের কর্মচারীদের সংখ্যা এবং বর্তমান ভারত সরকারে প্রতিটি বিভাগের কর্মচারীদের সংখ্যার মধ্যে তুলনা করে তারতম্যের হার তাকে অনায়াসে দেখিয়ে দেয়া যায়।

ধর্মীয় নিদর্শনগুলির সম্ভ্রম সম্পর্কে বলতে গেলে দেখা যায় বর্তমান হিন্দু কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাসীন থাকার যুগে মসজিদগুলিকে যেভাবে বেইজ্জতি করা হয়েছে তার সাথে ইংরেজ আমলে ঐ ধরনের হামলার তুলনা করলে পার্থক্য ধরা পড়বে। হিন্দু শাসনামলে মুসলমানদের জান মাল ও মুসলিম নারীর ইজ্জতের উপর যতোগুলো হামলা হয়েছে তার তুলনাও ইংরেজ আমলের সাথে করা যেতে পারে। এ যুগে মুসলিম পার্সনাল ল'র সাথে যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে ইংরেজ আমলের দেড়শত বছর ধরে মুসলিম পার্সনাল ল'র সাথে ব্যবহারের তুলনা করে দেখা যেতে পারে। এখন যদি হযরত শাহ সাহেবের বর্ণনামতে বর্তমান ভারত নি:সন্দেহে 'দারুল ইসলাম' হয়ে থাকে তাহলে ইংরেজ আমলের হিন্দুস্তান 'দারুল ইসলাম' কেন ছিলো না? আপনি মাওলানার নিকট এই পার্থক্যের কারণ পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞাসা করুন, যার ভিত্তিতে তাঁর নিকট ইংরেজ আমলের হিন্দুস্তান ছিলো দারুল কুফর আর এখনকার হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম বলে তার নজরে ভাসছে? এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা যা বলেন তা আমাকেও অবহিত করবেন যাতে করে আমি নিজেও এই নতুন ফিকহী গবেষণা দ্বারা উপকৃত হতে পারি। আমি বুঝতে চাই এহেন অবস্থা সত্ত্বেও বর্তমান ভারত যদি সাধের দারুল ইসলাম হয়, তাহলে দারুল কুফর বলে বিশ্বে কোনো রাষ্ট্র আছে কি?

মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাহেবের ভক্তরা যতোই খারাপ মনে করেন না কেন, বাস্তব ঘটনা হলো, তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আজকের দেওবন্দ (মাদ্রাসা) ইংরেজ আমলের শুরুতে আলীগড় কলেজের অপেক্ষা অধিক নিম্নপর্যায়ে দণ্ডায়মান। আজ মওলানা হুসাইন আহমাদ ও তাঁর সহযোগী আলেমগণ যেভাবে হিন্দু ক্ষমতাসীনদের সাথে আপোষ করে এগুচ্ছেন, স্যার সাইয়েদ, চেরাগ আলী, মুহসিনুল মূলক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইংরেজ শাসকদের সাথে তার দশ ভাগের এক ভাগও সমঝোতা করেননি। সেই প্রকৃতি পূজারীরা ইসলামি চিন্তাধারাকে মুছে ফেলার জন্য এতোটা সাহস করেনি যা বর্তমানের মার্কামারা ওলামায়ে কেরাম করে চলেছেন। আরো সর্বনাশা ব্যাপার হলো তাঁরা নিজেদের সাথে শাহ

ওলিউল্লাহ মরহুমের বংশীয়দের এবং অন্যান্য বড় বড় বুজর্গদেরকেও জড়িত করে বিপর্যয় সাগরে তলিয়ে যেতে চান যাতে তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে জনগণের মনে যে পবিত্রতার ছাপ রয়েছে তাতে কোনো প্রকার আঁচড় না লাগে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হলো, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যেসব বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে মানুষকে সংশোধনের জন্য যে সব কৌশল বা কর্মপন্থা বলে দিয়েছেন, তা দ্বারা বাঞ্ছিত সুফল লাভ নির্ভর করে তাদের নিজেদের ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের উপর। আর যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের জন্য বাধ্য করতে চান না, কাজেই তিনি বাঞ্ছিত ফল পাওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লা-য়াল্লাহুম ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ উক্ত ফল পাওয়ার নিশ্চিত বিষয় নয়, বরং মানুষ সঠিক চিন্তাপদ্ধতি অবলম্বন করলেই সে ফল পাওয়া আশা করতে পারে। *(তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উখরা ১৩৭৬ হি., মার্চ ১৯৫৭ খৃ.)*

ইসলামি রাষ্ট্র ও মাওলানা মাদানীর রহ. চিন্তাধারা-১

প্রশ্ন : মরহুম মাওলানা হুসাইন আহমদ সাহেব রচিত 'নাকশে হায়াত' এর কোনো কোনো আপত্তিকর বিষয় সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে আপনার সাথে পত্রালাপ করেছি। এরপর সেগুলিসহ মরহুম মাওলানার আরো কিছু লেখার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সংস্করণের আপত্তিকর বিষয় ও বাক্যসমূহ হয় পরিবর্তন করে দেয়া হবে অথবা সংশোধন করা হবে এই মর্মে তিনি ওয়াদা দেন। আর সংশোধনও এমনভাবে করা হবে যাতে কারো মনে 'তিনি অনৈসলামি দৃষ্টিভঙ্গির ধারক' এ জাতীয় সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এ ব্যাপারে মরহুম মাওলানার জবাব নিম্নরূপ :

"আমার প্রতি এই অভিযোগ যে, আমি হযরত সাইয়েদ সাহেবকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নির্মাণ প্রয়াসী এবং শুধুমাত্র বিজাতীয় ইংরেজ বিতাড়ণকামীরূপে আখ্যা দেই। এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা এবং সত্য সঠিক বিশ্লেষণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নামান্তর। যাই হোক, আমার কথার এ অর্থ গ্রহণ করা আদৌ ঠিক হবে না। আর যদি ধরেই নেয়া হয় যে, আমার কোনো লেখায় কিছু কথা এমন আছে যার অর্থ এটাই বুঝায়, দ্বিতীয়তঃ যার অন্য কোনো ব্যাখ্যা করাও কঠিন, তাহলে সেটাও হবে ভুল। ভারত সরকারের লজ্জাজনক কার্যকলাপ আমি অস্বীকার করি না। এমতাবস্থায় তাকে আমি কি করে দারুল ইসলাম আখ্যা দিতে পারি? কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মাঝামাঝি এমন ব্যবস্থাও আছে, ইসলাম যাকে স্বীকার করে নিতে পারে। মুগল সাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন আর চিন্তা করুন।" মরহুম মাওলানার জবাবে খুশি অবশ্যই হয়েছি যে, তিনি অন্তত দারুল কুফরকে দারুল ইসলাম মনে করেন না, কিন্তু আর একদিকে দু:খিত

হয়েছি, যখন তাঁর রচিত (নাকশে হায়াত) গ্রন্থে প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং তাঁর এই জবাবের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাই না। এ ব্যাপারে আমি আরো পত্রালাপ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

জবাব : আমিও এটা দেখে অত্যন্ত খুশি হলাম যে, মরহুম মাওলানা হুসাইন আহমদ সাহেব ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রকে অন্তত দারুল ইসলাম অভিহিত করছেন না এবং সেখানকার বর্তমান সরকারের লজ্জাজনক কার্যকলাপ থেকে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তাঁর রচিত 'নাকশে হায়াতে'র একটি দু'টি নয়, বিভিন্ন ছত্রের অন্তরালে যে কথাগুলি ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলো নেহায়েতই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টিকারী মতবাদের ইঙ্গিত দেয়। এজন্য সাধারণভাবে এটাকে অস্বীকার করা বা ভুল স্বীকার করার পরিবর্তে সে সব মতবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাহার এবং তা থেকে দায়মুক্ত থাকার পরিষ্কার ঘোষণা করা প্রয়োজন। কেননা তিনি মরহুম সাইয়েদ আহমাদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলায়হের জিহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'সাইয়েদ আহমাদ শহীদ চেয়েছিলেন ভারত বিদেশী (ইংরেজ) জাতির অগণিত যুলুম নির্যাতন থেকে মুক্ত হওয়ার পর হিন্দু মুসলমান যুক্তভাবে যাকে ইচ্ছা শাসন ক্ষমতায় বসাবে।' অথচ এর প্রমাণ হিসেবে তিনি হযরত শহীদের যে পত্রখানি পেশ করেন সেটা হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত সরকার গঠন করার ধ্যানধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারপর তিনি শাহ্ আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহের উদ্ধৃতিগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাতে হযরত শাহ সাহেবের বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মতে–

"যদি কোনো দেশের শাসন ক্ষমতার চাবিকাঠি কোনো অমুসলিম দলের হাতে থাকে আর মুসলমানরাও কোনো না কোনোভাবে সেখানকার শাসন ক্ষমতায় শরীক থাকে এবং তাদের ধর্মীয় ও দীনি নিদর্শনগুলোর যথাযথ মর্যাদাও দেয়া হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে শাহ্ সাহেবের মতে সে দেশ দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে এবং শরিয়ত অনুসারে সে দেশকে নিজের দেশ মনে করে তার কল্যাণ কামনা করা এবং কল্যাণকর ব্যবহার করা মুসলমানদের উপর ফরয সাব্যস্ত হবে।"

এখানেই তিনি থেমে যাননি বরং এ অদ্ভুত দাবিও করেছেন যে, 'মুগল সাম্রাজ্যের পতন যুগে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যারাই বিপর্যস্ত অবস্থাকে শোধরাতে চেয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য ছিলো দেশে স্বচ্ছলতা আনয়ন করা, নিরাপত্তা বিধান করা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বহাল রাখা, যুলুম ও নির্যাতনের মূলোৎপাটন করা এবং জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করা। শাসন ক্ষমতা মুসলমানের হাতে থাকুক কিংবা অমুসলমানের হাতে এ বিষয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিলো না।" আরো একটু

অগ্রসর হয়ে হযরত সাইয়েদ আহমদের সাথে সম্পৃক্ত করে তিনি যে ভুল ও বিস্ময়কর উক্তি করেছেন তা হলো :

"আল্লাহ তায়ালার দীনকে বিজয়ী করার ব্যবস্থা হিসেবে চালু করার উপায় শুধু এটাই নয় যে, একটি সম্প্রদায়ের সরকার গঠন করে ক্ষমতার মসনদে বসতে হবে এবং দেশবাসী অন্য সম্প্রদায়ের ভাইদেরকে অধীনস্থ বানাতে হবে। বরং এর সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো, দেশবাসী অন্য সম্প্রদায়ের ভাইদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় নিজেদের সাথে শরীক করে নিয়ে ইসলামি নৈতিক চরিত্র মাধুর্যে তাদের অন্তর জয় করে নেয়া।" *(নকশে হায়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২)*

আলোচ্য ভাষ্যসমূহ ইসলামি রাষ্ট্রের ধ্যানধারণার মূল বুনিয়াদকেই ধূলিস্যাৎ করে দেয় এবং এটা, ইসলামি রাষ্ট্র গড়ার চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি। এর পরিষ্কার অর্থ হলো : যেখানে মুসলিম, অমুসলিম পরস্পর মিলিতভাবে বাস করে সেখানে ইসলামি সরকার কায়েম করা ভুল না হলেও অপ্রধান বা গৌণ পদ্ধতি অবশ্যই। এ ধরনের রাষ্ট্রকে ইসলামি না বলে মাওলানা একে বারবার সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা আখ্যা দিচ্ছেন। উপরন্তু দেশবাসী অন্য সম্প্রদায়ের ভাইদেরকে শাসিত বানিয়ে নিজেরা শাসক হয়ে যাওয়া তাঁর দৃষ্টিতে যদি বাড়াবাড়ি নাও হয়ে থাকে অন্ততঃ অসঙ্গত তো বটেই। তিনি আল্লাহর দীন বিজয়ী করার লক্ষ্যে উত্তম ও সুন্দর পদ্ধতি বলতে এটাকেই বুঝাতে চান যে, হিন্দু-মুসলিমের যুক্ত সরকার গঠন করতে হবে, যা কোনোভাবেই ইসলামি রাষ্ট্র হবে না। নৈতিক চরিত্র মাধুর্যেই বরং অমুসলিমদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালাতে হবে। এমতাবস্থায় এতে স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে, তাহলে খেলাফতে রাশেদার পজিশন কি দাঁড়ায়, যেখানে কমপক্ষে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ অমুসলিম বাসিন্দা থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক সরকার গঠন করতঃ মুসলমানরা নিজেরাই শাসন ক্ষমতা দখল করে বসেছিল। তদুপরি অমুসলিম বাসিন্দাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সমঅংশীদারিত্ব না দিয়ে তাদেরকে অধীনস্থ করে রাখা হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে আমি বরং বলতে চাই, একথার আঘাত স্বয়ং নবী সা.-এর উপরও এসে পড়ে। কারণ স্বদেশী ভাইদের তিনি ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব না দিয়ে খাঁটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। মাওলানা কি তাহলে একথাই বলতে চান যে, হুজুর সা. উন্নততর ও অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি বাদ দিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুতঃ এর ভিত্তিতেই আমি মনে করি হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠার পর তাদের সাথে আপোষ করতে গিয়ে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মরহুম সীমা ছেড়ে এতো দূর এগিয়ে গিয়েছেন, ইংরেজদের সাথে আপোষকামিতায় স্যার সাইয়েদ ও তাঁর সহযোগীরাও ততোদূরে পা রাখেননি। ইসলাম সম্পর্কে এহেন চিন্তাধারা মুসলমানদের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের ভিত ধ্বসিয়ে দেয়া বিচিত্র নয়। এমন কি

এ চিন্তাধারা গ্রহণ করার পর একজন মুসলমান রসূলুল্লাহ সা. এবং সাহাবায়ে কিরামের মুকাবিলায় ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রতিষ্ঠাতাদেরকে অধিকতর ন্যায়পরায়ণ ধারণা করাটাই বা অসম্ভব কি? আমার বিবেচনায় মরহুর মাওলানার এই আপোষ মনোভাব এক মারাত্মক যুলুম। আমি আল্লাহ পাকের কাছে এই প্রার্থনা জানাই তিনি যেনো তাঁকে ক্ষমা করেন আর সাধারণ মুসলমানদের এহেন দৃষ্টিভঙ্গির সর্বনাশা প্রভাব থে.ক বাঁচিয়ে রাখেন। *(তরজমানুল কুরআন, শাওয়াল ১৩৭৭ হি., জুলাই ১৯৫৮ খৃ.)*

ইসলামি রাষ্ট্র ও মাওলানা মাদানীর রহ. চিন্তাধারা-২

প্রশ্ন : কয়েকটি জরুরি বিষয়ে বহুদিন থেকে আপনার খিদমতে পত্র লিখার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে লিখার সময় করে উঠতে পারিনি। এখন নতুন এক পরিস্থিতির উদ্ভবের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে লিখতে বসলাম। গত পরশুর সদ্য প্রকাশিত 'তরজমানুল কুরআন' পত্রিকাটি পেলাম। অভ্যাস অনুযায়ী পত্রিকা পাওয়া মাত্র প্রথম বৈঠকেই প্রায় পড়ে শেষ করে ফেলি। এবারের রাসায়েল ও মাসায়েলে আপনার লেখাগুলো পড়ে মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়, যার কারণে আপনার খিদমতে পত্র লিখে মনের আবেগ প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করি।

আমি মরহুম মাওলানা মাদানীর একজন ছাত্র ও অনুরক্ত। এ সাধারণ সম্পর্ক ছাড়াও কোনো কোনো কারণে হযরতের সাথে আমি বিশেষভাবে জড়িত। বর্তমান যুগের অন্যান্য ওলামা ও মাশায়েখের মধ্যে তাঁর সাথেই আমার আন্তরিকতা ও মহব্বত সবচেয়ে বেশি। তাঁকে দেখে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমি তাঁর মধ্যে যে জ্ঞান ও আমলী যোগ্যতার সন্ধান পেয়েছি, সেটা আজ পর্যন্ত আর কোথাও পাইনি। কিন্তু তাঁর সাথে সম্পর্কের এতো গভীরতা, এতো আন্তরিকতা এবং তাঁর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার এতো আধিক্য থাকা সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামি সম্পর্কে হযরত মাওলানার অভিমত আমার ঈমান প্রদীপ্ত বিবেক নিশ্চিন্তভাবে স্বীকার করে নিতে পারেনি। অবশ্য এর কারণে তাঁর প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধায় ভাটাও পড়তে দিইনি। আমি মনে করি, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আমার জন্য এটাও জরুরি ছিলো না যে, বুঝি বা না বুঝি সর্বাবস্থায় হযরতের রায় মেনে নেবো এবং জামায়াতে ইসলামি ও এর কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁর অনুসৃত নীতিকেই নিজের রায় হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হবে। জামায়াতে ইসলামি সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি যেহেতু দেওবন্দী মহল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, সেজন্য আমার এ ভূমিকাকে কোন্ কোন্ ব্যক্তি নিজ উস্তাদদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। এ অপরাধে কোনো কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিতে আমি অভিশপ্ত এবং দোষী হয়ে আছি, আর কোনো কোনো লোকের কাছে নিন্দনীয় এবং অপমানযোগ্যও। এই কারণে এবং এই 'অপরাধে' আমাকে

পার্থিব ও বস্তুগত যথেষ্ট ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে। বহু ফায়দা থেকে বঞ্চিতও হতে হয়েছে। অবশ্য এতে আমার কোনো দু:খ নেই। কারণ এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমি যে ভূমিকা নিয়েছি সেটা নিছক আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য। আর এটাকে আমি ঈমানের দাবি বলেই মনে করি। যাই হোক, এপর্যন্ত মূল কথার ভূমিকাই পেশ করলাম।

মূল উদ্দেশ্য যা পেশ করতে চাই, সেটা হলো, কোনো দলীয় হিংসা বা ব্যক্তিস্বার্থে নয়, বরং দীনের দাবি এবং কল্যাণ কামনা করেই মনের এ অভিব্যক্তি প্রকাশ করছি। কিছু দিন পূর্বেও তরজমানুল কুরআনে হযরত মাদানীর 'নকশে হায়াত'-এর একটি বাক্য সম্পর্কে আপনার নিকট প্রেরিত জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে আপনি যা লিখেছিলেন, তাতে যথেষ্ট তিক্ততার ভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সেই প্রশ্নের জবাব আপনার পক্ষে না দেওয়াই উচিত ছিলো। পূর্বে প্রদত্ত জবাবের ন্যায় প্রশ্নকর্তাকে আপনার একথা বলে দেয়াই সমীচীন ছিলো যে, 'ঐ বাক্যের জবাব খোদ মাওলানাকেই জিজ্ঞেস করুন। উক্তি তাঁর ব্যাখ্যা দেয়াও তাঁরই দায়িত্ব।" কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে বিনা প্রয়োজনে আপনি কড়া কথা লিখে দিলেন। জবাব পড়ে কথাগুলি আমার কাছেও যথার্থ মনে হয়নি। কিন্তু আপনার সাথে আমার হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার সুবাদে আপন ব্যাখ্যা দ্বারাই মনের প্রতিক্রিয়া দাবিয়ে রেখেছি। এরি মধ্যে জানতে পেরেছি, জামায়াতের অনুকূলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতের সাথে জড়িত হননি, এ জাতীয় বহু ওলামায়ে কেরামও আপনার উক্ত জবাবে ভীষণ রুষ্ট হয়েছেন। এমনকি আপনার সম্পর্কে তাঁদের মত পরিবর্তন করে জামায়াতের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমার সাথেও তাঁরা কথা বলেছেন। বরং আমাকে আপনার কাছে এমর্মে পত্র লিখতে প্রায় বাধ্যই করেছেন যে, এভাবে অকারণে অন্তরে ব্যথা দেওয়ার মতো উক্তি আপনি প্রকাশ করতে গেলেন কোন্ কারণে? কিন্তু আমি তখন নীরবতা অবলম্বন করি। এখন অতি সাম্প্রতিক সংখ্যায় সেই কথারই আরো একটু কড়া ভাষায় পুনরাবৃত্তি করেছেন। হযরত মাদানী রহ. এর ইন্তিকালের পর পুনরায় সেকথা নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরা আর এমন ভঙ্গিতে লিখা আদৌ সমীচীন হয়নি, যা সাধারণভাবে অন্য লোকেরা করে থাকে। আপনি হয়তো বলতে পারেন, আলেম ওলামা এবং অন্যান্য অনেকে আমার ও জামায়াত সম্পর্কে এই ধরনের আচরণই করে থাকে। কিন্তু এ ধরনের কাজে অন্যের অনুকরণ করা আপনার জন্য শোভা পায় না। আসলেই আমি মনে করি সত্যের প্রতি দাওয়াত দানকারী হিসেবে আপনার স্থান অনেক উর্ধ্বে এবং এ ধরনের লেখা আপনার মর্যাদা অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের। লিখক হিসেবে এতে আপনার নাম না থাকলে আমার অভিরুচি অনুসারে বিশ্বাসই হতো না যে, আপনার মতো ব্যক্তিত্ব এ স্তরে

নেমে আসতে পারে। আমি তো মনে করি, প্রশ্ন কেউ পাঠিয়ে থাকলে এর জবাব আপনার না দেয়াই উচিত ছিলো। 'নকশে হায়াতের' ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রশ্নকর্তার যদি এই আফসোসই থেকে থাকে যে, উক্ত পুস্তকে উল্লিখিত মরহুম মাওলানার ঐ জবাবের মধ্যে কোনো সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না, তাহলে তার সে দুঃখ দূর করার জন্য সে আপনার সাথে পত্রালাপের প্রয়োজন অনুভব করে কেন? সে হয়তো জীবদ্দশায় মাওলানার নিকট থেকে অথবা মৃত্যুর পরে তাঁর কোনো খাস শিষ্য কিংবা তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারতো। মরহুম মাওলানার সাথে তো আপনার এমন কোনো সম্পর্ক ছিলোনা যে, তাঁর পরস্পর বিরোধী কথার ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে? আর যেকোনো প্রকারে আপনি জবাবদিহি করতে বাধ্য হবেন? আমি নিজে তো আপনার সম্পর্কে কোনো বিরূপ ধারণা পোষণ করি না। কিন্তু এখানে কিছু কিছু লোক এ মত প্রকাশ করেছে যে, এই ব্যাখ্যাপ্রার্থীও কাল্পনিক, যাতে করে এহেন অবাঞ্ছিত জবাব প্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মরহুম মাওলানার উক্তির যে অর্থ আপনি নিয়েছেন এবং তার যে ব্যাখ্যা দান করেছেন, আমার মনে হয় সেখানেও আপনি নিজের উচ্চ মর্যাদা থেকে নিচে নেমে কথা বলেছেন। সাধারণ আলেমরা যখন আপনার লেখা সম্পর্কে এধরনের ব্যবহার করে, তখন সংগত কারণেই সেটা আপত্তিকর এবং কৈফিয়াত চাওয়া ইনসাফের দাবি হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্য আপনার প্রতি অভিযোগ আমিও সংগত মনে করি এবং কৈফিয়ত চাওয়া ইনসাফের দাবি বলে মনে করি। বাস্তবিকই এটা সত্য যে, এ জবাব প্রকাশ করে দীনি দিক দিয়ে আপনি কোনো উপকার করেননি। ইকামতে দীনের অবস্থান মজবুত করার জন্যও এর কোনো ভূমিকা নেই। বরং এর দ্বারা শত শত নয়, বরং হাজারো এমন লোকের মনে কষ্ট লেগেছে, যারা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করছেন এবং আপনার প্রচেষ্টাকে একটি সঠিক প্রচেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করে চিন্তা ও কর্মে আপনার সাথে শরিক হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। একে আপনি অন্ধ মহব্বত আর অনুকরণ বলেন বা অন্য কিছু বলেন, কিন্তু এটা বাস্তব সত্য যে, গোটা আলেম সম্প্রদায় এবং দীনদার শ্রেণীর অন্তরের গভীরে হযরত মাদানীর রহ. মহব্বত ও শ্রদ্ধাবোধ বদ্ধমূল হয়ে আছে। হতে পারে, কোনো কারণে কেউ তাঁর কোনো কথা বা মত কবুল করেননি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে অসম্মানজনক বা অপমানকর কোনো কথা যদি বলা বা লিখা হয়, তাহলে সেটা সহ্য করা বড় কঠিন ব্যাপার। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর যেসব কথা নিয়ে নাড়া দেয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই সেগুলির উল্লেখ বা প্রকাশ করায় দীনের এতোটুকু ফায়দা হচ্ছে বলে বুঝা যায় না। সে অবস্থায় এক নতুন সংঘাত সৃষ্টি করার যৌক্তিকতা কোথায়? বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব অনুভব করে আপনিও "অধিক জরুরি বিষয়ে অগ্রাধিকার

বাঞ্ছনীয়" নীতির কারণে এবং বাস্তব কাজের হিকমত সামনে রেখে অন্য বহু কাজের মধ্যে রদবদল করার দরকার অনুভব করেছেন। আর এটা করার প্রয়োজনও ছিলো। এমতাবস্থায় বাস্তব কৌশল কি এটা নয় যে, আজকের এই নাজুক সময়ে ওলামায়ে কেরামকে এতটুকু ঝাঁকুনি দেয়া না হোক? তাতে যদি তাদের কেউ এক আধটু সীমা অতিক্রম করে বসে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব এড়িয়ে যাওয়া উচিত। আমি নিশ্চিত মনেই বলছি যে, ছোট বড় যাবতীয় দোষারোপের মুকাবিলায় আপনাদের পক্ষে সংযমী হওয়া এবং 'মাররু কিরামান" (সম্মানজনকভাবে অতিক্রম কর) এর নীতি অবলম্বনকারী হয়ে যাওয়া দীনি দিক থেকে অধিকতর উপকারী প্রমাণ হবে। এর মধ্যেই জামায়াতের মর্যাদা নিহিত রয়েছে বলে আমি একান্তই বিশ্বাস করি। কথা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেলো। সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে আমার উদ্দেশ্য বুঝে নেয়া আপনার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। আশা করি অবশ্যই আপনি গভীর চিন্তার আলোকে বিষয়টি নিয়ে বিচার বিবেচনা এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবকে কোনো উত্তম পদ্ধতি দ্বারা দূর করার চেষ্টা করবেন। আপনার সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম যা কিছু প্রশ্ন তুলছেন, দিনরাত আমাদেরকে তার জবাব দিতে হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে আমি জামায়াতের সাথে জড়িত না থাকলেও লোকদের ধারণায় আমি একজন "পাক্কা মওদূদী"। আপনার পক্ষ থেকে লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব আমি প্রায়ই দিয়ে থাকি। কিন্তু সাম্প্রতিক এই লেখার উপর যে প্রশ্ন করছে তার কোনো জবাব আমার নিকট নেই। অপরদিকে আপনার সম্পর্কে কেউ বিরূপ মন্তব্য করলে তাও বরদাশত করা আমার পক্ষে কঠিন। কেননা আমি মনে করি, এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া গোটা আন্দোলনের উপর এবং সে সূত্রে ইকামাতে দীনের উপর স্বভাবতই পতিত হয়। এ সমস্ত অসংলগ্ন আলোচনায় আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করা হলো। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এর সুফল ও উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আমি দৃঢ় আশাবাদী।

জবাব : মাওলানা মাদানী মরহুমের সাথে আপনার সম্পর্কের বিষয়টি আমি অবগত আছি। তাঁর সাথে এই গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমার এবং জামায়াতে ইসলামির সাথে আপনার যে সম্পর্ক রয়েছে, এটাকে আমি আপনার ন্যায় ও সত্যপরায়ণতার স্পষ্ট প্রমাণ মনে করি। এ সত্যপ্রিয়তার মূল্য না দিলে আপনার প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু "রাসায়েল ও মাসায়েলে" প্রকাশিত 'নকশে হায়াতের' যে বাক্যগুলো সম্পর্কে এক ব্যক্তির সাথে আমার যে পত্র যোগাযোগ প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার অভিযোগ আমার বুঝে আসেনি। আপনি যদি মাওলানার (মাদানী মরহুম) বিশ্বাস ও মতাদর্শ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পুনরায় এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখেন, তবে আমি আশা করি, আপনি নিজেও আপনার এ অভিযোগগুলোর মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পাবেন না।

'নকশে হায়াত' দ্বিতীয় খণ্ডের যেসব বাক্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সর্বপ্রথম মাওলানার গ্রন্থ থেকেই সে বাক্যগুলো আপনি দেখে নিন। বাক্যগুলোর পূর্বাপর সম্পর্কের প্রতিও দৃষ্টিপাত করুন। বাক্যগুলো এখানে হুবহু লিখে দিচ্ছি :

১. "হযরত সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী শহীদ যিনি এই আন্দোলনের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা, গোয়ালিয়রের মন্ত্রীর নিকট সাহায্য চেয়ে তিনি পত্র লিখেছিলেন (এই পত্র সম্মুখে আমরা হুবহু উল্লেখ করবো)। এই পত্রে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতবর্ষকে এই বিদেশী জাতির (ইংরেজ) নিপীড়ন থেকে মুক্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এরপর দেশ শাসনের জন্যে হিন্দু মুসলিম মিলে যাকে উপযুক্ত মনে করবে, নির্বাচিত করবে।" *(নকশে হায়াত পৃ: ৫)*

অত:পর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ১৩-১৪ পৃষ্ঠায় তিনি সাইয়েদ (আহমদ ব্রেলভী) সাহেবের উপরে উল্লেখিত চিঠিটি উদ্ধৃত করেন। কিন্তু উপরোক্ত বিষয়ে কিছুই সে চিঠিতে উল্লেখ নেই। বরঞ্চ তার বিপরীত সেই চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ : "বড় বড় শাসক ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে যেসব উন্নত যোগ্যতা ও গুণাবলী বিদ্যমান ছিলো, সে সব গুণাবলী অর্জন করাই এই দুর্বলদের কাম্য, যাতে তারা ঐকান্তিকভাবে ইসলামের সেবা করতে এবং দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।"

২. "তাছাড়া কোনো সম্প্রদায়ের আস্থালাভের উদ্দেশ্যে সে সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদমর্যাদার দরজা এমনভাবে খোলা রাখতে হবে, যেমনভাবে খোলা রাখা হবে স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্যে। আর রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক বিষয়ে কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক আচরণও করা যাবে না।" কুরআনে বলা হয়েছে : وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ (পৃ. ১০)

৩. "আওরংগজীব আলমগীরের মৃত্যুর পর থেকে অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে। এখন আলেমরা তাদের সংশোধনের চেষ্টা করছে। তাদের এ চেষ্টার কারণ হলো তারা দেশের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা, অন্যায়ের উৎপাটন এবং খোদার সৃষ্টির কল্যাণ চায়। রাষ্ট্র ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকবে, নাকি অমুসলিমদের হাতে, সে বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তারাতো চায় কেবল দেশে সুবিচার বিরাজ করুক, সরকার যারাই পরিচালনা করুক না কেন?" *(পৃ: ১১)*

৪. "উপরে শাহ আবদুল আযীয রহ. এর যে ফতোয়া চয়ন করা হয়েছে, তাতে বিশেষভাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে (ক) তাঁর দৃষ্টিতে কোনো দেশ দারুল ইসলাম হবার জন্যে কেবল সে দেশের নাগরিকরা মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরঞ্চ এটাও জরুরি যে, সেখানে মুসলমানরা সম্মানজনকভাবে জীবন যাপন করবে এবং তাদের রীতিনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, কোনো দেশের সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতা যদি কোনো অমুসলিম দলের হাতেও ন্যস্ত থাকে, আর মুসলমানরা যদি সেই শাসন ক্ষমতায় অংশীদার থাকে এবং তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তবে হযরত শাহ সাহেবের মতে নিঃসন্দেহে সেটা দারুল ইসলাম।" *(পৃঃ ১১)*

অথচ মাওলানা (মাদানী) সাহেব ৬-৭ পৃষ্ঠায় শাহ সাহেবের যে ফতোয়া উল্লেখ করেছেন, তা এর বিপরীত অর্থ বহন করছে। তাতে তো শাহ সাহেব বলেছেন, "যেখানে মুসলমানদের নেতার (ইমামের) কর্তৃত্ব চালু না থাকে, বরঞ্চ কাফিরদের শাসন জারি থাকে, সেখানে ইসলামের কিছু কিছু হুকুম আহকামের সাথে সংঘাত না বাঁধলেও কোনো পার্থক্য হয় না। কেবলমাত্র জুম্মা, ঈদ, আযান ও গরু জবাইর স্বাধীনতা দ্বারা কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হয়ে যেতে পারে না।"

৫. "সাইয়েদ (ব্রেলভী) সাহেব নিঃসন্দেহে কোনো কোনো স্থানে আল্লাহর দীনের বিজয় এবং রাব্বুল আলামীনের দীনের খেদমত করার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ভালোভাবেই জানতেন, আল্লাহর দীনের বিষয়ের অর্থ কেবল কোনো একটি সম্প্রদায়ের সরকার প্রতিষ্ঠা করা নয় এবং নিজেরা শাসক সেজে মাতৃভূমির অন্যান্য সম্প্রদায়কে প্রজা বানানো নয়। বরঞ্চ এর সবচাইতে প্রভাবশালী পন্থা হলো, দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাইদের শাসন ক্ষমতায় শরীক করে ইসলামের সুমহান চরিত্র দ্বারা তাদের অন্তরকে বিজয় করা।" *(পৃষ্ঠা : ১৫)*

প্রথম উদ্ধৃতিটি যে মাওলানার নিজের বক্তব্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, পূর্বাপর আলামতের ভিত্তিতে এটি অন্য কারো বাক্তব্য বলে প্রমাণ হয় না। মাওলানা (মাদানী) সাহেব তাঁর গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় কোনো 'আলবুরহান' নামক পত্রিকা থেকে একটি উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন। উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করার কোনো প্রচলিত নিয়ম কানুনই এতে অনুসরণ করা হয়নি। ইনভার্টেড কমা দেয়া হয়নি। গ্রন্থকারের নিজের লেখার মতোই তা লিখে দেয়া হয়েছে। এই উদ্ধৃতিটি ৭ পৃষ্ঠার তৃতীয় লাইনে এসে শেষ হয়েছে। অতঃপর ৭ পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিকভাবে ১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গ্রন্থকারের নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার রীতিতেই বাক্য সাজানো হয়েছে। অথচ এর মাঝে মাঝে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সূত্রসহ উদ্ধৃতি নকল করা হয়েছে। আমাদের দেশে গ্রন্থ রচনা ও লেখাজোখার যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তার ভিত্তিতে যে কোনো পাঠক এই অংশগুলো গ্রন্থাকারের নিজের বক্তব্য হিসেবেই পড়ে যাবেন। ১৬ পৃষ্ঠার পয়লা প্যারাগ্রাফ শেষ হতেই 'আল বুরহান' পত্রিকার (সংখ্যা ২ ভলিঃ ২১ পৃঃ ৭৪-৮৭) সূত্র নযরে পড়ে। কিন্তু বার বার আগাগোড়া দেখেও কিছুই বুঝার উপায় নেই যে, 'আল বুরহানের এই উদ্ধৃতি

কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছে? হতে পারে, আমাদের উল্লেখ করা ৫নং প্যারাগ্রাফটিই শুধু এই সূত্র থেকে উল্লেখ হয়েছে, যা একটি দীর্ঘ বক্তব্যের সারকথা হিসেবে হয়তো তিনি উল্লেখ করেছেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে, আমাদের উল্লেখ করা ২, ৩, ৪ প্যারাগ্রাফও এই সূত্র থেকেই তিনি নিয়েছেন। এই 'আল বুরহান' পত্রিকার কোনো পরিচয় আমাদের জানা নেই। দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'বুরহান' পত্রিকাও এটা হতে পারে না। কারণ সেটার নামতো কেবল 'বুরহান', 'আল বুরহান' নয়। তাই মূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে বিশ্লেষণ করা কঠিন। তা সত্ত্বেও ৬ থেকে ১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গোটা বক্তব্যই যদি সেই (অজ্ঞাত) 'আল বুরহান' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি বলে ধরে নেয়া হয় (যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমাদের উল্লেখ করা ২, ৩, ৪ ও ৫ নং প্যারাগ্রাফ), তবু এর আগে এবং পরে মাওলানা যা কিছু বলেছেন, তা দেখে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মাওলানা এই গোটা বক্তব্যকে সঠিক বলে সমর্থন করছেন এবং নিজ মতের দলিল হিসেবেই সেগুলো উদ্ধৃত করেছেন। ইশারা ইঙ্গিতেও সেগুলোর সাথে তিনি কোনো দ্বিমত প্রকাশ করেননি। এভাবে কেউ যদি নিজ বক্তব্যের সমর্থনে অপর কারো বক্তব্য উদ্ধৃত করেন এবং সেই উদ্ধৃতির কোনো অংশের সাথে দ্বিমত প্রকাশ না করে তা সমর্থন করেন, তবে অবশ্যি সেটার পুরোটা তাঁর স্বমতের অনুরূপ বলে ধরে নিতে হয় এবং প্রতিটি শব্দের সাথে না হলেও গোটা বক্তব্যের সাথে তিনি সম্পূর্ণ একমত বলে মেনে নিতে হয়।

এবার আপনি নিজেই সে বাক্যগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সেগুলোর মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম কিংবা জটিল কথা নেই যে, একজন সাধারণ মানুষের তা বুঝতে অসুবিধা হবে। তাছাড়া বাক্যগুলো একাধিক অর্থবোধকও নয়, ব্যাখ্যা সাপেক্ষও নয়। সুস্পষ্ট ভাষায় বাক্যগুলোতে যা বলা হয়েছে, তা নিম্নরূপ :

১. যে দেশে মুসলিম এবং অমুসলিম নাগরিক থাকে, সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা একটি অনুচিত কাজ। কারণ, তা হবে একটি 'সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র'। আর মুসলমানরা নিজেরা যদি সেখানে শাসক হয়ে মাতৃভূমির অন্য সম্প্রদায়ের ভাইদেরকে প্রজা বানায় তবে এটা হবে সুবিচারের খেলাফ। এরূপ দেশের ব্যাপারে সঠিক পন্থা হলো, মুসলমান এবং অমুসলমানদের যৌথ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার এটাই সবচাইতে প্রভাবশালী পন্থা।

২. কোনো দেশ দারুল ইসলাম হবার জন্যে সেখানে ইসলামের বিধি বিধান চালু হওয়া এবং মুসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা আসা জরুরি নয়। দেশের সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতা অমুসলিমদের হাতে থাকলেও সে দেশ দারুল ইসলাম হতে পারে, যদি মুসলমানরাও সেখানকার সামগ্রিক শাসন ক্ষমতায় শরীক থাকে এবং তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

৩. রাষ্ট্র ক্ষমতা যদি মুসলমানদের হাতেও থাকে, তবু অমুসলিমদের জন্যে দেশের সকল বিভাগে পদমর্যাদা লাভের দরজা খোলা রাখতে হবে। এটা কুরআনেরই শিক্ষা। এমনটি না করা সুবিচারের খেলাফ।

৪, বিগত দুই আড়াইশ বছর ভারত উপমহাদেশে আমাদের আলেম ও বুযুর্গগণ অবস্থা সংশোধনের জন্যে যতো প্রচেষ্টাই চালিয়েছেন, তাদের মধ্যে কারো উদ্দেশ্যই এখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছিলো না। তাঁরা চাচ্ছিলেন একটি ভালো সরকার, মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম।

৫. হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল শহীদ রাহিমাহুল্লাহর আন্দোলনের উদ্দেশ্যও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছিলো না। তাঁরা কেবল ইংরেজদের বিতাড়নের জন্যেই আন্দোলন করেছিলেন। ইংরেজ বিতাড়নের পর হিন্দু মুসলমানদের যৌথ সরকার প্রতিষ্ঠাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো।

এই পাঁচটি বক্তব্যের প্রতি মাওলানা মাদানী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে দু'নম্বরটি সম্পর্কে মরহুম কেবল এতটুকু ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, তিনি ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রের প্রতি দারুল ইসলাম পরিভাষাটি প্রয়োগ করছেন না। পাঁচ নম্বরটি সম্পর্কে শুধু এতটুকু ব্যাখা দিয়েছিলেন যে, তাঁর মতে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদের উদ্দেশ্য সেক্যুলার (ধর্মহীন) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছিলো না।

কিন্তু আপনি নিজেই লক্ষ্য করে দেখুন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ মৌলিক কথাগুলোর মধ্যে মোটেও কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না, যা উপরোক্ত পাঁচটি পয়েন্টে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি মূল বক্তব্যই স্বস্থানে হুবহু অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই পাঁচটির প্রতিটি পয়েন্টেই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে মৃত্যু সমতুল্য। এর বিষাক্ত প্রভাবে কেবল ভারতের মুসলমানদের পর্যন্তই সীমিত থাকছে না। বরঞ্চ পাকিস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। এখানেও মাওলানার শিষ্য, মুরীদ এবং অনুসারী অনুরক্ত রয়েছেন। কিংবা দীনি বিষয়ে তাঁর প্রতি আস্থাশীল লোকজন রয়েছেন। তাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক মাওলানার এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারে না। আর এইসব দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব যিনিই গ্রহণ করবেন, তার মধ্যে অবশ্যি এ ধারণা পয়দা হবে যে, পাকিস্তানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা একটি ভ্রান্ত কর্মনীতি, বরং মুসলমান অমুসলমানের যৌথ সরকার প্রতিষ্ঠা করাই পাকিস্তানের জন্যে সঠিক কর্মপন্থা। দারুল ইসলাম সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণাই তার মাথায় জেঁকে বসবে। সে অনায়াসে একটি উদার ধর্মহীন রাষ্ট্রকে ইসলামি রাষ্ট্র মনে করে বসবে। অত:পর তার অন্তরে একটি নিরেট ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার ব্যাকুলতা অবশ্যি থাকা খুবই কঠিন হবে। নিকট অতীতের সবগুলো ইসলামি আন্দোলন সম্পর্কেও যে একটি ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত হবে। সে মনে করে নেবে, আমাদের তখনকার সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে

নীতিগতভাবে হিন্দু মুসলমানের এমন একটি যৌথ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যেমনটি প্রতিষ্ঠা করতে চায় পাকিস্তানের কংগ্রেস, আওয়ামী লীগ, রিপাবলিকান এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির লোকেরা। অত:পর এগুলোর চাইতেও ভয়ানক কথা হচ্ছে, যে ব্যক্তির মধ্যেই এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রবেশ করবে, তার পক্ষে এই জটিলতা থেকে রেহাই পাওয়া খুবই দুষ্কর হবে যে, মুসলমান ও অমুসলমান অধ্যুষিত দেশে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সরকার প্রতিষ্ঠা করা যদি সত্যিই সুবিচারের খেলাফ হয়ে থাকে, তবে রসূলুল্লাহ সা. এবং খুলাফায়ে রাশেদীন যে একটি বিশেষ ধর্মীয় পতাকাবাহী দলের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার মজলিশে শূরায় একজনও অমুসলিম ছিলো না, যার কোনো বিচারপতি, গভর্নর, সেনাপতি এবং কর্মকর্তা অমুসলিম ছিলো না, যেখানকার অমুসলিম নাগরিকরা ছিলো জিম্মি ও জিযিয়া করদাতা, যেখানে নিরেট ইসলামি আইন কানুন চালু ছিলো এবং যেখানকার রাষ্ট্র পরিচালনার পলিসি তৈরির ক্ষেত্রে অমুসলিমদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিলো না, অবশেষে কোন যুক্তিতে সেটাকে সুবিচার বলে আখ্যায়িত করা যায়? আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্যে সেটা কি সর্বোত্তম পন্থা ছিলো; নাকি গৌন পন্থা? আমাদের জন্যে সে রাষ্ট্রটি মানদণ্ড হবে, নাকি মুঘল সাম্রাজ্য, মাওলানা (মাদানী) সাহেব তাঁর 'নকশে হায়াতে' যেটাকে বারবার নজীর হিসেবে উল্লেখ করেছেন?

এ বক্তব্যগুলো সম্পর্কেই আপনি চাচ্ছেন, আমি যেনো এগুলোর প্রতিবাদ না করি বরং নিরবতা অবলম্বন করি। আপনার কাছে আমার আবেদন, কোনো একটি নির্জন সময় আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করুন, আমার নিকট আপনার এই দাবি কি বাস্তবিকই হকপ্রিয়তা ও সত্যানুরাগ প্রসূত? এতে দীন ও দীনের কল্যাণের তুলনায় নিজের উস্তাদ এবং নিজের গোষ্ঠী অধিকতর প্রিয় হয়ে বসেনি তো? এর স্বপক্ষে আপনি যেসব যুক্তি ও কারণ পেশ করেছেন, সেগুলোর কোনোটির কোনো মূল্য ও গুরুত্ব আছে বলে আপনি মনে করেন কি?

আপনি বলেছেন, হযরত মাদানীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে এসব বক্তব্য সঠিক হয়নি। কিন্তু আপনার একথা তখনই সঠিক হতো, যদি হযরত মাদানীর ব্যক্তিগত দোষক্রটি নিয়ে আলোচনা হতো। এমনটি যেই করুক না, তাকে তিরস্কার করার ক্ষেত্রে আপনার সাথে আমিও শরীক হবো। কিন্তু দীনি কিংবা সামষ্টিক বিষয়ে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ধ্যান ধারণার উপর আলোচনা না করার পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ নেই। তাঁর অবশ্যি ইন্তেকাল হয়েছে। কিন্তু তাঁর ধ্যান ধারণা তো প্রকাশিত অবস্থায় তপ্ততাজা রয়েছে, থাকবে এবং মানুষের মনের উপর প্রভাব ফেলে যাচ্ছে, যাবে। কোনো ব্যক্তি ইন্তেকাল করে গেছেন কেবল এ কারণেই যদি তাঁর ধ্যান ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা অনুচিত হয়ে থাকে, তবে এ জিনিসটি

শুধুমাত্র মাওলানা হুসাইন আহমদ সাহেবের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হবে? তবে তো কোনো মরে যাওয়া ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের উপরই আলোচনা করা সঠিক হতে পারে না, বরং অতীতের সকল মরে যাওয়া লোকের যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা অবাধে প্রসারিত হতে দেয়াই আমাদের উচিত।

আপনি বলেছেন, প্রশ্নকর্তা তোমার কাছে মাওলানা (মাদানী) মরহুম সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছে, তার জবাব দেয়া তো তোমার দায়িত্ব ছিলো না। তার জবাব দেয়ার কি প্রয়োজন তোমার ছিলো? আমি আপনার কাছে জানতে চাই, যদি মাওলানা মাদানী সাহেব ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা সম্পর্কে পেরেশান হয়ে কেউ আমার কাছে প্রশ্ন করতো আর আমি জবাবে সেইসব ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে তাকে এবং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাকে তা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতাম, তখনো কি আপনি আমাকে একই কথা বলতেন, যা এখন বলছেন? এই প্রশ্নের জবাব আমাকে না দিয়ে আপনার বিবেককেই দিন এবং নিজেই চিন্তা করে দেখুন, এই বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ অবস্থা থেকে ভিন্নতর যে কর্মনীতি আপনি অবলম্বন করছেন, তার পিছে কোন্ আবেগ কাজ করছে? এর পিছে কি আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের প্রশংসিত আবেগ কাজ করছে, না অন্য কোনো আবেগ?

আপনার একটি যুক্তি এই ছিলো যে, হযরত মাদানীর মহব্বত ও মতবাদ সকল ওলামা এবং দীনদার শ্রেণীর অন্তরে একাকার হয়ে আছে। তাই তাঁর ধ্যান ধারণার সমালোচনা তাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ কাজ করা আমার উচিত নয়। কারণ এর ফলে সেই লোকেরা আমার এবং জামায়াতের সহযোগিতা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে।

এর জবাবে আমি সংক্ষেপে কেবল এতটুকু আরজ করাই যথেষ্ট মনে করি যে, আমার এবং জামায়াতে ইসলামির এ কাজকে যে ব্যক্তি আমার এবং জামায়াতের কোনো 'ব্যক্তিগত ব্যবসা' মনে করে এবং অনুগ্রহ হিসেবে এ কাজে সহযোগিতা করছে বলে চিন্তা করে, সে সাংঘাতিক গুনাহের কাজ করে। কারণ দীনের নামে ব্যবসা করা এবং সে কাজে অংশগ্রহণ করা এমন নিকৃষ্ট ব্যবসা, যার চাইতে ক্ষতিকর কাজ আর কিছু হতে পারে না। কোনো ব্যক্তি যদি এই ধারণা নিয়েই আজ পর্যন্ত আমাদের সহযোগিতা করে থাকে, তবে এখন তার তওবা করা উচিত এবং অবিলম্বে এই সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি আমাদের এই কাজকে নিরেট আল্লাহর দীনের কাজ মনে করে আমাদের সহযোগিতা করতে আসে, তবে তার এবং আমাদের মাঝে যে ব্যবহারই হবে, তা হবে খালেছভাবে সত্যপ্রিয়তার ভিত্তিতে।

আমরা তার কাছে সত্যের বিপরীত কিছু দাবি করতে পারি না। আর তিনিও আমাদের কাছে সত্যের বিপরীত কিছু দাবি করতে পারে না। 'পৃথিবীতে অন্য যে

কেউ দীনি ধ্যান ধারণা এবং মূলনীতির খেলাফ কোনো কাজ করবে, তার বিরুদ্ধে আদা জল খেয়ে লাগো, আর আমাদের হযরতগণের কেউ যদি এমনটি করেন তবে মুখ বন্ধ করে থাকো" কেউ যদি এই নীতি গ্রহণ করতে চান, তবে তিনি যেনো মেহেরবানী করে এ নীতির স্বপক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেন। অত:পর কুরআন হাদিস কিংবা সলফে সালেহীনের আদর্শনীতি অনুযায়ী সে দলিল প্রমাণের কোনো মূল্য আছে কিনা আমরা তা চিন্তা করে দেখবো। কিন্তু তার কাছে যদি এর স্বপক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ না থাকে, তবে আমরা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই, তার এরূপ বক্তব্য মেনে নিতে আমরা প্রস্তুত নই। এ ধরনের শর্ত নিয়ে যারা আমাদের সাথে আল্লাহর দীনের কাজ করতে আসেন, তারা আমাদের শক্তি বৃদ্ধির কারণ নন, বরং দুর্বলতা বাড়ানোর উপকরণ। এ ধরনের লোকেরা পৃথিবীতে কখনো সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এরা সবাই একত্রে আমাদের সহযোগিতা বন্ধ করে দিলে আমরা আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করবো।

হযরত মাদানীর বক্তব্যের আমি খুব শক্ত সমালোচনা করেছি বলে আপনি বারবার অভিযোগ করেছেন। আপনি একথাও বলেছেন যে, আমি খুব নিচে নেমে এসেছি। আমি বলবো, নিজের কোনো প্রিয় ব্যক্তির ধ্যান ধারণা খণ্ডন করা হলে ভক্ত অনুরক্তদের মনে কষ্ট লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি কি সত্যি কোনো অন্যায়ের সমালোচনা করেছি? সত্যি কি কোনো বাড়াবাড়ি করেছি? আমার বক্তব্যে সত্য ও ন্যায়ের বিপরীতে কোনো কথা যদি প্রমাণ করে দেয়া হয়, তবে তা সংশোধন করে নিতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবো না।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা ভালভাবে বুঝে নিন। তা হলো, নিজ নিজ বুযর্গদের ব্যাপারে আপনারা শাগরেদরা অবশ্যি শিষ্যসুলভ ভাষাই ব্যবহার করবেন। শিষ্য হিসেবে এমনটি করাই আপনাদের উচিত। কিন্তু আপনাদের উস্তাদ ও বুযর্গদের জন্যে পৃথিবীর সব মানুষের কাছে অনুরূপ শিষ্য ও মুরীদসুলভ বিনয় অবলম্বন করার দাবি আপনারা করতে পারেন না।

আপনি ইশারা ইঙ্গিতে এ ধারণা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন যে, আমি মাওলানা মরহুমের বক্তব্য উদ্ধৃত করা এবং তা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সেই পন্থা অবলম্বন করেছি, যা করেছেন কিছু মৌলভী ছাহেবান আমার গ্রন্থাবলী থেকে বক্তব্য উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে। আপনার এই সাবধানতার পর আমি পুনরায় 'নকশে হায়াত' গ্রন্থটি পড়ে যাচাই করে দেখেছি, কোথাও আমার বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো কিনা? কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, এমন কিছু আমি পাইনি। মরহুমের বক্তব্য উদ্ধৃত করতে গিয়ে কোথাও কোনো বাক্যে আমি রদবদল বা বাড়াবাড়ি করেছি তা যদি স্পষ্টভাবে আমাকে চিহ্নিত করে দেন, তবে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো। কিংবা কোথাও যদি আমি পূর্বাপর অর্থ ও বক্তব্য বিষয়ের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে নতুন ভাব ও

বক্তব্য প্রবেশ করিয়ে থাকি, কিংবা বক্তব্যে নেই এমন কোনো অর্থ গ্রহণ করে থাকি, তবে সেসব ক্ষেত্রে আমার এই একই কথা। এরূপ যেকোনো বাড়াবাড়িই আপনি চিহ্নিত করে দেবেন, তাতে ত্রুটি স্বীকার করা এবং অনুশোচনা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবো না।

আপনি এ ধারণারও প্রকাশ করেছেন যে, আমার প্রতিবাদের ভাষায় প্রতিশোধের আবেগ রয়েছে। এই কুধারণা আপনি করতে চাইলে করুন . কিন্তু আল্লাহর কাছে আমাকে অন্যদের কুধারণার কারণে নয়, বরং নিজের নিয়্যতের জন্যেই জবাবদিহি করতে হবে। আমি মনে করি, দীনের নাম নিয়ে ব্যক্তিগত ভালবাসা ও ঘৃণা, কিংবা ব্যক্তিগত আবেগ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কোনো কথা বলা, কিংবা কাজ করা নিকৃষ্টতম প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি। এ ধরনের কাজ থেকে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন।

আসলে মাওলানা হুসাইন আহমদ সাহেব এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন দেওবন্দের একটি বিশেষ চিন্তাধারার রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে আমি বহু বছর থেকে লক্ষ্য করে আসছি। আমি সব সময় পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে তাদের সেই বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে ভ্রান্ত মনে করে আসছি এবং বলে আসছি। এ গোষ্ঠী তাঁদের এই রাজনীতির সমর্থনে ইসলাম এবং ইসলামের ইতিহাসের যেসব বিস্ময়কর ব্যাখ্যা করে আসছে, আমার মতে তা একান্তই ভ্রান্ত এবং দীন ও দীনদারদের জন্যে সাংঘাতিক ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে আমার নিশ্চিত, ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করা এবং সংশয়হীন মত হলো, ইংরেজ আমলে স্যার সৈয়দ আহমদ ও তার চিন্তা দর্শনের অনুসারীরা যে ভূমিকা পালন করেছিল, দুর্ভাগ্যবশত এ হিন্দু শাসনামলে একই ভূমিকা পালন করছেন দেওবন্দের হুসাইন আহমদ চিন্তা দর্শনের অনুসারীরা। আমার এ চিন্তার ভিত্তি কেবল 'নকশে হায়াত' গ্রন্থের কয়েকটি বাক্যই নয়, বরঞ্চ তাদের এই চিন্তা পরিমণ্ডলের যাবতীয় কার্যক্রম, যা বিগত পনের বিশ বছর কাল থেকে প্রকাশ হয়ে আসছে।

আপনি মাওলানার কোনো কোনো ভক্ত অনুরক্তের এই মতও উল্লেখ করেছেন যে, 'প্রশ্নকর্তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং তা এজন্যে করা হয়েছে, যাতে করে এ ধরনের জবাব প্রকাশ করার সুযোগ বের করা যায়।" অন্যকথায় তাদের মতের সোজা অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সেই বাক্যগুলো সম্পর্কে আসলে আমাকে কেউ কোনো পত্রই লেখেনি বরং আমি নিজেই মাওলানা হুসাইন আহমদ সাহেবের রহ. উপর হামলা করতে চেয়েছি এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একটা কৃত্রিম চিঠি তৈরি করে নিয়েছি। বাস্তব ব্যাপারতো হলো, মূল চিঠি তরজমানুল কুরআন পত্রিকার অফিসেই সংরক্ষিত রয়েছে। পত্রলেখক ভারতেই জীবিত রয়েছেন। আপনারা যখন ইচ্ছে এসে সেই চিঠি দেখে নিতে পারেন এবং পত্র লেখকের সাথে যোগাযোগ করে তা সত্যায়িতও করে নিতে পারেন। কিন্তু এই যে ধারণাটা করা

হলো, তার নৈতিক দিকটা চিন্তা করে দেখেছেন কি? যারা নিশ্চিন্তে এই কাহিনী রচনা করে ফেললেন, তারা যেনো নিজেদের এই দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে একটু চিন্তা করে দেখেন, মাওলানা (মাদানী) মরহুমের ফয়েজ ও মুহব্বত লাভ করে তারা এটা কোন ধরনের আত্মশুদ্ধি আর নৈতিকতা লাভ করলেন? নিজ চিন্তা বলয়ের লোকদের ব্যাপারে তো তাদের অনুভূতি এতোই নাজুক যে, তাদের সুস্পষ্ট ভ্রান্তিরও যদি কেউ সমালোচনা করে, তারা কিছুতেই তা বরদাশত করতে প্রস্তুত হয় না। কিন্তু তাদের মতে অন্যদের দীন ও চরিত্রের উপর হামলা করা সম্পূর্ণ বৈধ। এমনকি অন্যের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অপবাদ রচনা করতেও তাদের কোনো বাঁধা নেই। এ প্রসংগে আমি শুধু এতোটুকুই বলবো, আল্লাহ তায়ালা এইসব লোককে সেই প্রকৃত তাকওয়া দান করুন, যার ভিত্তিতে মানুষ মুখ থেকে কোনো অন্যায় কথা বের করার আগেই চিন্তা করে নেয় যে, এর জন্যে সে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবে? *(তরজমানুল কুরআন, জিলহজ্জ ১৩৭৭ হি., জুলাই ১৯৫৮ খৃ.)*

নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নে গণভোট

প্রশ্ন : নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নে জামায়াতে ইসলামি গণভোট অনুষ্ঠানের যে প্রস্তাব দিয়েছিল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন রকমের আপত্তি তোলা হয়েছে। আমি সে সব আপত্তির সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরে আপনার কাছে জানতে চাই যে, আপনার নিকট এ সব আপত্তির জবাব কি?

১. পৃথক নির্বাচন যদি ইসলাম ও শরিয়তের বিধান ও মৌল আদর্শের অপরিহার্য দাবি হয়ে থাকে, তাহলে তার ব্যাপারে জনগণের রায় নেওয়ার অর্থটা কি? এভাবে কি ভবিষ্যতে নামায রোযা সম্পর্কেও জনগণের মতামত নেয়া হবে? আপনি কি এই নীতি চালু করতে চান যে, জনগণের অধিকাংশ যাকে হক বলবে সেটা হক, আর যেটাকে বাতিল বলবে সেটা বাতিল? ধরুন, গণভোটে অধিকাংশের রায় যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে পাওয়া গেলো। তাহলে কি আপনি তাকে সঠিক বলে মেনে নেবেন এবং তারপর কি পৃথক নির্বাচনকে আর ইসলামি আদর্শ ও মূলনীতির দাবি বলা হবেনা?

২. আসলে তো পৃথক ও যুক্ত উভয় পদ্ধতিই অনৈসলামি। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে আইন অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্বই নীতিগতভাবে ভ্রান্ত। আপনি যখন পৃথক নির্বাচনের দাবি জানান, তখন তার অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, আপনি ইসলামি রাষ্ট্রের মজলিসে শূরাতে অমুসলিমের অংশগ্রহণের নীতি মেনে নিলেন?

৩. জনমত যাচাই এর প্রস্তাব দিয়ে আপনি নির্বাচন পদ্ধতিকে এরূপ একটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন যে, হয়তো জনগণের রায় যুক্ত নির্বাচনের পক্ষেই যাবে। আপনার কাছে এ ব্যাপারে কি গ্যারান্টি আছে যে, এর ফল অবশ্যই পৃথক নির্বাচনের পক্ষে হবে?

৪. আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, আপনি যুক্ত নির্বাচনের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন পদ্ধতির ফায়সালা যুক্ত জনমত যাচাই এর মাধ্যমে করাতে প্রস্তুত। প্রস্তাবিত গণভোট তো যুক্তভাবেই হবে।

৫. আপনারা নির্বাচন পদ্ধতির ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠানের পরিবর্তে আগামী সাধারণ নির্বাচনে এই ইস্যুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না কেন? জনগণ যদি পৃথক নির্বাচনের সমর্থক হয়ে থাকে তবে তারা এই নির্বাচন পদ্ধতির সমর্থকদেরকেই ভোট দেবে এভাবে এ সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে।

৬. বর্তমান শাসনতন্ত্রে গণভোটের কোনো অবকাশ নেই। এ জন্য প্রথমে জাতীয় পরিষদে এ উদ্দেশ্যে শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী পাস করা অপরিহার্য হবে। আর সংশোধনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হবেই। প্রশ্ন এই যে, যুক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি পাল্টানোর জন্য যখন মামুলী সংখ্যাগরিষ্ঠতাই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন গণভোটের পক্ষে শাসনতন্ত্র সংশোধন করতে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরষ্ঠিতা কোত্থেকে সংগ্রহ করা যাবে?

৭. সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর নিষ্পত্তি করার পরিবর্তে পার্লামেন্ট বা প্রতিনিধি পরিষদকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সরাসরি জনগণের মতামত নিয়ে সমস্যাবলীর নিষ্পত্তি করাতে বহু রকমের অসুবিধা দেখা দিয়ে থাকে। এজন্য এ পদ্ধতি গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে গৃহীত হয়নি।

গণভোটের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে সব আপত্তির কথা আমি শুনেছি বা পড়েছি, উপরোক্ত আপত্তিগুলো তার মধ্যে সর্বপ্রধান। এগুলোর দ্বারা না হোক, মানুষের মনে গণভোটের ব্যাপারে একটা সন্দেহ বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি যে না হয়ে পারে না, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য আপনি এ সবের নিরসন করে জনগণকে এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত করলে ভালো হয়।

জবাব : ১. পয়লা আপত্তিটা যারা তুলেছেন, তারা বোধ হয় জানেন না যে, পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত ইসলামি শরিয়তের বিধি ও মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরঞ্চ তা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে রীতি সংখ্যাগরিষ্ঠকেই চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়ে থাকে। ইসলামি বিধানের আলোকে যা সঠিক হবে সেটাই দেশের আইন হবে এটাই যদি স্থির করা হতো, তাহলে আর ভাবনাটা ছিলো কিসের? তখন শুধু এ সমস্যা কেন, কোনো সমস্যাই ইসলামি বিধান মোতাবেক সমাধান করে নিতে কোনো অসুবিধা হতো না। শরিয়তের উৎস থেকে যে সমস্যার ব্যাপারেই যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে কোনো বিধি স্থির করে দেয়া হতো, সেটা স্বতসিদ্ধভাবেই আইনে পরিণত হতো এবং তার বিরুদ্ধে যে আইনই থাক. আপনা থেকেই রহিত হয়ে যেতো। কিন্তু বর্তমানে সেই পরিস্থিতি যে এখানে

বাস্তবিকপক্ষে বিরাজমান নেই, সে কথা কি কারো অজানা? আপনার চোখের সামনেই তো জাতীয় পরিষদ যুক্ত নির্বাচনের আইন পাস করলো এবং সেটা দেশের আইন হিসেবে চালু হয়ে গেলো। এখন এই আইনকে বদলাতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই বদলানো সম্ভব। নচেৎ সকল আলেম মিলিত হয়েও যদি সর্বসম্মত ফতোয়া দেন যে, যুক্ত নির্বাচন ইসলাম বিরোধী, তবুও আইন যেমন ছিলো তেমনই বহাল থেকে যাবে। এমতাবস্থায় অনর্থক কাল্পনিক কথাবার্তা বলে কি লাভ? আপনি যদি নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রচলিত অনৈসলামি নীতি সত্যিই পাল্টাতে চান, তাহলে সে জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় যে কর্মপন্থা যথার্থ কার্যোপযোগী ও কার্যকর হতে পারে সেই কর্মপন্থা অবলম্বন করুন। অন্যথায় আপনি যতোই যুক্তি প্রমাণের স্তূপ লাগাতে থাকুন, তাতে কোনো লাভ হবে না, নির্বাচন যুক্তভাবেই হতে থাকবে।

ভবিষ্যতে নামায রোযার ব্যাপারে গণভোট হবে কিনা জিজ্ঞাসা করা আরো একটা অজ্ঞতার প্রমাণ। এ কথা যারা জিজ্ঞাসা করেন তারা জানেন না যে, এখানে আজ নামায রোযার যে স্বাধীনতা রয়েছে তা এজন্য দেওয়া হয়নি যে, এগুলো শরিয়তের নির্দেশ বলে অবশ্য পালনীয়। বরং শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করতে গিয়ে জনগণকে নিজ নিজ ধর্মমতে উপাসনা করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, সে অনুসারেই এ স্বাধীনতা। তা না হলে দেশের আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নামায রোযার বিধিতেও রদবদল করার ক্ষমতা ছিলো। আর আইনসভার পাস করা এ ধরনের আইন-কানুন থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য জনগণকে হয় বিদ্রোহ করতে হতো, নচেৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা বাতিল করানোর জন্য গণভোটের দাবি জানাতে হতো। এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলোনা।

প্রকৃতপক্ষে আইনসভার সিদ্ধান্ত এবং গণভোটের রায়ের মধ্যে কোনো নীতিগত পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু পদ্ধতির। এ জায়গায় আইনসভার সদস্যদের অধিকাংশের মতে ফায়সালা হয়, আর অপর জায়গায় ফায়সালা হয় দেশের জনসাধারণের অধিকাংশের রায়ের ভিত্তিতে। যারা আইনসভার ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর আইন প্রণয়নের অধিকার মেনে নিয়েছে, তারা জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতার কথা শুনলেই হৈ চৈ শুরু করে এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।

গণভোট সম্পর্কে এ কথাও তাদের জানা নেই যে, হক ও বাতিলের ফায়সালা করার জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয় না, বরং দেশের আইন কোনটা হবে আর কোনটা হবে না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমরা যেটাকে বাতিল তথা অন্যায় মনে করি, গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় যদি তার

পক্ষে যায়, তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, আমরা সেটাকে হক বা ন্যায় বলে মেনে নেবো। তার অর্থ শুধু এতটুকুই যে, অধিকাংশ জনগণ যে জিনিসের সমর্থনে রায় দিয়েছে, সেটাই দেশের আইন বলে স্বীকৃত হবে। এ ধরনের রায় ঘোষিত হওয়ার পরও আমাদের অধিকার থাকবে ওটাকে অন্যায় বলার, তার অন্যায় হওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করার, তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার এবং শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকেই আবার তাদের রায় পরিবর্তনে সম্মত করার। আজকাল সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে দেশের আইন সভায় যে সব আইন তৈরি হচ্ছে তার একটাও এমন নয় যে, সংসদীয় সংখ্যালঘুরা তাকে ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের মতামতকে ভুল বলে স্বীকার করেছে।

২. দ্বিতীয় আপত্তিটা যারা তুলেছে, তারাও এক অদ্ভুত অবস্থান নিয়েছে। শাসনতন্ত্রে যখন অমুসলিমদেরকে প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হয় তখন তারা নীরব ছিলো। যখন যুক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত আইন পাস করা হলো, তখনও তারা নির্বিকার বসে থাকলো। আজও অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার শাসনতন্ত্র থেকে রহিত করানোর জন্য তারা কোনো আন্দোলন করছে না। অথচ পৃথক নির্বাচনের দাবি তুললেই ঐ কথাটা তাদের তীব্রভাবে মনে পড়ে যায়। এ থেকে এটা বেশ পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আসলে তারা নিজেদের বিশেষ নেতৃবৃন্দের অনুকরণে মুসলিম ও অমুসলিম সংযুক্ত জাতীয়তার পক্ষপাতী। কোনো না কোনোভাবে এখানে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু হয়ে যাক, এটাই তারা চায়। অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার অস্বীকার করা নিছক বাহানা ছাড়া কিছু নয়। এ বাহানাকে তারা নিজেদের মতলব সিদ্ধির কাজে লাগাতে চায়। তা না হলে তাদের সেই নেতৃবৃন্দ যারা ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সমর্থন দিয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে তাদের মতামত কি, আমি জানতে চাই।

এবার তাদের মূল আপত্তির জবাব দিচ্ছি। এর জবাব এই যে, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্ত নির্বাচন ও পৃথক নির্বাচন কখনো এক কথা নয়। যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তি যে তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তা এই যে, একটা দেশের সকল অধিবাসী একই জাতি চাই তারা মুসলমান, হিন্দু, খৃস্টান বা অগ্নিউপাসক, যাই হোক না কেন। এ মতবাদে দেশের সরকারকে ঐ যুক্ত জাতির যৌথ সরকার বলে বিশ্বাস করা হয় এবং ধর্মমত নির্বিশেষে যারা ঐ জাতির সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রতিনিধি, তাদেরই সরকার পরিচালনার যোগ্য মনে করা হয়। এ মতবাদ ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণারই মূলোচ্ছেদ করে। এর ভিত্তিতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, তা একেবারেই ধর্মহীন হতে বাধ্য। এতে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম একই স্তরে নেমে আসে। কোনো ধর্মেরই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না। এ সরকারের আইনসভায় যারা নির্বাচিত হয়ে আসবে তারা ব্যক্তিগতভাবে চাই হিন্দু,

মুসলমান বা খৃস্টান হোক, প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে তারা কেবল 'পাকিস্তানী জাতি'র প্রতিনিধি হবে এবং তাদের কোনো ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কিছু বলার এখতিয়ার থাকবে না। এরপর বর্তমান সংবিধানে যে ইসলামি ধারাগুলো রয়েছে তাও বহাল থাকতে পারবে না পুরোপুরিভাবে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার আশা করা তো বাতুলতা মাত্র। তা হলে কোনো বিবেক সম্পন্ন মানুষ কি এই তত্ত্বকে এবং পৃথক নির্বাচনের তত্ত্বকে সমমর্যাদার অধিকার বলতে পারে? পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে ধর্মকে জাতীয়তার ভিত্তি নির্দেশ করা হয় এবং তাতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা বজায় থাকে। এতে মুসলিম প্রতিনিধিরা কেবল মুসলিম ভোটে নির্বাচিত হবে এবং তারা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখার ক্ষমতা লাভ করবেন। এ সব প্রতিনিধির সংখ্যাগুরু অংশ যদি ইসলামি মানসিকতা সম্পন্ন হয়, তাহলে তারা বর্তমান শাসনতন্ত্রের প্রদত্ত ক্ষমতা ও সুবিধা প্রয়োগ করে শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করতে পারবে। সেক্ষেত্রে খোদ সংবিধানকেই পাল্টিয়ে পুরোপুরি ইসলামি সংবিধানে রূপান্তরিত করার একটা অবকাশ সব সময়ই থেকে যাবে। এ ব্যবস্থায় বড় জোর এতটুকু খুঁত থাকে যে, এর অধীনে অমুসলিম প্রতিনিধিরাও আইন প্রণয়ন ও সরকার পরিচালনার অংশীদার হবে। শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিটা যদি ইসলামের উপর বহাল থাকে, তবে এ অসুবিধা কোনো না কোনোভাবে কাটিয়ে ওঠা যাবে। কিন্তু যুক্ত জাতীয়তার তত্ত্ব বাস্তবায়িত হলে তো আদৌ সেই ভিত্তিই বহাল থাকবে না।

৩. তৃতীয় আপত্তিটা নিছক একটা কাল্পনিক জুজু ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সমগ্র পাকিস্তানে যদি নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তবে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে রায় হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগও নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের কথাই ধরা যাক। এখানে সাধারণ মানুষ ও প্রভাবশালী মানুষ নির্বিশেষে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে যুক্ত নির্বাচনের কট্টর বিরোধী তা কারো অজানা নয়। এমন কি যাদের কারণে এ অভিশপ্ত তত্ত্ব পাকিস্তানে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে, তাদেরকেও এ অঞ্চলে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হয়। এরপর ধরুন পূর্ব পাকিস্তানের কথা। আমার নিজের অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ থেকে বলতে পারি যে, সেখানে মুসলমানদের মত অন্ততপক্ষে শতকরা ৯০ ভাগ পৃথক নির্বাচনের পক্ষে। আজকাল তো সেখানে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, শিক্ষিত শ্রেণীরও সংখ্যাগুরু অংশ যুক্ত নির্বাচনের বিরোধী হয়ে গেছে। এ জন্যই যেসব মতলববাজ রাজনৈতিক নেতা নিছক গদীর নেশায় মত্ত হয়ে আঁতাত করে এই অভিশপ্ত নির্বাচন পদ্ধতিকে চালু করেছে, তারা গণভোটের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে। কেননা গণভোটের ফল কি দাঁড়াবে, তা তাদের জানা আছে। নচেৎ গণভোটে জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনাও যদি তাদের থাকতো, তাহলে তারা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ভয় পেতোনা।

৪. চতুর্থ আপত্তি যারা তুলেছে, তারা সম্ভবত এই ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত রয়েছে যে, এখানে অমুসলিমদের ভোটাধিকার ছিলো না, এখন আমরাই গণভোটে তাদের মতামতও গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছি। অথচ প্রকৃত পক্ষে দেশের শাসনতন্ত্রে অনেক আগেই তাদেরকে এ অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর প্রচলিত সংবিধানের অধীনে যে কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই গণভোট হোক না কেন, তা থেকে তাদেরকে দূরে রাখা সম্ভব হবে না।

৫. নির্বাচন পদ্ধতি কি হবে তা যদি নির্বাচনের আগেই স্থির করা না হয়, তাহলে দেশের প্রথম নির্বাচন যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতেই হতে হবে এবং সেই নির্বাচনের পরেই হয়তো নির্বাচন পদ্ধতি পাল্টানো যাবে। কিন্তু তার সুফল পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিফলিত হবার সুযোগ পাবে না। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচন এলাকাগুলোর পর্যালোচনা করে আমরা অকাট্য পরিসংখ্যান মারফত দেখিয়ে দিয়েছি যে, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে যে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তার বদৌলতে সেখানে বাঙালী জাতীয়তাবাদের নেশায় যারা মত্ত ও যুক্তবাংলার স্বপ্নে যারা এখনো বিভোর, তারাই বিপুল সংখ্যায় নির্বাচিত হয়ে আসবে। এসব লোক সেখানে একবার শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পেলে দ্বিতীয় নির্বাচনের সুযোগ আসার আগেই কয়েক বছরের মধ্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও ঐক্যের উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনে বসবে। এই আশংকার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা নির্বাচনের আগেই গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতি কি হবে তার ফায়সালা করে নিতে চাই, যাতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনটাই পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের পথ সুগম হয়। যারা এ আংশকাকে বরদাশত করতে প্রস্তুত, তারা যদি গণভোটের বিরোধিতা করে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ সুগম করতে চান, তারা অবাধে তা করতে পারেন। তবে যারা এর বিপজ্জনক পরিণতি উপলব্ধি করেন এবং উপলব্ধি করা সত্ত্বেও গণভোটের বিরোধিতা করেন, তাদের মানসিকতা আমার কাছে দুর্বোধ্য।

৬. ষষ্ঠ আপত্তি শাসনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতারই পরিচায়ক বলে আমার মনে হয়। নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য সংবিধানের কোনো সংশোধনের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা সংবিধানের কোনো ধারা এই বিশেষ সমস্যা অথবা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে গণভোট অনুষ্ঠানের পথে অন্তরায় নয় যে, তা সংশোধন না করে এ কাজটা করা যাবে না। সংবিধান নির্বাচন পদ্ধতির বিতর্ক নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদকে মাত্র একবার বাধ্য করেছিল প্রাদেশিক পরিষদগুলোর রায় গ্রহণ করতে। সে শর্ত পূরণ হয়েছে। এই বাধ্যবাধকতার দাবি পূরণ হওয়ার পর এখন আর আইন পরিষদের উপর কোনো কড়াকড়ি নেই, যা দূর করার জন্য কোনো

সাংবিধানিক সংশোধনীর প্রয়োজন পড়তে পারে। এই কড়াকড়ির ব্যাপারে কোনো রকম ইনিয়ে বিনিয়েও এ রকম ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় যে, জাতীয় পরিষদ উভয় প্রাদেশিক পরিষদের মতামত যাচাই করা ছাড়াও যদি অন্য কোনো পন্থায়ও জনমত যাচাই করার প্রয়োজন অনুভব করে, তবে সংবিধান সেপথে অন্তরায়। তাই এই আইন পরিষদ যখন খুশি, গণভোট অনুষ্ঠানের নিমিত্ত মামুলী সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারাই একটা আইন পাস করতে পারে।

৭. সপ্তম আপত্তি প্রসঙ্গে মূলত এ কথাটাই ভুল বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে সাধারণভাবে গণভোটের প্রচলন নেই। শুধুমাত্র বৃটিশ গণতন্ত্রের অন্ধ অনুকরণকারী অথবা ফরাসি ধাঁচের গণতন্ত্রের তল্পিবাহী দেশগুলোর ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। এ ছাড়া অন্যান্য দেশে এ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সুইজারল্যান্ড তো গণভোটের জন্য প্রসিদ্ধই। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড এবং আইরিশ প্রজাতন্ত্রের সংবিধানেও এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারা সন্নিবেশিত রয়েছে। ১৯১০ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় ১২ বার এবং ১৯১১ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডে ৬ বার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। কানাডাতেও বেশ কয়েকবার শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে গণভোট হয়েছে। স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত সমস্যাবলীর নিষ্পত্তির জন্য এসব দেশে গণভোট প্রচুর পরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইউরোপে অস্ট্রিয়া, জার্মানি, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার গণতান্ত্রিক সংবিধানে গণভোট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটো অঙ্গরাজ্য ছাড়া বাদবাকী সবক'টি রাজ্যে সাংবিধানিক প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানের রীতি চালু রয়েছে। এমনকি ১৪টি রাজ্যে সাধারণ আইনগত ব্যাপারেও গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে সাধারণভাবে সংসদ অথবা প্রতিনিধি পরিষদকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ও নিরংকুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং জনগণকে আইন প্রণয়ন অথবা তা রদবদলের সকল ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, এ কথা বলা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

এরপর যে কথাটা বিচার বিবেচনার দাবি রাখে তা হলো, জনগণকে দিয়ে বিতর্কিত বিষয়ের নিষ্পত্তি করানোতে অনেক বিপত্তি দেখা দেয়। তাই গণতান্ত্রিক দেশে এ রীতি তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। মূলত এটাও একটা অজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য। প্রকৃত ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতিনিধি পরিষদকে চূড়ান্ত ও নিরংকুশ ক্ষমতা দেওয়াতেই কিছু অসুবিধা নিহিত রয়েছে। আর এগুলোর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পর গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে গণভোট প্রথা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এ প্রথার সূচনা হয়। জনৈক সংবিধান বিশেষজ্ঞের ভাষায় এর কারণ ছিলো নিম্নরূপ

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনগণ কর্তৃক সরাসরি আইন প্রণয়নের প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, জনগণ নিজ নিজ রাজ্যের আইনসভার সদস্যদের কর্মতৎপরতায় অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। নির্ভরযোগ্য নেতৃত্বের অভাব, বিশেষ স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীর আইনসভা সদস্যদের সাথে দহরম মহরম পাতিয়ে তাদের মতামতকে প্রভাবিত করা এবং কতিপয় বড় বড় রাজনৈতিক একচেটিয়াবাদী গোষ্ঠীকর্তৃক যখন তখন আইনসভাগুলোর উপর চড়াও হওয়া, ইত্যাকার উপদ্রব দেখতে দেখতে উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে জনগণ নিজ নিজ রাজ্যের আইনসভাগুলোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। জনগণ মনে করলো যে, আমরা যদি প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়নের কাজ সমাধা করি, তাহলে আর যাই হোক, আইনসভার চেয়ে খারাপ তৎপরতা দেখাবো না, বরঞ্চ হয়তো তার চেয়ে ভালো করেই দেখতে পারবো। তাই তারা আইন রচনা এবং আইনসভার রচিত আইন রদ করার ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করে। প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন ব্যাপারে এরূপ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না, বরং যখন অন্য কোনো উপায়ে ইপ্সিত ফল অর্জিত না হয়, কেবল তখই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবে এটাই ছিলো তাদের অভিপ্রায়। *(এনসাইক্লোপেডিয়া অব সোসাল সায়েন্সেজ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫১)*

আমাদের দেশে এই সর্বশেষ কর্মপন্থাটি অবলম্বনের প্রয়োজন যে আমেরিকা এবং দুনিয়ার অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় বেশি, তা চোখ মেলে তাকালেই বুঝা যায়। যে দেশে প্রকাশ্যে জাল, জোচ্চুরি, ভোটডাকাতি ও টাকার বিনিময়ে কিছু লোক জোরপূর্বক সংসদের সদস্য হয়ে যায়। যেখানে প্রভাবশালী লোকেরা চোরা গলি দিয়ে আইনসভায় প্রবেশ করে, যেখানে আঁতাত ও যোগসাজশের মাধ্যমে নিছক গোষ্ঠীবিশেষকে ক্ষমতায় বহাল রাখার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কালা কানুন প্রণয়ন করা হয় এবং যেখানে দেশব্যাপী গণবিক্ষোভকে উপেক্ষা করে আইন রচনার একক ক্ষমতাধারীরা চরম স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যায়, সেখানে জনগণের জন্য এই সব দুর্নীতিবাজ আইন প্রণেতাদের অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি লাভের এ পথটা অবশ্যই উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন, যাতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভকে তোয়াক্কা না করে যে আইন রচিত হয়েছে, তা তারা গণভোটের মাধ্যমে পাল্টাতে পারে। আমার বুঝে আসে না যে, গণতন্ত্রের দাবিতে যারা সর্বদা সোচ্চার, তারা কোন মুখে এ কথা বলতে পারেন যে, অবৈধ পন্থায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদেরকে কয়েক বছরের জন্য দেশের শাসন ক্ষমতার একক ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব দেওয়া হোক এবং তারা নিজেদের মতলব সিদ্ধির জন্য যতো অন্যায় আইনই তৈরি করুক, জনগণের হাতে তা রদবদল করার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। *(তরজমানুল কুরআন, শাবান ১৩৭৭ হি. মে ১৯৫৮ খৃ.)*

ইসলামি রাষ্ট্র ও খিলাফত প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন

[জনৈক জার্মান ছাত্র ইসলামি রাষ্ট্র ও খিলাফত সম্পর্কিত কতিপয় সমস্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার উদ্দেশ্যে এ প্রশ্নগুলি করেন। আসল প্রশ্নগুলো ছিলো ইংরেজিতে। নিচে তার অনুবাদ দেয়া হলো।]

প্রশ্ন :

এক. ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানের জন্যে কি শুধুমাত্র 'খলিফা' শব্দটিই ব্যবহার করা যেতে পারে?

দুই. উমাইয়া খলিফাদেরকে কি সঠিক অর্থে খলিফা বলা যেতে পারে?

তিন. আব্বাসীয় খলিফাগণ বিশেষ করে আল মামুন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

চার. হযরত ইমাম হাসান রা. হযরত ইমাম হুসাইন রা. ও হযরত ইবনে যুবাইরের রা. রাজনৈতিক কার্যক্রমকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন? আপনার মতে ৬৮০ হিজরীতে মিল্লাতে ইসলামিয়ার আসল নেতা কে ছিলো, হুসাইন না ইয়াযীদ?

পাঁচ. ইসলামি রাষ্ট্রে খুরুজ (বিদ্রোহ) কি একটি সৎকর্ম গণ্য হতে পারে?

ছয়. খুরুজকারীরা যদি মসজিদ বা অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহে (যেমন কাবা ও হারাম শরীফ) আশ্রয় নেয়, তাহলে এ অবস্থায় ইসলামি রাষ্ট্র তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে?

সাত. ইসলামি রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী তার নাগরিকদের কাছ থেকে কোন ধরনের কর আদায় করতে পারে?

আট. কোনো খলিফা কি এমন কোনো কাজ করতে পারে, যা পূর্ববর্তী খলিফাদের কার্যক্রম থেকে ভিন্নতর?

নয়. গভর্নর ও শাসক হিসেবে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

দশ. ইসলামি রাষ্ট্র কি এমন কোনো কর আরোপ করার অধিকার রাখে, যা কুরআন ও সুন্নাহে উল্লিখিত হয়নি এবং পূর্ববর্তী খলিফাদের আমলেও যার কোনো নজির নেই?

জবাব : আপনি যে প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছেন তার বিস্তারিত জবাব দিতে গেলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন, আর সে সময় আমার নেই। তাই এগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

এক. ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানের জন্য 'খলিফা' শব্দটি এমন কোনো অপরিহার্য পারিভাষিক শব্দ নয় যে, এছাড়া অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। আমীর, ইমাম, সুলতান ইত্যাদি শব্দগুলিও হাদিস, ফিকহ, কালাম ও ইসলামের ইতিহাসে বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু নীতিগতভাবে যে জিনিসটির প্রয়োজন তা হলো, রাষ্ট্রের ভিত্তি খিলাফতের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। একটি সঠিক ইসলামি রাষ্ট্র কখনো রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র হতে পারে না। আবার তা এমন কোনো গণতন্ত্রও হতে পারে না, যা জনগণের সার্বভৌমত্বের (Popular

Sovereignty) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বিপরীত পক্ষে, একমাত্র সেই রাষ্ট্রকেই ইসলামি রাষ্ট্র বলা যেতে পারে, যে রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শরিয়তকে শ্রেষ্ঠ আইন এবং আইনের প্রধান ও প্রথম উৎস বলে মেনে নেয় এবং আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে কাজ করার স্বীকৃতি দেয়। এই রাষ্ট্রে কর্তৃত্বশালীদের কর্তৃত্ব লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর বিধানের পুনরুজ্জীবন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অসৎ বৃত্তির উৎসাদন ও সৎবৃত্তির বিকাশ সাধন। এই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নয়, বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব ও তাঁর আমানত। এটিই হচ্ছে খিলাফত।

দুই. উমাইয়া শাসকদের সরকার আসলে খিলাফত ছিলো না। যদিও ইসলামই ছিলো তাদের সরকারের আইন, কিন্তু শাসনতন্ত্রের অনেকগুলো ইসলামি ধারাকে তারা নাকচ করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও তাদের সরকারের প্রাণসত্তা ইসলামের প্রাণসত্তা থেকে বেশ দূরে সরে গিয়েছিল। তাদের শাসনকালের প্রথম দিকেই এ বিষয়টি অনুধাবন করা হয়েছিল। তাই এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মুআবীয়া রা. নিজেই বলেন, 'আনা আউয়ালুল মুল্ক'। (অর্থাৎ আমি সর্বপ্রথম বাদশাহ)। আর যে সময় আমীর মু'আবীয়া রা. তাঁর ছেলেকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন, তখনই হযরত আবু বকরের রা. পুত্র আবদুর রহমান রা. উঠে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'এতো রোমের কায়সারদের পদ্ধতিই হলো, কায়সার মরে গেলে তার পুত্রই কায়সার হয়।'

তিন. নীতিগতভাবে আব্বাসীয় খলিফাদের অবস্থানও বনী উমাইয়াদের মতোই। পার্থক্য শুধু এতটুকু, উমাইয়া খলিফারা দীনের ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন (indifferent), বিপরীতপক্ষে আব্বাসীয় খলিফারা নিজেদের ধর্মীয় খিলাফত ও আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য দীনের ব্যাপারে ইতিবাচক আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তাদের এ আগ্রহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীনের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। যেমন মামুনের আগ্রহ এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যার ফলে তিনি দর্শনের একটি বিষয়, যা আসলে দীনের বিষয় ছিলো না, তাকে অনর্থক দীনের বিষয়ে পরিণত করেন। দীনের একটি আকীদারূপে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং সরকারি ক্ষমতাবলে জোর করে মুসলমানদের কাছ থেকে তার সপক্ষে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য অমানুষিক যুলুম নির্যাতন চালান।

চার. যে যুগ সম্পর্কে এ প্রশ্নটি করা হয়েছে সেটি ছিলো আসলে ফিতনার যুগ। সে সময় মুসলমানরা মারাত্মক মানসিক নৈরাজ্যের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। সে সময় কার্যত মুসলমানদের আসল নেতা কে ছিলো একথা বলা বড় কঠিন। কিন্তু একথা দিবালোকের মতো সত্য, ইয়াযীদের যা কিছু রাজনৈতিক প্রভাব ছিলো

তার মূল ভিত্তি ছিলো মাত্র একটি, তার হাতে ছিলো ক্ষমতার চাবিকাঠি। তার পিতা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করে তাকে সেই রাষ্ট্রের শাসক বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি যদি এভাবে সাজানো না হতো এবং ইয়াযীদ সাধারণ মুসলমানদের কাতারে থাকতো, তাহলে সম্ভবত নেতৃত্বের আসনে বসবার জন্য মুসলমানদের সর্বশেষ দৃষ্টি তার উপর পড়তো। বিপরীতপক্ষে হুসাইন ইবনে আলী রা. সে সময় উম্মতের সুপরিচিত ও সর্বজন সমাদৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং কোনো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সম্ভবত মুসলিম জনতার সর্বাধিক ভোট তিনিই লাভ করতেন।

পাঁচ. কোনো সৎ ও ইনসাফ ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকলে যালেম শাসকদের মুকাবিলায় খুরুজ বা বিদ্রোহ করা কেবল বৈধই নয়, ফরযও। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফার রহ. মতামত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আবু বকর জাস্‌সাদ তাঁর 'আহকামুল কুরআন' এবং আল মুওয়াফফিকুল মালিকী তাঁর 'মানাকিবে আবু হানিফা' গ্রন্থে এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর মুকাবিলায় একটি সৎ ও ইনসাফ ভিত্তিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একটি বিরাট গুনাহ্। এই ধরনের বিদ্রোহ দমন করার ব্যাপারে সরকারের সাথে সহযোগিতা করা সমস্ত মুমিন সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য। মাঝামাঝি অবস্থায় যখন সরকার ন্যায়নিষ্ঠ নয়, কিন্তু অন্যদিকে সৎ ব্যক্তিদের বিপ্লবের সম্ভাবনাও সুস্পষ্টও নয়, এক্ষেত্রে অবস্থা সংশয়িত হয়ে যায়। ফিক্‌হ এর ইমামগণ এ অবস্থায় বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউ এ অবস্থায় কেবল হক কথা বলে দেয়াটাই যথেষ্ট মনে করেছেন, কিন্তু বিদ্রোহকেও বৈধ গণ্য করেছেন। অনেকে বিদ্রোহ বৈধ করেছেন এবং শাহাদত বরণ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবার অনেকে সংশোধনের আশায় সরকারের সাথে সহযোগিতাও করেছেন।

ছয়. ন্যায়নিষ্ঠ সরকারের মুকাবিলায় যারা বিদ্রোহ করে তারা যদি মসজিদে আশ্রয় নেয়, তাহলে তাদেরকে অবরোধ করা যেতে পারে। যদি তারা ভেতর থেকে গোলাবর্ষণ করে, তাহলে তাদের জবাবে গোলাবর্ষণ করা যেতে পারে। তবে যদি তারা বায়তুল হারামে আশ্রয় নেয়, তাহলে এ অবস্থায় কেবলমাত্র তাদেরকে অবরোধ করে তাদের এতটা সংকটে ফেলা যেতে পারে, যার ফলে তারা নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। হারাম শরীফে রক্তপাত করা বা পাথর ও গোলাবর্ষণ করা জায়েয নয়। বিপরীতপক্ষে, একটি জালেম সরকারের অস্তিত্বই হচ্ছে মূর্তিমান গুনাহ্। আর তার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য প্রচেষ্টা চালানোও কেবল গুনাহ্ বৃদ্ধিই করে মাত্র।

সাত. কুরআন ও সুন্নাহ কর আরোপ করার জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ দেয়নি। বরং মুসলমানদের উপর ইবাদত হিসেবে যাকাত এবং অমুসলিমদের

উপর আনুগত্যের চিহ্ন হিসেবে জিযিয়া কর আরোপ করার পর দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জনগণের উপর কর আরোপ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারের উপর ন্যস্ত করেছে। খারাজ, শুল্ক, আমদানি ও রপ্তানি কর, এগুলি একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কুরআন ও সুন্নাহ শরিয়তের বিধান হিসেবে এগুলি আরোপ করেনি, বরং ইসলামি হুকুমাতগুলো নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলি আরোপ করেছিল। এ ব্যাপারে আসল মানদণ্ড হচ্ছে দেশের প্রকৃত প্রয়োজন। কোনো শাসক নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যদি কোনো কর আদায় করে তাহলে তা হারাম গণ্য হবে। দেশের যথার্থ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য দেশবাসীর সমর্থন নিয়ে কর আরোপ করলে তা বৈধ ও হালাল বিবেচিত হবে।

আট. জী হ্যাঁ, কেবল এটিই নয়, বরং নিজের পূর্বের সিদ্ধান্তগুলোও বদলাতে পারেন।

নয়. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পার্থিব রাজনীতির দৃষ্টিতে বড়ই যোগ্য ছিলেন, আর দীনি দৃষ্টিতে ছিলেন একজন নিকৃষ্ট জালেম শাসক।

দশ. হাঁ, ৭নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষ। *(তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৫৯ খৃ.)*

আধুনিক যুগের দিকনির্দেশক শক্তি কোনটি, ইসলাম না খৃস্টবাদ?

প্রশ্ন : বিংশ শতাব্দীর এই সুসভ্য প্রগতিশীল যুগের নেতৃত্ব ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কার পক্ষে দেওয়া সম্ভব, খৃস্টবাদের না ইসলামের পক্ষে? ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অথবা নাস্তিক্যবাদ কি মানুষকে আধ্যাত্মিক ও বস্তুবাদী উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাতে সক্ষম? বিশেষত কম্যুনিজমের সয়লাবকে প্রতিরোধ ও নির্মূল করার যোগ্যতা কার মধ্যে রয়েছে?

জবাব : এ প্রশ্ন আসলে কয়েকটি প্রশ্নের সমষ্টি। তাই এর এক একটি অংশ নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করতে হবে।

ক. খৃস্টবাদ সম্পর্কে বলা যায় যে, এ যুগের নেতৃত্ব থেকে সে অনেক আগেই হাত গুটিয়ে নিয়েছে। বরং সত্য বলতে কি, সে কোনো কালেই মানবীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির নেতৃত্ব দিতে পারেনি। খৃস্টবাদ বলতে যদি খৃস্টানদের কাছে বর্তমানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যে শিক্ষা রয়েছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে, তবে বাইবেলের নিউটেস্টামেন্ট দেখে যে কেউ বুঝতে পারে যে, তা মানবীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিকে কি এবং কতখানি দিক নির্দেশনা দেয়। এতে নিরেট কয়েকটা চারিত্রিক নীতিমালা ছাড়া আদৌ এমন কোনো জিনিস নেই, যা দ্বারা মানুষ আপন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন কানুন ও বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কোনো নির্দেশ লাভ করতে পারে। কিন্তু খৃস্টবাদ বলতে যদি খৃস্টান ধর্মযাজকরা যে জীবন পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলো তা বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এ কথা কারো অবিদিত নেই যে, ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের উন্মেষ ঘটার পর তা

ব্যর্থ ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়। রেনেসাঁ পরবর্তী যুগে ইউরোপ যেটুকু বস্তুতগত উন্নতি সাধন করেছে তা খৃস্টীয় ধর্মের পথনির্দেশ থেকে মুক্ত হয়েই করেছে। অবশ্য ইসলামের বিরুদ্ধে খৃস্টবাদের বিদ্বেষ এবং খৃস্টবাদের প্রতি একটা আবেগজড়িত সম্পর্ক ইউরোপবাসীর মধ্যে তার পরেও বহাল ছিলো এবং এখনও রয়েছে।

খ. পক্ষান্তরে, ইসলাম তার অভ্যুদয়লগ্ন থেকেই সমাজ ও সভ্যতাকে শুধু যে দিক নির্দেশনা দেয় তাই নয়, বরং সে নিজে একটা স্বতন্ত্র সমাজব্যবস্থা ও ব্যতিক্রমধর্মী সভ্যতার পত্তন করেছে। মানব জীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যার সম্পর্কে কুরআন ও রসূল সা. মানুষকে কোনো বিধান দেননি এবং সেই বিধান মোতাবেক কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেননি। এই বিধান এবং প্রতিষ্ঠান খৃস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে যেমন কার্যোপযোগী ছিলো, আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও তেমনি কার্যোপযোগী এবং ভবিষ্যতে হাজার হাজার বছর পরও ইনশাআল্লাহ কার্যোপযোগী থাকবে। বর্তমান 'প্রগতিশীল যুগে' এমন একটি জিনিসও সেখানে যাবে না, যার কারণে ইসলাম আজ কার্যকর হতে অক্ষম কিংবা মানুষের নেতৃত্ব দিতে অসমর্থ। যে ব্যক্তি ইসলামকে এ ব্যাপারে অসম্পূর্ণ মনে করে, সে কোন্ কোন্ বিষয়ে ইসলামের নেতৃত্ব দানের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা দেখতে পায়, সেটা দেখিয়ে দেওয়া তারই দায়িত্ব।

গ. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা নাস্তিক্যবাদ আসলে কোনো আধ্যাত্মিক উন্নতিতেও সহায়ক নয়, বস্তুগত উন্নতিতেও নয়। উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের তো প্রশ্নই ওঠে না। আমার মতে এ যুগের পাশ্চাত্যবাসী বস্তুগত দিক থেকে যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, বস্তুবাদ ও ভোগবাদ অথবা নাস্তিকতার সাহায্যে অর্জন করেনি, বরং তা সাথে নিয়েই অর্জন করেছে। আমার এই অভিমতের পক্ষে সংক্ষিপ্ত যুক্তি এই যে, মানুষ যতোক্ষণ কোনো উচ্চতর লক্ষ্যের খাতিরে আপন জান, মাল, শ্রম ও ব্যক্তিগত স্বার্থের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত না হয়, ততোক্ষণ সে কোনো উন্নতিই অর্জন করতে পারে না। কিন্তু মানুষকে এ ধরনের ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রাণিত করতে পারে এমন কোনো বস্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও নাস্তিক্যবাদে নেই। অনুরূপভাবে সামষ্টিক চেষ্টা ও সাধনা ছাড়া মানুষের পক্ষে কোনো উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব নয়। আর সামষ্টিক চেষ্টা সাধনা চালানোর জন্য মানুষে মানুষে এমন বন্ধুত্ব থাকা প্রয়োজন, যা পরস্পরের জন্য প্রীতি ভালবাসা ও ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতায় প্রীতি ও ত্যাগের কোনো ভিত্তি নেই। পাশ্চাত্য জাতিগুলো খৃস্টবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও পারস্পরিক প্রীতি–ভালবাসা ও ত্যাগের এই মূলমন্ত্র খৃস্টীয় নৈতিকতা থেকেই গ্রহণ করেছে, যা তাদের সমাজে

ঐতিহ্য হিসেবে বহাল ছিলো। এগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষতা বা নাস্তিকতার অবদান মনে করা ভুল। ধর্মনিরপেক্ষতা ও একমাত্র অবদান হলো, তা পাশ্চাত্য জাতিগুলোকে আল্লাহও আখিরাতের চিন্তামুক্ত করে দিয়ে নিরেট বস্তুবাদের প্রতি আসক্ত করেছে এবং ভোগবাদী সুখ, আনন্দ ও স্বার্থের উদগ্র আকাঙ্খায় তাদেরকে মাতিয়ে তুলেছে। তবে ঐ জাতিগুলো এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে নৈতিক গুণাবলীকে কাজে লাগিয়েছে, তা তারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতা থেকে নয় বরং ধর্ম থেকেই পেয়েছে, যার বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতা উন্নতির প্রেরণা যোগায়, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ধর্মনিরপেক্ষতা বা নাস্তিকতা বরঞ্চ মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব সংঘাত অপরাধ প্রবণতাও বৃদ্ধি করে, যা মানুষের জাগতিক উন্নতির সহায়ক নয়, বরং অন্তরায়।

ঘ. কমিউনিজমের সয়লাব ঠেকানোর যোগ্যতা ও ক্ষমতা শুধুমাত্র এমন জীবন ব্যবস্থারই থাকা সম্ভব, যা মানব জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান কমিউনিজমের চেয়েও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে করতে সক্ষম এবং সেই সাথে মানুষকে পূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তিও দিতে সমর্থ, যা কমিউনিজমের অসাধ্য। এমন জীবন ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামের কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। *(তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৬১)*

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও ইসলামি রাষ্ট্র

প্রশ্ন : বিংশ শতাব্দীতেও যদি ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়, তাহলে বর্তমান ভাবধারা ও মতাদর্শের স্থলে ইসলামের ভাবধারা ও মতাদর্শকে অভিষিক্ত করতে গিয়ে যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে, তার নিরসনে ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রতত্ত্ব (আল হুকুমাহ) ও সরকার তত্ত্ব (আল খিলাফাহ) এই দুই তত্ত্বের কোনটি বেশি সহায়ক হবে?

জবাব : বর্তমান যুগে ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠার পথে যে জিনিস প্রধান অন্তরায় এবং যে ভাবধারা ও মতাদর্শ তার পথ আগলে রয়েছে, তার পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, তা মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা জাতিসমূহের দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক আধিপত্য ও প্রভুত্বেরই সৃষ্টি। পশ্চিমা জাতিগুলো যখন আমাদের দেশগুলোতে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন তারা আমাদের আইন কানুন বাতিল করে নিজেদের আইন চালু করে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বাতিল করে তারা নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী লোকদেরকে তারা বরখাস্ত করে এবং তাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে বেরুনো লোকদের জন্য সকল সরকারি চাকুরী নির্দিষ্ট করে দেয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তারা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানাদি ও রীতিনীতি চালু করে এবং অর্থনীতির ময়দানও পাশ্চাত্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক বাহকদের জন্য হয়ে যায় একচেটিয়া। এভাবে

তারা আমাদের ভেতরেই আমাদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও আদর্শ বিবর্জিত একটি জেনারেশন গড়ে তোলে যা ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি শিক্ষা ও ঐতিহ্য থেকে কাজেকর্মেও যেমন সম্পর্কচ্যুত, আবেগ অনুভূতিতে এবং মন মানসিকতায়ও তেমনি সংশ্রবহীন। মূলত এ জিনিসটাই আমাদের ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনে অন্তরায়। আর এ কারণেই এ ভ্রান্ত ধারণারও সৃষ্টি হয়েছে যে, ইসলাম বর্তমান যুগে কার্যোপযোগী নয়। যাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা অনৈসলামিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে, তাদের ইসলামকে অবাস্তব ও অনুপযোগী বলা ছাড়া আর কিইবা বলার থাকতে পারে? কেননা তারা ইসলাম জানেও না, তদনুসারে কাজ করার জন্য তাদেরকে গড়ে তোলাও হয়নি। যে জীবন ব্যবস্থার উপযোগী করে তাদেরকে তৈরি করা হয়েছে সেটাকেই কার্যোপযোগী ভাবা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এমতাবস্থার অনিবার্যভাবে আমাদের সামনে দু'টো পথই খোলা থাকে। হয় আমাদেরকে জাতি হিসেবে কাফের হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং অনর্থক ইসলামের নাম নিয়ে বিশ্বকে ধোঁকা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে (মুনাফেকীর সাথে নয়) আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করতে হবে। এ শিক্ষাব্যবস্থার পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, এর কোন্ কোন্ উপাদান আমাদেরকে ইসলাম থেকে বিপথগামী করে দেয় এবং এতে কি কি পরিবর্তন এনে আমরা ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার যোগ্য লোক বানানোর কাজ এর দ্বারা নিতে পারি। আমি অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয়নি। অথচ এ সমস্যাটা খুবই ঠাণ্ডা মাথায় বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিলো। কেননা যতোক্ষণ আমরা এ সমস্যার সমাধান না করবো ততোক্ষণ ইসলামি বিধানের বাস্তবায়নের পথ কিছুতেই সুগম হবে না।

ইবনে খালদুনের কোনো মতবাদই এ সমস্যার সমাধান সহায়ক হবে না কেননা এ সমস্যার সে গুণগত অবস্থা এখন সৃষ্টি হয়েছে, তা ইবনে খালদুনের আমলে সৃষ্টি হয়নি। সমস্যাটার প্রকৃত ধরন এই যে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নেওয়ার সময় আমাদের দেশে তাদের নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতির দুধকলা দিয়ে পোষা এমন একটা শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে রেখে গেছে, যারা দৈহিক দিক দিয়ে আমাদের জাতির অংশ হলেও জ্ঞান, চিন্তা, মানসিকতা ও চরিত্রের দিক দিয়ে ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের যথার্থ উত্তরাধিকারী। এ শ্রেণীর শাসন থেকে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধান এতো জটিল যে, তার সমাধান ইবনে খালদুনের মতবাদের সাধ্যাতীত। এজন্য অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করা এবং পরিস্থিতি বুঝে সংস্কারের নতুন পথ উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। *(তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৬১ খৃ.)*

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

প্রশ্ন : ইসলামি রাষ্ট্রে খৃস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কি মুসলমানদের মতো যাবতীয় অধিকার ভোগ করতে পারবে? আজকাল পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশে যেভাবে এসব সম্প্রদায়ের লোকেরা অবাধে ধর্ম প্রচারে লিপ্ত, ইসলামি রাষ্ট্রেও কি তারা তেমনিভাবে নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করতে পারবে? মুক্তিফৌজ (Salvation Army) ক্যাথেড্রাল, কনভেন্ট, সেন্ট জন, সেন্ট ফ্রান্সিস ইত্যাকার ধর্মীয় অথবা আধা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কি আইন প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেওয়া হবে? (সম্প্রতি শ্রীলংকায় অথবা অন্যান্য দু'একটি দেশে যেমন হয়েছে) অথবা, মুসলমান শিশুদের কি ঐসব প্রতিষ্ঠানে অবাধে আধুনিক শিক্ষা লাভের অনুমতি দেওয়া হবে? এই শতাব্দীতেও এসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করা সমীচীন হবে কি (বিশ্ব মানবাধিকার সনদের আলোকেও বিবেচ্য)। বিশেষত তারা যখন সেনাবাহিনী ও সরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত এবং সরকারের অনুগত?

জবাব : ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো সকল নাগরিক অধিকার (Civil rights) মুসলমানদের মতোই ভোগ করবে। তবে রাজনৈতিক অধিকারে (Political Rights) তারা মুসলমানদের সমকক্ষ হতে পারে না। কারণ ইসলামে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন চালানো মুসলমানদের দায়িত্ব। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেখানেই তারা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে, সেখানে যেনো তারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষা মোতাবেক সরকারি প্রশাসন চালায়। যেহেতু অমুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষাও মানে না, তারা প্রেরণা ও চেতনা অনুসারে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করতেও সক্ষম নয়, তাই তাদেরকে এ দায়িত্বে অংশীদার করা চলে না। তবে প্রশাসনে এমন পদ তাদেরকে দেওয়া যেতে পারে, যা নীতিনির্ধারক পদ নয়। এ ব্যাপারে অমুসলিম সরকারগুলোর আচরণ মুনাফেকী ও ভণ্ডামীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইসলামি সরকারের আচরণ নিরেট সততার প্রতীক। মুসলমানরা তাদের এ নীতি খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেয়া এবং এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বেলায় আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সর্বোচ্চ উদারতা ও ভদ্রতার আচরণ করে থাকে। আর অমুসলিমরা বাহ্যত লিখিতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো (National minorites) যাবতীয় অধিকার প্রদান করে বটে, কিন্তু বাস্তবে মানবিক অধিকারও দেয় না। এতে যদি কারো সংশয় থাকে, তবে সে যেনো আমেরিকায় নিগ্রোদের সাথে, রাশিয়ায় অকম্যুনিস্টদের সাথে এবং চীন ও ভারতে মুসলমানদের সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে তা দেখে নেয়। অনর্থক অন্যদের সামনে লজ্জা বোধ করে

আমাদের নিজস্ব নীতি খোলাখুলি বর্ণনা না করা এবং সে অনুসারে দ্বিধাহীন চিত্তে কাজ না করার কি কারণ থাকতে পারে তা আমার বুঝে আসে না।

অমুসলিমদের ধর্মপ্রচারের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। এটা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে, আমরা যদি একেবারে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত না হই, তাহলে আমাদের দেশে অমুসলিমদের ধর্মপ্রচারের অনুমতি দিয়ে শক্তিশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গড়ে উঠতে দেয়ার মতো নির্বুদ্ধিতার কাজ করা সঙ্গত হবে না। বিদেশী পুঁজির দুধকলা খেয়ে ও বিদেশী সরকারের আস্কারা পেয়ে সংখ্যালঘুরা লালিতপালিত হোক এবং শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফুলে-ফেঁপে উঠে তুরস্কের খৃস্টানদের মতো আমাদেরকেও সংকটে ফেলে দিক, এটা কিছুতেই হতে দেয়া ঠিক হবে না।

খৃস্টান মিশনারীরা এখানে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল চালু রেখে মুসলমানদের ঈমান খরিদ করার চেষ্টা করা এবং মুসলমানদের নতুন বংশধরগণকে আপন জাতীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার (De-nationalise) অবাধ অনুমতি দেওয়াও আমার মতে জাতীয় আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের শাসকরা এ ব্যাপারে চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। নিকটবর্তী উপকারিতা তো তাদের বেশ চোখে পড়ে কিন্তু সুদূরপ্রসারী কুফল তারা দেখতে পায় না।

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেবল তখনই, যখন তারা বিজিত হয় অথবা কোনো চুক্তির ভিত্তিতে জিজিয়া দেওয়ার সুস্পষ্ট শর্ত অনুসারে তাদেরকে ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। পাকিস্তানে যেহেতু এই দুই অবস্থার কোনোটাই দেখা দেয়নি, তাই এখানে অমুসলিমদের উপর জিজিয়া আরোপ করা শরিয়তের বিধান অনুসারে জরুরি নয় বলে আমি মনে করি। *(তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৬১ খৃ.)*

ইসলামি রাষ্ট্রে বিদ্বিষ্ট প্রাচ্যবিদদের চিন্তার প্রসার

প্রশ্ন : কোনো ইসলামি দেশে পাশ্চাত্যের এমন সব প্রাচ্যবিদদেরকে অমুসলিম প্রফেসার ও স্কলারদেরকে শিক্ষাদান বা বক্তৃতা প্রদান করার জন্য আহ্বান করা যেতে পারে কিনা, যারা নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি বিষয়বস্তুর উপরে বই লিখেছেন এবং এ প্রসঙ্গে ইসলামের কেবল অযথা সমালোচনাই করেননি, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা বিদ্বেষ ও স্বল্প জ্ঞানের কারণে ইসলামের ইতিহাস লিখতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আহলে বায়েত, খোলাফায়ে রাশেদীন, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণের (যাদের জন্য ইসলাম ও মুসলমানরা গর্ব করে) বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর বাক্য লিখে তাঁদের নিন্দায় মুখর

হয়েছেন? যেমন স্বনামধন্য আমেরিকান ও বৃটিশ অধ্যাপকদের সম্পাদিত ইনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় অন্যান্য আপত্তিকর মন্তব্য ছাড়াও রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে বাদী লেখা হয়েছে। ইনসাইক্লোপিডিয়ার এইসব লেখকদের অধিকাংশই আমাদের দেশে এসে লেকচার দেন। তাদের এইসব লেকচার ও ভাষণ দান ও এগুলি প্রচারের ব্যাপারে আমাদের ইসলামি রাষ্ট্র কি কোনো প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করবে না? তাদের বিষমিশ্রিত বইগুলো কি আমাদের দেশের পাঠাগারসমূহে রাখা বাঞ্ছনীয় হবে? এগুলোর প্রতিবাদ, জবাব প্রকাশ ও এগুলো সংশোধন করার ব্যাপারে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?

জবাব : এটা হচ্ছে যুগের পরিবর্তন। একদিন এমন অবস্থা ছিলো যখন ইউরোপের খৃস্টানরা আন্দালুসিয়ায় (Spain) গিয়ে মুসলমানদের থেকে ইনজিলের পাঠ নিতেন। এখন দিনকাল পাল্টে গেছে। আজ মুসলমানরা ইউরোপবাসীদের কাছে জিজ্ঞেস করে, ইসলাম কি? ইসলামের ইতিহাস ও তার সভ্যতা কি? এমনকি আরবি ভাষাও আজ পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের কাছ থেকে শিখতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে শিক্ষক আমদানি করে তাদের দিয়ে ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে। ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে তারা যা কিছু লিখেছেন তা কেবল পড়ানোই হয় না, তার উপর ঈমানও আনা হয়। অথচ এই প্রাচ্যবিদরা নিজেদের ধর্ম ও তার ইতিহাস সম্পর্কে নিজেদের স্বধর্মীয়দের ছাড়া আর কারো মতামতকে তিলার্ধও মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়। ইহুদিরা নিজেদের ইনসাইক্লোপিডিয়া (Jewish Encyclopaedia) প্রকাশ করেছে। কোনো একটি প্রবন্ধ কোনো মুসলমানের থেকে তো দূরের কথা, কোনো খৃস্টান লেখকের থেকেও গ্রহণ করা হয়নি। বাইবেলের অনুবাদও ইহুদিরা নিজেদের মতো করে করেছে। খৃস্টানদের অনুবাদে তারা হাত দেয়নি। বিপরীতপক্ষে ইহুদী লেখকরা ইসলাম সম্পর্কে প্রবন্ধ ও বই লেখে আর মুসলমানরা তা সাদরে মাথায় তুলে নেয়। মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম, ফিক্‌হ, তাহজীব তমদ্দুন ও নিজেদের মনীষীদের ইতিহাস সম্পর্কে ইহুদী লেখকদের অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক লেখা, বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে এবং এগুলি তাদের কাছ থেকে শিখতেও প্রস্তুত হয়ে গেছে।

কোনো যথার্থ ইসলামি রাষ্ট্রে এ অবস্থা চলতে পারে না। এ অবস্থা টিকে থাকার কোনো কারণ সেখানে নেই। একদিকে ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে থাকবে আবার অন্যদিকে মুসলমানরা হবে এতিম, এ দু'টি অবস্থা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। এ দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদের অনৈসলামি রাষ্ট্রের উপযোগী হতে পারে এবং তার জন্যই এটা মোবারক হোক। *(তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৬১ খৃ.)*

বিচার ব্যবস্থায় রদবদল ও তার ধরন

প্রশ্ন : যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশে যাবতীয় দেওয়ানী, ফৌজদারী, অর্থ বিষয়ক এবং আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত বিধি (Procedural Law) ইত্যাদি দীর্ঘকালব্যাপী প্রত্যেক আদালতে চালু রয়েছে এবং যেহেতু দেড়শো বছর ধরে সকল জজ ও উকিল এসব আইনের সাথে পুরোপুরি পরিচিতই নন, বরং এর ব্যাপক জ্ঞানও রাখেন, সেহেতু ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে বৃটিশ আমলের বিচার ব্যবস্থার (British Rule of Law) সমগ্র কাঠামোটা পাল্টে ফেলা সম্ভব হবে না।

তা সত্ত্বেও কি বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার প্রবর্তিত হবে? বিশেষত যখন ইসলামি আইন কোনো দিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ, সংকলিত, বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ আকারে বর্তমান নেই? ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় উকিলদের মর্যাদা কি রকম হবে? এ ধরনের প্রয়োগ বিধির (Procedural Law) আওতায় কি তারা মোকদ্দমা চালাতে এবং মামলার দীর্ঘসূত্রিতা (Litigation) চালিয়ে যেতে পারবেন? এই প্রগতির যুগেও কি চোরের হাত কাটা এবং ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি দেওয়া হবে? বিচারকরা কি সাক্ষ্য আইনের (Evidence Law) সাহায্য না নিয়ে রায় দিতে বাধ্য হবে? তা ছাড়া আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানাদি যেমন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত, বাণিজ্য ট্রাইব্যুনাল এবং শ্রম আইন প্রভৃতির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, হস্তক্ষেপ, আন্তর্জাতিক আইন কার্যকরকরণ ও তা হুবহু গ্রহণের ব্যাপারে ইসলামি সরকারের ভূমিকা কি হবে? এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যদি ইসলামি কনফেডারেশন অথবা ইসলামি রাষ্ট্রজোট গঠন করে তৈরি করা হয়, তাহলে তার মর্যাদা কি হবে? ইসলামি আইন রচনাকারী আইনসভায় পাসকৃত কিংবা ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিধিসমূহের সংশোধনে কি (Review) ইসলামি বিচার বিভাগের কোনো এখতিয়ার থাকবে? মুসলিম দেশ ও মুসলিম জনগণকে এক মঞ্চে আনার জন্য কিভাবে মতভেদ নিরসন করা যেতে পারে?

জবাব : এ প্রশ্নের জবাবে সর্বপ্রথম এ কথা বুঝে নেওয়া দরকার যে, বৃটিশ সরকার যখন এ দেশে আসে তখন দেশের গোটা আইন আদালত (Legal system) ইসলামি ফিক্‌হ এর ভিত্তিতেই চালু ছিলো। ইংরেজরা এসে তা রাতারাতি পাল্টে ফেলেনি। বরং ইংরেজ শাসনেও বহু বছর পর্যন্ত ইসলামি ব্যবস্থাই চলতে থাকে। ইংরেজরা তা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তারা নিজেদের ব্যবস্থা চালু করে। এখন যদি আমরা ইসলামি আইন নতুন করে চালু করতে চাই তাহলে সে পরিবর্তনটাও রাতারাতি নয়, বরং ক্রমান্বয়েই হবে। সেজন্য অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে। ইসলামি আইন যদি লিপিবদ্ধ (Codified) না থাকে, তাহলে তা লিপিবদ্ধ করে নিতে অসুবিধা কিছুই নেই। ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সেগুলো

সহজেই আমাদের ভাষায় ভাষান্তরিত করা যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে আরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ধারা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই প্রগতির যুগেই তো সৌদি আরবে ব্যাভিচার ও চুরির ক্ষেত্রে ইসলামি দণ্ডবিধি চালু রয়েছে। সে অভিজ্ঞতা সারা পৃথিবীর সামনে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এসব দণ্ড চালু থাকার কারণেই সৌদি আরবে অপরাধের মাত্রা এতো কমে গেছে যতোটা পৃথিবীর আর কোনো দেশে কমেনি। এ যুগটা প্রগতির যুগ এর অর্থ যদি এই হয় যে, অপরাধেও অগ্রগতি হোক, তাহলে পাশ্চাত্যের আইন ব্যবস্থাকে সানন্দে চালু রাখুন। কিন্তু যদি মনে করেন যে, উন্নতি ও প্রগতির জন্য অপরাধ দমন করা প্রয়োজন, তাহলে সে ব্যাপারে ইসলামি আইনের চেয়ে কার্যকর আইন যে আর কিছু নেই তা অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত। আসলে সমকালীন ধর্মহীন সভ্যতার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, অপরাধীদের জন্যই তার সমস্ত সহানুভূতি উথলে ওঠে। এ কারণেই এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করা হয়ে থাকে যে, ইসলামি দণ্ডগুলো পাশবিক ধরনের। এ কথার আর একটা অর্থ দাঁড়ায় এই যে, চুরি করাটা কোনো পাশবিক কাজ নয়। কেবল সেজন্য হাত কাটাই পাশবিক। আর ব্যভিচার? সেটা তো পাশ্চাত্য সমাজে নিছক একটা ফূর্তি হিসেবেই বিবেচিত।

ইসলামি আইনে বিচারকদের সাক্ষ্য আইনের সাহায্য না নিয়েই মামলা নিষ্পত্তি করার অধিকার আছে কিংবা এরূপ রীতি কখনো চালু ছিলো, এ ধারণাটা কোত্থেকে এলো আমি জানি না। স্বয়ং কুরআনই তো সাক্ষ্য আইনের অনেকগুলো মূলনীতি বর্ণনা করেছে এবং তার অধিকাংশ ব্যাখ্যার হাদিস ও খোলাফায়ে রাশেদীনের ফায়সালার সাথে মিল রয়েছে। বিশেষত ফকীহগণ এই মূলনীতিগুলোকে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে বিন্যস্ত করেছেন। ইসলামি শাসনামলে কখনোই এমন কোনো বিচারক ছিলেন না, যিনি সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া রায় দিয়েছেন।

ওকালতি পেশা সম্পর্কে আমার মতে শুধু এতোটুকু সংস্কারই প্রয়োজন যে, প্রচলিত আইন ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া দরকার এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উকিলদেরকে পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। আধুনিক আইন তত্ত্বের দৃষ্টিতেও উকিলের আসল কাজ হলো আদালতকে আইন বুঝতে ও প্রয়োগ করতে (Apply) সাহায্য করা, মক্কেলের সাহায্য করা নয়। ওকালতি একটা পেশা হয়ে যাওয়ার একটা কুফল দেখা দিয়েছে এই যে, উকিলরা আদালতকে বিভ্রান্ত করার (Mislead) চেষ্টা করে থাকেন। তাছাড়া মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি এবং মামলার সংখ্যা বৃদ্ধিও করেন।

সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আমরা শরীক হতে পারি। এসব প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো জিনিস আমাদের আদর্শের বিরোধী হয়, তাহলে আমরা সে ক্ষেত্রে আলাদা নীতি অবলম্বন করবো। শুধুমাত্র সেই বিষয়েই আমাদের অংশগ্রহণের ব্যতিক্রম

ঘটবে। মুসলিম দেশগুলো নিজস্ব কমনওয়েলথ অথবা মৈত্রী সংস্থা তথা কনফেডারেশন গঠন করতে পারে এবং ইসলামি আদর্শ ও মূলনীতি অনুসারে পারস্পরিক সম্পর্কের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে।

ইসলামি রাষ্ট্রের আইনসভা ইজতিহাদের মাধ্যমে যে আইন প্রণয়ন করবে, তা সংশোধন কিংবা বাতিল করার অধিকার ইসলামি বিচার বিভাগের থাকবে না। তবে ঐ আইন যদি আইনসভার এখতিয়ার বহির্ভূত হয়, তবে বিচার বিভাগ তাকে এখতিয়ার বহির্ভূত ঘোষণা করতে পারে।

মুসলিম দেশসমূহকে ও মুসলমানদেরকে এক মঞ্চে আনার জন্য মতভেদ নিরসনের একমাত্র পথ এই যে, মুসলমানদের পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুসরণ করতে প্রস্তুত হতে হবে। কুরআনের ব্যাখ্যা ও সুন্নাহর বিশুদ্ধতা নিরূপণে মতপার্থক্য হতে পারে। কিন্তু সেটা সম্মিলিতভাবে কাজ করার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বোচ্চ আদর্শ ও চূড়ান্ত দলিল বলে মেনে নেয় এবং রসূল সা. এর পরে আর কোনো নবী আসবেনা বলে বিশ্বাস করে সে আমাদের মুসলিম জাতিভুক্ত, এই মূলনীতিটা যদি আমরা সবাই মেনে নেই, তাহলে কুরআনের কোনো আয়াতের মর্ম আমরা যা বুঝেছি, সে তা থেকে ভিন্ন অর্থ বোঝে বলে আমাদের জাতির গণ্ডি থেকে সে বহিস্কৃত হতে পারে না। কোনো ব্যাপারে হাদিস থেকে যে জিনিস প্রমাণিত হয় বলে আমরা মনে করি, সে তা থেকে ভিন্ন জিনিস প্রমাণিত হয় বলে মনে করে, এ কারণেও তাকে ইসলাম থেকে বহির্ভূত মনে করা চলে না। এর উদাহরণ ঠিক এ রকম যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ও আইনের আনুগত্য অপরিহার্য মেনে নিয়ে যতোগুলো আদালত কর্মরত, সেগুলোর সবই এ দেশের বৈধ আদালত। সেজন্য সকল আদালত একই রকম রায় দেবে এটা জরুরি নয়। *(তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৬১)*

বিজ্ঞানের যুগে ইসলামি জিহাদ কেমন হবে?

প্রশ্ন : মুসলমানদের জিহাদের প্রেরণাকে উজ্জীবিত রাখার জন্য বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে কোন্ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হবে? কারণ আজকের যুগে তরবারি ও বর্শা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে বুহ্য রচনা করে মুখোমুখি লড়াই হয় না। বরং আজকের বিজ্ঞানের যুগে লড়াই হয় বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক চাল (Strategy) ও গুপ্তচর ব্যবস্থার (Espionage) মাধ্যমে। আপনি পারমাণবিক বোমা, রকেট, মিসাইল ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের এই বিজ্ঞানের যুগে 'জিহাদের' ব্যাখ্যা করবেন কিভাবে? চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহে অবতরণকারী, স্যাটেলাইট নিক্ষেপকারী অথবা রকেটের সাহায্যে মহাশূন্য পরিভ্রমণকারী এবং নিত্য নতুন আবিষ্কারকারীদেরকে মুজাহিদ বলা যাবে কি না? গণপ্রশাসন ও দেশ পরিচালনার

(Civil Administration) ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ভূমিকা কি হওয়া উচিত? বর্তমান যুগের সামরিক বিপ্লবগুলোর কারণে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ এবং এর সুফল অনেকটা প্রমাণিত সত্য। কাজেই শান্তির যুগের সেনাবাহিনীকে বসিয়ে খাওয়ানোর পরিবর্তে প্রতি ক্ষেত্রে জাতির খেদমতে নিয়োগ।

জবাব : জিহাদের ব্যাপারে প্রথমত জেনে রাখা দরকার জিহাদ ও লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। অনুরূপভাবে জাতীয় স্বার্থে জিহাদ ও আল্লাহর পথে জিহাদ দু'টো আলাদা জিনিস। মুসলমানদের মধ্যে যে জিহাদী প্রেরণা জাগ্রত করা প্রয়োজন তা ততোক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে না যতোক্ষণ তাদের মধ্যে ঈমান উন্নতি লাভ করতে করতে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছায়, যেখানে তারা আল্লাহর জমি থেকে অসৎবৃত্তির উৎসাদন এবং এ জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য নিজের যথাসর্বস্ব কুরবানী করতে প্রস্তুত না হয়ে যায়। আপাতত আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রেরণাকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলার জন্য সব কিছু করা হচ্ছে। মুসলমানদেরকে এমন শিক্ষা দান করা হচ্ছে, যা ঈমানের পরিবর্তে তাদের মনে সংশয় ও অস্বীকৃতির জন্ম দিচ্ছে। তাদেরকে এমন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এমন সব অসৎবৃত্তির প্রসার ঘটছে, যেগুলোকে প্রত্যেকটি মুসলমান ইসলামের দৃষ্টিতে অসৎবৃত্তি বলেই জানে। এরপর মুসলমানদের মধ্যে কিভাবে জিহাদী প্রেরণা সৃষ্টি করা যাবে, এ প্রশ্ন অমূলক। বর্তমান অবস্থায় মুসলমানরা ভাড়াটে সিপাই (Mercenary) হবে অথবা বড় জোর জাতীয় স্বার্থে লড়াই করবে, এছাড়া তৃতীয় কোনো সম্ভাবনা নেই। আর বৈজ্ঞানিক অস্ত্রপাতি ও সামরিক চালের (Strategy) ব্যাপারে বলা যায়, এগুলো হচ্ছে এমন সব উপকরণ যেগুলোকে বৈধ ও অবৈধ উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি মুসলমানের মধ্যে সাচ্চা ঈমান থাকে এবং ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত হয়, তাহলে সে পূর্ণ সচেতন প্রচেষ্টায় নিজের মধ্যে বর্তমান যুগে লড়াই করার উপযোগী যাবতীয় যোগ্যতা সৃষ্টি করে নেবে এবং বর্তমান যুগে ও আগামীতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপায় উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করে নিতে সক্ষম হবে।

চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহে অবতরণ করা কলম্বাসের আমেরিকায় অবতরণ ও ভাস্কো ডা গামার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করার চাইতে মোটেই ভিন্নতর প্রকৃতির নয়। যদি এদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদ বলা যায়, তাহলে চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে অবতরণকারীদেরকেও মুজাহিদ বলা যাবে।

গণপ্রশাসন ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে (Civil Administration) সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ সেনাবাহিনী ও দেশ উভয়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। সেনাবাহিনী

গঠন করা হয় বাইরের শত্রুদের থেকে দেশকে সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে, দেশ শাসন করার জন্য নয়। দুশমনের সাথে লড়াই করার জন্য তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের ফলে তার মধ্যে যে গুণাবলী সৃষ্টি হয়, তা মোটেই নিজের দেশ পরিচালনা ও দেশ শাসনের উপযোগী নয়। এছাড়াও রাজনীতিবিদ (Politician) বা প্রশাসনিক দায়িত্বশীলগণ (Civil Administration) যারাই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন না কেন তাদের কাজের ধারা হয় এমন পর্যায়ের, যার ফলে দেশের অনেক লোক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আবার অনেক লোক হয়ে পড়ে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। কাজেই এ ময়দানে সেনাবাহিনীকে নামিয়ে দেয়া মানেই হচ্ছে সেনাবাহিনীকে অজনপ্রিয় (Unpopular) করে তোলা। অথচ দেশের সমস্ত লোকের একযোগে সেনাবাহিনীর পেছনে দাঁড়ানো এবং যুদ্ধকালে দেশের প্রত্যেক অধিবাসীর তাদের সাহায্যে যাওয়া একটি অপরিহার্য বিষয়। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক বিপ্লবের ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ মোটেই সুফলদায়ক হয়নি। বরং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এর কুফল ও অনিষ্টকারিতাই প্রমাণ করেছে। *(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৬২ খৃ.)*

ইসলামি রাষ্ট্রে মহিলাদের কর্মক্ষেত্র

প্রশ্ন : ইসলাম যখন এই দাবিতেই সোচ্চার যে, সে চরম নাজুক মুহূর্তেও নারীকে একটা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে, তখন এ যুগের ইসলামি সরকার কি তাকে পুরুষদের সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দেবে না? এ যুগে নারীকে কি পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দেয়া হবে। তাদেরকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা অথবা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধিশালী করার অনুমতি দেয়া হবে কি? মনে করুন, ইসলামি সরকার যদি নারীদেরকে ভোটাধিকার দেয় এবং তারা সংখ্যাগুরু ভোটে মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়, তাহলে এই বিংশ শতাব্দীতেও কি তারা ইসলামি নীতি মোতাবেক সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পারবে না? মহিলাদের সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করার দৃষ্টান্ত তো আজকাল ভুরি ভুরি। শ্রীলংকায় বর্তমানে মহিলা প্রধানমন্ত্রী রয়েছে। নেদারল্যান্ডের সর্বোচ্চ শাসকও একজন মহিলা। বৃটেনের রাজমুকুটও এক মহিলার মাথায় শোভা পাচ্ছে। রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে ভূপালের নবাবের বোন আবেদা সুলতানা দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে বেগম রানা লিয়াকত আলী নেদারল্যান্ডে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বৃটেনে ভারতের বর্তমান হাই কমিশনার রয়েছেন। এর আগে তিনি জাতিসংঘের সভাপতিও ছিলেন। মোগল সম্রাজ্ঞী নূর জাহান এবং ঝাঁসীর রানী রাজিয়া সুলতানার নজীরও লক্ষণীয়। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের মহিষী হযরত মহল ইংরেজদের বিরুদ্ধে লক্ষ্নৌতে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন।

এভাবে নারীরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য প্রমাণ করেছেন। এই পটভূমিতে মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহ যদি আজ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেন, তাহলে ইসলামি বিধানের আলোকে পাকিস্তানের ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় তা কি অনুমোদিত হবে? মহিলারা কি এখনো ডাক্তার, উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, সামরিক কর্মকর্তা, অথবা বৈমানিক হতে পারবে না? নার্স হিসেবে মহিলারা রোগীদের কিরূপ পরিচর্যা করে সেটাও দেখার মতো। স্বয়ং ইসলামের প্রথম যুদ্ধে নারীরা যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা করেছেন, পানি খাইয়েছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন। এমতাবস্থায় আজও কি ইসলামি রাষ্ট্রে অর্ধেক দেশবাসীকে বাড়ির চৌহদ্দিতে বন্দিনী করে রাখা হবে?

জবাব : ইসলামি সরকার দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই ইসলামি আদর্শ ও মূলনীতির বিরুদ্ধে কাজ করার অধিকারী নয়। এমনকি তার ইচ্ছা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি তার পরিচালনায় প্রকৃত ইসলামি আদর্শের নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী ও বাস্তব অনুসারী লোকেরা নিয়োজিত থেকে থাকে। নারীর ব্যাপারে ইসলামের নীতি এই যে, তারা সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে পুরুষের সমান, নৈতিক মানের বিচারেও সমান, আখিরাতে কর্মফলেও সমান, কিন্তু উভেয়র কর্মক্ষেত্র এক নয়। রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সামরিক কর্মকাণ্ড এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ পুরুষের কর্মক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কর্মক্ষেত্রে নারীকে টেনে আনার অনিবার্য পরিণাম এই হবে যে, হয় আমাদের পারিবারিক জীবন একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে যা প্রধানত নারীর কর্মক্ষেত্র, অথবা নারীর উপর দ্বিগুণ দায়িত্ব বর্তাবে। এক দিকে তাকে তার স্বভাবসুলভ দায়িত্বও পালন করতে হবে, যাতে পুরুষ কোনো ক্রমেই অংশীদার হতে পারে না। তদুপরি পুরুষের দায়িত্বেরও অর্ধেক নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে। দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন তো কার্যত সম্ভব নয়। কাজেই অনিবার্যভাবে প্রথম পরিণতিটাই দেখা দেবে। পাশ্চাত্য জগতের অভিজ্ঞতা জানা যায় যে, সেখানে তা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে এবং তাদের পারিবারিক জীবনে ধ্বস নেমেছে। অন্যের নিবুর্দ্ধিতাকে চোখ বুজে অনুকরণ করা কোনো বুদ্ধিমত্তা নয়।

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার পুরুষের সমান হবার কোনো অবকাশ নেই। কুরআনের অকাট্য বিধান এ ব্যাপারে অন্তরায়। উভয়ের অংশ সমান হওয়া ইনসাফেরও পরিপন্থী। কারণ ইসলামি বিধানে পরিবারের লালন পালনের সমস্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব পুরুষের উপর চাপানো হয়েছে। স্ত্রীর মোহরানা এবং ভরণপোষণও তারই দায়িত্ব। অপরদিকে স্ত্রীর উপর কোনো দায়দায়িত্বই ন্যস্ত হয়নি। এমতাবস্থায় কোন যুক্তিতে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার করা যেতে পারে।

নীতিগতভাবেই ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিপক্ষে। পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা চায় এমন কোনো সমাজ ব্যবস্থা অবাধ মেলামেশার পরিবেশ কামনা করে না। পাশ্চাত্য জগতে এর শোচনীয় পরিণতি দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের মানুষের যদি সেই পরিণতি ভোগ করার সাধ জেগে থাকে তবে সানন্দে তা ভোগ করুক। তাই বলে ইসলাম যে কাজ কঠোরভাবে নিষেধ করে, তা জোরপূর্বক বৈধ প্রমাণ করার কি দরকার পড়ছে?

ইসলামের যদি যুদ্ধের সময় নারীকে আহতদের পরিচর্যার কাজে লাগানো হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ এটা হয় না যে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও নারীকে অফিস আদালতে, কল-কারখানায় ক্লাবে ও পার্লামেন্টে নিয়ে আসতে হবে। পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এসে নারীরা কখনো পুরুষের মুকাবিলায় সফল হতে পারে না। কেননা তাদেরকে এসব কাজের জন্য তৈরিই করা হয়নি। এসব কাজের জন্য যে ধরনের নৈতিক ও মানসিক গুণাবলীর প্রয়োজন, তা মূলত পুরুষের মধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

নারী যদি কৃত্রিমভাবে এসব গুণ কিছু কিছু অর্জনের চেষ্টাও করে তবে তার উল্টো ক্ষতি তার নিজের এবং সমাজের উপর সমভাবে বর্তে। তার নিজের ক্ষতি এই যে, সে পুরোপুরি স্ত্রীও থাকে না পুরোপুরি পুরুষও হতে সক্ষম হয় না। ফলে নিজের সহজাত কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি এই যে, যোগ্য কর্মীর বদলে সে অযোগ্য কর্মীকে কাজে নিয়োগ করে। নারীর আধা মেয়েলী ও আধা পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বিপর্যস্থ করে তোলে। এ ব্যাপারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রাচীন মহিলার অবদান উল্লেখ করে লাভ কি? দেখতে হবে যে, যেখানে লক্ষ লক্ষ কর্মীর প্রয়োজন সেখানে সকল নারী মানানসই হবে কি? সম্প্রতি মিসরের সরকারি ও বাণিজ্যিক মহল অভিযোগ তুলেছে যে, সেখানে কর্মরত সর্বমোট এক লক্ষ দশ হাজার মহিলা কর্মোপযোগী প্রমাণিত হচ্ছে না। পুরুষের তুলনায় তাদের তৎপরতা শতকরা ৫৫ ভাগের বেশি নয়। মিসরের বাণিজ্যিক মহলের সর্বব্যাপী অভিযোগ এই যে, নারীদের কাছে কোনো কিছুর গোপনীয়তা রক্ষিত হয় না। পাশ্চাত্য জগতে গোয়েন্দাগিরির যেসব ঘটনা ঘটে, তাতে সাধারণত কোনো না কোনোভাবে মহিলারা জড়িত থাকে।

ইসলাম নারী শিক্ষার বাধা দেয় না। যতো উচ্চ শিক্ষা সম্ভব তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, তবে কয়েকটা শর্ত আছে। প্রথমত, তারা নিজেদের বিশেষ কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হতে পারে, এমন শিক্ষাই তাদেরকে দিতে হবে। হুবহু পুরুষদের শিক্ষা তাদেরকে দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, সহশিক্ষা চলবে না। নারীদেরকে নারীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষিকা দ্বারাই দিতে হবে। সহশিক্ষার সর্বনাশা কুফল পাশ্চাত্য জগতে এমন

প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে যে, এখন যাদের জ্ঞানচক্ষু একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, তারা ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকায় ১৭ বছর পর্যন্ত বয়সের যে মেয়েরা হাইস্কুলে পড়ে, সহশিক্ষার কারণে প্রতি বছর তাদের মধ্য থেকে গড়ে এক হাজার জন গর্ভবতী হয়ে পড়ে। যদিও এ পরিস্থিতি এখনো আমাদের দেশে দেখা দেয়নি তবে সহশিক্ষার কিছু কিছু সুফল আমাদের এখানেও দেখা দিতে শুরু করেছে। তৃতীয়ত, উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদের এমন প্রতিষ্ঠানাদিতে নিয়োগ করতে হবে, যা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহিলা হাসপাতাল ইত্যাদি। *(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৬২ খৃ.)*

ইসলামি রাষ্ট্রে সমাজ সংস্কার ও জনশিক্ষা কার্যক্রম

প্রশ্ন : ইসলামি সরকার কি নারী স্বাধীনতার ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতাকে শক্তি প্রয়োগে দমন করবে? বিচিত্র সাজসজ্জা, অর্ধ নগ্ন পোশাক, ও নিত্য নতুন ফ্যাশন ধারণের প্রবণতায় যেভাবে আধুনিকা নারীরা মেতে উঠছে, বিশেষত যুবতী মেয়েরা অত্যন্ত আটসাট ও মনমাতানো সুরভিত পোশাকে ভূষিত হয়ে রঙ বেরঙের প্রসাধনী শোভিত হয়ে এবং দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও উঁচুনীচুর প্রদর্শনী করে যেভাবে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে এবং আজকাল উঠতি বয়সের ছেলেরাও হলিউডের ছায়াছবি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেভাবে টেডি বয় সেজে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি প্রত্যেক মুসলিম ও অমুসলিম তরুণ তরুণীর লাগামহীন বেলেল্লাপনা রোধ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেবে? আইন লংঘনে তাদেরকে শাস্তি প্রদান এবং অভিভাবকদেরকে জরিমানা করবে? এটা করলে আবার তাদের নাগরিক অধিকার কি ক্ষুণ্ন হবে না? গার্লস গাইড, মহিলা সমিতি, ওয়াই এম সিএ (খৃস্টান যুব সমিতি) ওয়াই ডব্লিও সি এ (খৃস্টান যুবতী সমিতি) ইত্যাকার প্রতিষ্ঠান কি ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় বরদাশত করা হবে? নারীরা কি আদালত থেকে নিজেই তালাক নিতে পারবে এবং পুরুষদের একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করা হবে? ইসলামি আদালতের সামনে কি যুবক যুবতীরা কোর্ট ম্যারেজ (Civil marriage) করার অধিকারী হবে? নারীদের যুব উৎসব, খেলাধূলা, প্রদর্শনী, নাটক, নৃত্য, ছায়াছবি অথবা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কিংবা বিমানবালা হওয়ার উপর কি ইসলামি সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে? জাতীয় চরিত্রবিধ্বংসী সিনেমা, টেলিভিশন ও রেডিওতে অশ্লীল গান, অশ্লীল বইপুস্তক, বাজনা, নাচ ও ঢলাঢলিতে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কি বন্ধ করে দেয়া হবে, না এগুলোকে কল্যাণমূলক খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হবে?

জবাব : ইসলাম সমাজ সংস্কার ও জনশিক্ষার সকল কার্যক্রম কেবল আইনের ডাণ্ডার জোরে চালায় না। শিক্ষা, প্রচার ও জনমতের চাপ ইসলামের সংস্কার

কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এ সকল উপায় উপকরণ প্রয়োগের পরও যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে ইসলাম আইনগত ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণেও কুণ্ঠিত হয় না। নারীদের নগ্নতা ও বেহায়াপনা আসলেই একটা মারাত্মক ব্যাধি। কোনো যথার্থ ইসলামি সরকার এটা সহ্য করতে পারে না। সংশোধনের অন্যান্য পন্থা প্রয়োগে যদি এ ব্যাধি দূর না হয়, কিংবা তার কিছুটা অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলে আইনের সাহায্যে তা রোধ করতেই হবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এর নাম যদি নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়, তাহলে জুয়াড়িদের ধরপাকড় করা এবং পকেটমারদের শাস্তি দেওয়াও নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করার শামিল। সামাজিক জীবনে ব্যক্তির উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতেই হয়। ব্যক্তি নিজের স্বভাবগত অসৎ প্রবণতা এবং অন্যদের কাছ থেকে শেখা অপকর্ম দ্বারা সমাজকে দূষিত করুক এজন্য তাকে বলগাহীন ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না।

গার্লস গাইডের স্থান ইসলামে নেই। মহিলাদের সমিতি থাকতে পারে। তবে শর্ত এই যে, মহিলাদের মধ্যেই তার তৎপরতা সীমিত রাখতে হবে এবং মুখে কুরআনের বুলি কপচানো আর কাজে কুরআন বিরোধী দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। খৃস্টান যুবতী সমিতি খৃস্টান তরুণীদের জন্য থাকতে পারে। কিন্তু কোনো মুসলিম নারীকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। মুসলিম নারীরা যদি ইসলামি বিধানের আওতায় থেকে মুসলিম তরুণী সমিতি বানাতে চায় তবে বানাতে পারে।

মুসলিম নারী ইসলামি আদালতের মাধ্যমে 'খুলা' বিধির আওতায় বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। বিয়ে বাতিলকরণ (Nullification) এবং চির বিচ্ছেদ (Judicial seperation) এর ঘোষণাও আদালত থেকে লাভ করতে পারে। তবে শর্ত এই যে, শরিয়তের বিধি মোতাবেক এ ধরনের কোনো ঘোষণা অর্জনের যোগ্যতা তার মধ্যে থাকা চাই। কিন্তু তালাক (Divorce)-এর ক্ষমতা কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শুধু পুরুষকেই দিয়েছে। পুরুষের এই ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোনো আইনের নেই। কুরআনের নাম ভাঙ্গিয়ে যদি কুরআন বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয় তবে সেটা ভিন্ন কথা। তালাক দেওয়ার ক্ষমতা পুরুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং কোনো আদালত বা পঞ্চায়েত তাতে নাক গলাবে, এমন ধারণা রসূল সা. এর যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত গোটা ইসলামের ইতিহাসে অপরিচিত। এ ধারণা সরাসরি ইউরোপ থেকে আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে। যারা এটা আমদানি করেছে তারা একটিবারও চোখ মেলে দেখেনি যে, ইউরোপে তালাকের এ আইনের পটভূমি কি ছিলো এবং সেখানে এর কি কি কুফল দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে ঘরোয়া কেলেংকারীর হাড়ি যখন ঘর থেকে

বেরিয়ে হাটে বাজারে গিয়ে ভাঙবে, তখন আল্লাহর আইন সংশোধন করতে যাওয়ার পরিণতি কি হয় তা মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

পুরুষদের একাধিক বিয়ের উপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ বা তা রোধ করার ধারণাও একটা বিদেশী পণ্য, যাকে কুরআনের ভূয়া লাইসেন্স দেখিয়ে আমদানি করা হয়েছে। এটা এসেছে এমন সমাজ থেকে, যেখানে কোনো মহিলাকে যদি বিবাহিত স্ত্রীর উপস্থিতিতে রক্ষিতা করে রাখা হয়, তাহলে সেটা শুধু সহনীয়ই নয়, বরং তার অবৈধ সন্তানের অধিকার সংরক্ষণের কথাও ভাবা হয় (ফ্রান্সের উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে)। অথচ সেই মহিলাকেই যদি বিয়ে করা হয় তা হলে সেটা হয়ে যায় অপরাধ। যেনো যতো কড়াকড়ি কেবল হালালের বিরুদ্ধে, হারামের বিরুদ্ধে কিছুই নয়। আমার প্রশ্ন এই যে, কেউ যদি কুরআনের কও জানে তবে সে কি এই মূল্যবোধ (value) গ্রহণ করতে পারে? ব্যভিচার আইনত বৈধ হবে আর বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ হবে, এমন উদ্ভট দর্শন কি তার কাছে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে? এ ধরনের আইন প্রণয়নের একমাত্র পরিণাম এই হবে যে, মুসলমানদের সমাজে ব্যভিচারের ছড়াছড়ি হবে, বান্ধবী ও রক্ষিতার সংখ্যা বাড়বে, কেবল দ্বিতীয় স্ত্রীর অস্তিত্ব থাকবে না। এ ধরনের সমাজ কাঠামোগত দিক দিয়ে ইসলামের আসল সমাজ থেকে অনেক দূরে এবং পাশ্চাত্য সমাজের অনেক কাছাকাছি হবে। এ ধরনের পরিস্থিতির কথা ভাবতে কারো ভালো লাগে তো লাগুক, কোনো মুসলমানের কাছে এটা ভালো লাগতে পারে না।

কোর্ট ম্যারেজের প্রশ্ন কোনো মুসলিম নারীর বেলায় যে ওঠেইনা, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এ প্রশ্ন ওঠে কেবল কোনো মোশরেক, খৃস্টান কিংবা ইহুদী নারীকে বিয়ে করার বেলায়। এ ধরনের বিধর্মী মহিলা ইসলামি আইনমতে ইসলাম গ্রহণপূর্বক কোনো মুসলমানকে বিয়ে করতে প্রস্তুত থাকে না। অথচ মুসলমান পুরুষ তার প্রেমে মজে গিয়ে কোনো ধর্মের কড়াকড়ি তাকে মানতে হবে না, এই অঙ্গীকার দিয়ে তাকে বিয়ে করে। এ ধরনের কাজ কারোর যদি করতেই হয় তবে তার ইসলামের ফতোয়া নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে কিসে? ইসলাম তার অনুগত লোককে এ কাজের অনুমতি কেন দেবে? মুসলমানদের এ ধরনের বিয়ে দেওয়াটা ইসলামি আদালতের দায়িত্ব হলোই বা কবে থেকে।

একটা ইসলামি সরকারও যদি যুব উৎসব (Youth festival), খেলাখুলা, নাটক, নাচগান ও সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মুসলিম নারীদের টেনে আনে অথবা বিমানবালা নিয়োগ করে যাত্রীদের মনোরঞ্জনের কাজ নেয়, তাহলে আমি জানতে চাই যে, ইসলামি সরকারের আর প্রয়োজন কি? এসব কাজ তো কুফরী সমাজে এবং কাফের শাসিত রাষ্ট্রে সহজেই হতে পারে। সেখানে বরং এ কাজ আরো অবাধে হওয়া সম্ভব।

সিনেমা, ফিল্ম, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি আল্লাহর সৃষ্টি করা জাগতিক শক্তি ছাড়া কিছু নয়। এগুলোতে সৃষ্টিগতভাবে দোষের কিছু নেই। এগুলোর চরিত্র বিধ্বংসী ব্যবহারটাই শুধু দূষণীয়। এগুলোকে মানুষের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা এবং নৈতিক বিচ্যুতির কাজে ব্যবহারের পথ বন্ধ করাই ইসলামি সরকারের একমাত্র কাজ। *(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৬২ খৃ.)*

পাকিস্তানে শরিয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগ প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামির বিরোধী মহল সামরিক আইন চালু হওয়ার পূর্বে যে অপপ্রচারের অভিযান চালিয়ে আসছিলো, সামরিক আইন উঠে যাওয়ার পর আবার সেই অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা আপনার ও জামায়াতে ইসলামির দুর্নাম রটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বিশেষ কয়েকটা পত্রিকা দেখলেই ব্যাপারটা বুঝা যায়। সাধারণ সভাসমাবেশে এসব ব্যক্তির বক্তৃতায় এ জাতীয় কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে এবং তা ইতিমধ্যে জনসমক্ষে এসে গেছে।

এ প্রসঙ্গে তারা সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে যে কথা প্রচার করছে তা হলো, মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তানে শরিয়তের দণ্ডবিধি চালু করাকে যুলুম বলে অভিহিত করে থাকেন। সম্প্রতি জনৈক বিশিষ্ট আলেম জাতীয় পরিষদে আপনার সম্পর্কে এ ধরনের একটা বিবৃতি দিয়েছেন এবং তা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তাদের বক্তব্য এই যে, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আমরা যখন অপরাধ দমনের জন্য শরিয়তের দণ্ডবিধি প্রবর্তনের জন্য কোনো বিল উত্থাপন করি, তখন নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী মহলের পক্ষ থেকে এই যুক্তি দিয়ে আমাদের বিরোধিতা করা হয় যে, পাকিস্তানের মিশ্র সমাজে ইসলামি দণ্ডবিধি চালু করাকে 'যুলুম' আখ্যায়িত করে মাওলানা মওদূদী ফতোয়া দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে এই মহল মাওলানা মওদূদীর লেখা পড়ে আমাদেরকে শোনায়। এসব আলেম পরিষদের বাইরে এসে জনগণকে বলেন যে, পাকিস্তানে ইসলামি বিধান কায়েম করা শরিয়ত নির্ধারিত চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ড (হুদুদ ও কিসাস) চালু করা এবং অন্যান্য শাস্তি বলবৎ করার পথে সবচেয়ে বেশি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে তারাই, যারা এ দেশে ইসলামি শাসন চালু করার পক্ষে লম্বা লম্বা বুলি আওড়ায়, অর্থাৎ আপনি এবং জামায়াতে ইসলামি।

এ ধরনের কথাবার্তা এখন শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মহলের বৈঠকেই শুরু হয়ে গেছে। এসব আলাপ আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের যে প্রভাব শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর মানুষের উপর ব্যাপকভাবে পড়ছে, তা শুভ নয়। বরং তারা নতুন নতুন ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এর কুফল সুদূরপ্রসারী হবে এবং ইসলাম ও মুসলিম জনতার জন্য তা বিপজ্জনক হবে। এর ফলে জামায়াতের কর্মীদেরও পদে পদে সমস্যার সম্মুখীন হবার প্রবল আশংকা রয়েছে।

এ ব্যাপারে আপনার কোনো ব্যাখ্যা আমার চোখে পড়েনি। পাকিস্তানে বর্তমান পরিস্থিতিতে শরিয়তের নির্ধারিত দণ্ডবিধি বলবৎ করার ব্যাপারে আপনার মতামত বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, এমন কোনো নিবন্ধও আপনার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হতে দেখিনি।

জবাব : আপনার সদুপদেশ ও হিতকামনাকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই ব্যক্তিবর্গ যে তামাশায় মেতে উঠেছে, তার পেছনে কি মনোবৃত্তি লুকিয়ে রয়েছে সেটা আপনি তলিয়ে দেখেননি। ইসলামি দণ্ডবিধি সংক্রান্ত আমার একটি উক্তির বিশেষ অর্থ বের করে যত্রতত্র তা প্রচারের যে কাজটি তারা করে যাচ্ছেন, সে কাজটি করা কি আন্তরিকভাবে পাকিস্তানের শরিয়তের আইন চালু হওয়ার বাসনা পোষণকারী কোনো ব্যক্তির পক্ষে সমীচীন? যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে এটা কামনা করে তার পক্ষে তো দণ্ডবিধির ব্যাপারটাকে সমগ্র মুসলিম জাতির সর্বসম্মত অভিমতের আকারেই তুলে ধরার কথা। কিন্তু তা না করে ইসলামের যে খাদেম বছরের পর বছর ধরে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের জন্য অব্যাহতভাবে সংগ্রাম করে যাচ্ছে, তাকে তারা ইসলামি দণ্ডবিধির বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং সারা দুনিয়ার সামনে তার নামে এ কথা রটাচ্ছেন যে, পাকিস্তানে শরিয়তের শাস্তি চালু করাকে সে যুলুম বলে অভিহিত করে। আমার প্রশ্ন এই যে, আমার সেই উক্তিটার এ ধরনের অর্থ কি আমি ব্যক্ত করেছি, না তারাই করেছেন? আর সেই উক্তিটার এরূপ ব্যাপক প্রচার আমি করেছি, না তারাই করছেন? সেই উক্তিটাকে দণ্ডবিধি প্রচলনের পথে বাধা হিসেবে আমি দাঁড় করাচ্ছি, না তারাই দাঁড় করাচ্ছেন? আজ তারা চরম ধাপ্পাবাজির আশ্রয় নিয়ে বলছেন যে, আমরা যখন শরিয়তের দণ্ডবিধি চালু করার জন্য কোনো বিল উত্থাপন করি, তখন মাওলানা মওদূদী অমুক অমুক ফতোয়া দিয়েছেন এই অজুহাত তুলে ইসলাম বিরোধী সদস্যরা আমাদের বিরোধিতা করে। তাদের কাছে একটু জিজ্ঞাসা করুন যে, মওদূদীর এই তথাকথিত ফতোয়া ইসলামবিরোধী সদস্যদের কানে আপনারা ছাড়া কে দিয়েছে। আপনারাই তো মওদূদীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে তার একটি উক্তিকে জোরপূর্বক শরিয়তের দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে ফতোয়া বলে চিত্রিত করছেন এবং তাকে ক্রমাগত রটিয়ে চলেছেন, যাতে ইসলাম বিরোধীরা তাকে আপন কুমতলব চরিতার্থ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

আর ব্যাপারটা শুধু আমার একটি উক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিনিয়তই আমার বই পুস্তক কিংবা নিবন্ধের ভেতর থেকে একটা না একটা উদ্ভট জিনিস বের করা হচ্ছে এবং আমার উপর এক একটা নতুন অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে। দেওবন্দের প্রবীণ আলেমের সাথে বেরেলভীরা যে আচরণ করে থাকে, আমার সাথেও সেই

আচরণ করা হচ্ছে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, আল্লাহ ও আখিরাতের চিন্তা তাদের একেবারেই নেই। সত্য বলতে কি, তাদের কথাবার্তায় সততা দূরের কথা, ভদ্রতারও কোনো নামগন্ধ নেই। তাই আমি স্থির করেছি তাদের কোনো কথায় কর্ণপাত করবো না এবং ধৈর্যের সাথে নিজের কাজ চালিয়ে যাবো।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

"অন্যায় আচরণকারীরা অচিরেই টের পাবে তারা কোন দিকে গড়িয়ে চলেছে?" *(সূরা শুয়ারা : ২২৭)*

প্রশ্ন : "তাফহীমাত' গ্রন্থের 'হাত কাটা এবং শরিয়তের অন্যান্য দণ্ড' শীর্ষক নিবন্ধ নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবত বিতর্ক চলছে। এ ব্যাপারে জনাব মুফতী... সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি নিবন্ধটা মনোনিবেশ সহকারে পড়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করার নিদের্শ দিয়েছেন :

১. ইসলামের আইন ও মূলনীতি যে অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য, এ কথা অকাট্য সত্য কি না? না, এতে কোনো ফাঁক ফোকর আছে? অর্থাৎ, সরকার যদি শরিয়তের দণ্ডবিধি কার্যকর করার আইন প্রবর্তন করে এবং বিচারক মণ্ডলী এসব আইন

বাস্তবে প্রয়োগের অনুমতি লাভ করে, কিন্তু সমাজের অবস্থা এখন যেমন আছে তেমনই থাকে এবং সমাজ সংস্কারের কোনো আইন জারি করাই না হয়, তাহলে সে অবস্থায় শরিয়তসম্মতভাবে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর পাথর মেরে হত্যা করা ও বেত্রদণ্ড দান যুলুম হবে কি না?

২. তাফহীমাতে আপনি লিখেছেন যে, বিয়ে, তালাক ও পর্দা সংক্রান্ত ইসলামি আইন এবং নর নারীর পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় ইসলামি নৈতিক শিক্ষার সাথে ব্যভিচারের দণ্ডের গভীর ও অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে।

অথচ উল্লিখিত অবস্থায় এ যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। যারা এ কাজ (সমাজ শুদ্ধি ছাড়াই দণ্ডবিধির প্রচলন) করবে, তারা (সংসদ অথবা সরকার) নিঃসন্দেহে একটা অন্যায় কাজ করার দায়ে দোষী হবে। কিন্তু এ আইন অনুসারে আদালত যে রায় দেবে এবং যে দণ্ড প্রয়োগ করবে, তা কি যুলুম বলে গণ্য হবে?

৩. সমাজ সংস্কারের জন্য কি কিছুকাল ইসলামি দণ্ডবিধি প্রয়োগ স্থগিত রাখা উচিত? ইসলামি বিধি চালু করার ব্যাপারে কি কোনো ধারাবাহিকতা মেনে চলা বাঞ্ছনীয়?

জবাব : আমার উক্ত নিবন্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন করার আগে নিবন্ধের শেষে তা লেখার যে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা দেখে নিলে ভালো হতো এবং নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় কি তাও জেনে নেওয়া দরকার ছিলো। তাফহীমাত দ্বিতীয় খণ্ডে

যেখানে এই নিবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে, সেখানে তার শেষেই বলা হয়েছে যে, নিবন্ধটি ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে লেখা। শরিয়তের দণ্ডবিধি জারি করা হবে কিনা একথা ভাবতে পারে এমন কোনো সরকার তখন ছিলো না। কাজেই এ ব্যাপারে সরকারের করণীয় কি এবং কিভাবে দণ্ডবিধি চালু করা যায় সেটা আলোচনা করা ঐ নিবন্ধের উদ্দেশ্য ছিলো না। নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিলো যারা ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ এবং চুরির শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তিকে অত্যধিক কঠোর ও নৃশংস আখ্যায়িত করে থাকে, তাদেরকে যথোপযুক্ত জবাব দেওয়া। জবাবে তাদেরকে বুঝানো হয়েছিল যে, ইসলাম এসব অপরাধে শুধু শাস্তিই দেয় না, বরং সেই সাথে সমাজে যেসব কারণ দেখা দিলে মানুষ অপরাধে লিপ্ত হয়, সেসব কারণের প্রতিকার ও প্রতিরোধও করে। তোমরা ইসলামের এই সংস্কার পরিকল্পনার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে প্রথমে এমন একটা সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করো যেখানে যাবতীয় পাপাচার বৃদ্ধির উপায় উপকরণ বিদ্যমান, অত:পর এই ভেবে চিৎকার করে ওঠ যে, এই পরিবেশ ও পরিস্থিতি বহাল রেখে ইসলামের কেবল দণ্ডবিধিটিই চালু করে দেয়া হবে। এ কারণেই তোমাদের কাছে এ দণ্ডগুলো সীমাতিরিক্ত কঠোর মনে হয়। এ আলোচনা থেকে যারা আমাকে শরিয়তের দণ্ডবিধি প্রচলনের বিরোধী বলে চিত্রিত করে, তারা কতখানি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং তাদের এ উদ্ভট অবিচার কতখানি ভ্রুক্ষেপযোগ্য?

এবার মুফতী সাহেবের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি :

বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি কোনো মুসলিম সরকার ইসলামের সকল আইন ও বিধান এবং তার সমস্ত সংস্কারমূলক নির্দেশাবলীকে স্থগিত রেখে শুধুমাত্র তার দণ্ডবিধি আইনকে আলাদাভাবে বলবত করে এবং আদালতের মাধ্যমে তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়, তাহলে যে বিচারক কোনো ব্যভিচারী, চোর বা মদখোরের উপর দণ্ড কার্যকরী করার নির্দেশ দেবে, সে যালেম বিবেচিত হবে না বটে, কিন্তু যে সরকার আল্লাহর শরিয়তের একাংশকে শিকেয় তুলে রেখে অপর অংশকে চালু করার সিদ্ধান্ত নিলো, সে অবশ্যই যুলুমের দায়ে দোষী হবে। এ ধরনের সরকারের ক্ষেত্রে আমি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে প্রযোজ্য মনে করি :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ

"তবে কি তোমরা আল্লাহর কিতাবের একাংশের প্রতি ঈমান আনছো, আর অপর অংশ অমান্য করছো? তোমাদের মধ্যে যারা এমন কাজ করে তাদের দুনিয়ার জীবনেও লাঞ্ছনা এবং কেয়ামতের দিনও কঠোরতম আজাব ভোগ করা ছাড়া আর

কি পরিণতি হতে পারে?" (সূরা বাকারা ৮৫)। বস্তুত যে সরকার নিজেই মদ উৎপাদন ও বিক্রির লাইসেন্স দেয় এবং যে সরকারের অনুষ্ঠানাদিতে স্বয়ং সরকারি কর্মকার্তারা এবং তার আদরের অতিথিরা মদ খায়, তার আইনে যদি মদখোরের জন্য ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি বিধান করা হয়, তবে সে সরকারকে ইসলামি সরকার বলা সঙ্গত হয় বলে আমি স্বীকার করি না। একদিকে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রচলন করা হবে, যুবক যুবতীদেরকে এক সাথে কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করা হবে, অফিস আদালতে পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েদেরকে কাজে নিয়োগ করা হবে, নগ্ন ছবি, অশ্লীল ছায়াছবি ও কুরুচিপূর্ণ বইপত্রের ছড়াছড়ি হবে, ১৬ বছরের কম বয়সী মেয়ে এবং ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলেদের বিয়েকে আইনত নিষিদ্ধ করা হবে, আর অপরদিকে ব্যভিচারের জন্য পাথর মেরে হত্যা ও বেত মারার শাস্তি দেয়া হবে, এ অবস্থাকে আমি ইসলামি আইনের যথার্থ প্রয়োগ বলে মানি না। যে সরকার নিজেই সুদ ও জুয়াকে বৈধ করে এবং তার ব্যাপক প্রচলনের ব্যবস্থা করে সেই সরকার চোরের হাত কাটার আইন জারি করে ইসলামি আইন প্রয়োগকারী সরকার বলে বিবেচিত হতে পারে, এ কথা আমি কস্মিনকালেও মেনে নিতে পারি না। যদি কোনো আলেম এ ধরনের পরস্পর বিরোধী কর্মকাণ্ডকে জায়েয মনে করেন এবং তার মতে যদি শরিয়তকে টুকরো টুকরো করা এবং তার কিছু অংশকে গ্রহণ ও কিছু অংশকে বর্জন করা যুলুম না হয় বরং সেটা একটা সৎ কাজ হয়, তবে তিনি যেনো তার পক্ষে প্রমাণ উপস্থান করেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বর্তমান অবস্থায় শরিয়তের দণ্ডবিধি চালু করা জায়েয কি নাজায়েয, এই নিরেট আইনগত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে শুধু আইনবিধিই দেননি, বরং সেই সাথে কৌশল, প্রজ্ঞা এবং ধীশক্তিও দান করেছেন। দীর্ঘকালব্যাপী কুফরী ও পাপাচারমূলক শাসনব্যবস্থার আওতাধীন থাকার কারণে আমাদের দেশে যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজ বর্তমান কিভাবে করা উচিত, সেটা ঐ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তি প্রয়োগ করেই আমাদেরকে স্থির করতে হবে। ইসলামি শরিয়তকে আমি যতোটা বুঝেছি, তার বিধি ব্যবস্থায় সংস্কার ও সংশোধন প্রক্রিয়া, উপায় উপকরণ প্রতিরোধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে পরিপূর্ণ ভারসাম্য স্থাপন করা হয়েছে। শরিয়ত একদিকে আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে চরিত্র সংশোধন ও প্রকৃতির পবিত্রতা সাধনের পদ্ধতি অবহিত করেছে। অপরদিকে বিকৃতি ও বিভ্রান্তির কারণ দূর করার উপায় নির্দেশ করেছে। এর পাশাপাশি তৃতীয় ব্যবস্থা হিসেবে আমাদেরকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার একটা আইনও দিয়েছে। যাবতীয় সংশোধন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও যদি কোথাও বিকৃতি দেখা দেয়, তা হলে তা কঠোরভাবে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা।

এই গোটা প্রক্রিয়াকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করেই শরিয়তের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। একে বিভক্ত করে এর এক অংশ বাদ দিয়ে অপর অংশ বাস্তবায়িত করা ইসলামি কৌশল ও প্রজ্ঞার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে অংশটুকু আমরা বাস্তবায়িত করছি তার হুকুম কুরআনে আছে, শুধু এ যুক্তি দিয়েই একে বৈধ প্রমাণ করা যায় না। এ যুক্তিকে একজন চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রের আংশিক বাস্তবায়নের সাথে তুলনা করা যায়। একজন দক্ষ চিকিৎসকের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র একজন হাতুড়ে চিকিৎসকের হাতে পড়লো এবং সে তার অনেকগুলো ওষুধের মধ্যে থেকে মাত্র দু'একটা ওষুধ বাছাই করে রোগীকে সেবন করালো, আর এতে কেউ আপত্তি তুললে তার মুখ বন্ধ করার জন্য সে বললো, আরে, যে ক'টি ওষুধ আমি খাওয়াচ্ছি তাতো ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রেই রয়েছে। তার এ যুক্তির জবাবে আপনি নিশ্চয়ই এ কথাই বলবেন যে, মিয়া, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে তো ঠাণ্ডা ও কড়া উভয় রকমের ওষুধ ছিলো। তুমি তা থেকে কেবল কড়া ওষুধই রোগীকে খাওয়াচ্ছো আর ডাক্তারের নাম নিয়ে বলছো যে, আমি তো তার ব্যবস্থাপত্র অনুসারেই রোগীকে ওষুধ খাওয়াচ্ছি। ডাক্তার কি কখনো তোমাকে একথা বলেছিলো যে, আমার ব্যবস্থাপত্র থেকে যে ওষুধটা ইচ্ছা বেছে নিও এবং যে রোগীকে মনে চায় খাইয়ে দিও?

এই সাথে এ কথাও ভাবতে হবে যে, শরিয়ত কি তার বিধি ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য ঈমানদার ও পরহেজগার কর্মী চায় না ফাসেক পাপিষ্ঠ কর্মী চায়, যারা ইসলামের বিধানকে ন্যায়সঙ্গত বলেও মানেনা? এ ক্ষেত্রে নিছক জায়েয হওয়া বা নাজায়েয হওয়ার আইনগত আলোচনা সমস্যার সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। নিরেট আইনের দৃষ্টিতে কোনো কাজ জায়েয হলেও এ প্রশ্ন থেকে যায় যে, কাজটা ইসলামের কৌশলগত দিক দিয়ে ঠিক কিনা। যেসব কর্মচারী ও কর্মকর্তার অধিকাংশ ঘুষখোর, দুর্নীতিপরায়ণ, চরিত্রহীন এবং আল্লাহ ও আখেরাতের ভয় ভীতিমুক্ত এবং যাদের একটি বিরাট অংশ বিশ্বাসের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য আইনকে ন্যায়সঙ্গত আর ইসলামের আইনকে ভুল ও সেকেলে মনে করে, তাদের দ্বারা শরিয়তের বিধান কার্যকর করাটা কি ইসলামি কৌশল ও প্রজ্ঞার দাবিতে উত্তীর্ণ? আমি তো মনে করি, ইসলামকে সারা দুনিয়ায় দুর্নামগ্রস্ত করা এবং স্বয়ং মুসলিম জনগণকে ইসলাম থেকে হতাশ করে দেওয়ার ব্যাপারে চরিত্রহীন কর্মচারীদের হাতে শরিয়তের বিধি চালু করার চেয়ে কার্যকর পন্থা আর কিছু হতে পারে না। দু'চারজন মানুষের বিরুদ্ধে যদি মিথ্যা মামলা দায়ের করে চুরি ও ব্যভিচারের দণ্ড কার্যকর করা হয় তাহলে আপনি দেখবেন যে, এ দেশে শরিয়তের দণ্ডবিধির কথা মুখে আনাই কঠিন হয়ে পড়বে এবং এভাবে ইসলামের ব্যর্থতার কথাই দুনিয়াময়

ঢোল পিটিয়ে জানানো হবে। সুতরাং আমরা যদি যথার্থভাবে ইসলামের কিছু খেদমত করতে চাই, তার সাথে শত্রুতা করতে না চাই, তাহলে প্রথমে আমাদেরকে চেষ্টা চালাতে হবে যেনো দেশের পরিচালনার ভার এমন লোকদের হাতে আসে, যারা ইসলামকে সঠিকভাবে জানে ও বুঝে আর আন্তরিকতার সাথে তা কার্যকর করতেও ইচ্ছুক হয়। এরপরই ইসলামের সমগ্র সংস্কার পরিকল্পনাকে সর্বদিক দিয়ে সর্বতোভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে আর এরই অংশ হিসেবে শরিয়তের দণ্ডবিধিও সুষ্ঠুভাবে চালু করা সম্ভব হবে। এ কাজটি অতিশয় ধৈর্য ও প্রজ্ঞা সাপেক্ষ। আজ আইনসভায় একটা দু'টো আসন পাওয়া গেলো, আর কালই ইসলামি দণ্ডবিধি চালু করার জন্য আইনের খসড়া সম্বলিত বিল উত্থাপন করা হলো, এতোটা সহজ ব্যাপার এটা নয়।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা অনুধাবন করা প্রয়োজন। একটা মুসলিম দেশে দু'রকম অবস্থা দেখা দিতে পারে। একটা অবস্থা এই যে, দেশে আগে থেকে ইসলামি আইন চলে আসছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে অধঃপতনের সূচনা হয়ে অবস্থা এ পর্যায়ে নেমে এসেছে যে, শরিয়তের কিছু কিছু অংশ পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। যে কয়টি অংশ চালু আছে তাও চরিত্রহীন ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের হাতে চালু রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে ইসলামি প্রজ্ঞা এটা দাবি করেনা যে, শরিয়তের যেটুকু চালু আছে, তাও পরিত্যাগ করা হোক। বরং প্রজ্ঞার দাবি এই হবে যে, সাধারণ সংস্কারের চেষ্টার মাধ্যমে একদিকে সৎ লোকদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে হবে, অপরদিকে শরিয়তের বাদবাকী অংশগুলোকেও চালু করতে হবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, কুফরী ও পাপাচারের সয়লাবে সবকিছু ভেসে গেছে, এখন আমাদেরকে নতুন করে গড়ার সূচনা করতে হবে। এরূপ অবস্থা যেখানে দেখা দিয়েছে, সেখানে যে আমাদেরকে ভিত্ থেকেই কাজ শুরু করতে হবে, উপরের তালাগুলো থেকে কাজ শুরু করলে চলবে না, সে কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। *(তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৬২)*

সংবিধান ব্যাখ্যার অধিকার

প্রশ্ন : সংবিধানের ব্যাখ্যার অধিকার কার থাকা উচিৎ আইনসভার না আদালতের? পূর্বে এ অধিকার আদালতের ছিলো, বর্তমান সংবিধানে এ অধিকার আদালতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আইনসভাকে দেয়া হয়েছে। এতে আপত্তি উঠেছে যে, বিচার বিভাগের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এ অধিকার বিচার বিভাগের হাতে বহাল রাখার দাবি উঠেছে। এ সম্পর্কে এক ভদ্রলোক বলেছেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আদালতের কাজ ছিলো শুধু বিরোধ মীমাংসা করা। আইনের ব্যাখ্যা

বিশ্লেষণের অধিকার আদালতের ছিলো না। আইন শুদ্ধ না ভুল, সেটা বলার এখতিয়ার আদালতের ছিলো না। এই বক্তব্য কতোখানি সঠিক?[১]

জবাব বর্তমান যুগের আইনগত ও সাংবিধানিক সমস্যাবলীতে ইসলামের প্রাথমিক যুগের নজির প্রয়োগ করার প্রবণতা আজকাল খুবই বেড়ে গেছে। কিন্তু যারা এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করেন, তারা তৎকালীন সমাজের সাথে এ যুগের সমাজের এবং তৎকালীন শাসকদের সাথে এ যুগের শাসকদের আকাশ পাতাল ব্যবধানের দিকটা লক্ষ্য করেন না।

খেলাফতে রাশেদার যুগে খলিফা স্বয়ং কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে একজন মস্ত বড় আলেম হতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে খোদাভীতির প্রাবল্যের কারণে জনগণ তাঁর প্রতি আস্থাশীল থাকতো যে, জীবনের কোনো ব্যাপারে তিনি যদি নিজস্ব চিন্তা গবেষণা ও বিচার বিবেচনার (ইজতিহাদ) ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তবে তা কখনো ইসলামের আদর্শবিরোধী সিদ্ধান্ত হবে না। তখন মজলিসে শূরার (পরামর্শ পরিষদ) সদস্যদের সকলেই ব্যতিক্রমহীনভাবে ইসলামের সর্বোত্তম পারদর্শী ও জ্ঞানী ব্যক্তি বিবেচিত হওয়ার কারণেই সদস্যপদের মর্যাদা লাভ করতেন। ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী নয়, স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে ইসলামকে বিকৃত করে, অথবা তার দ্বারা কোনো বেদয়াতী কার্যকলাপ কিংবা অনৈসলামিক প্রবণতার আশংকা থাকে, এমন কোনো ব্যক্তি তাদের দলে স্থান পেতো না। সমাজের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের জীবনে তখন ইসলামি ভাবধারার ছাপ বিদ্যমান ছিলো। সেখানে এমন পরিবেশ বিরাজ করতো যে, ইসলামের বিধান ও তার আদর্শগত চেতনার পরিপন্থী কোনো নির্দেশ বা আইনবিধি জারি করার ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যই কেউ দেখাতে পারতো না। তৎকালীন আদালতের মানদণ্ড ছিলো একই রকম উন্নত। বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হতেন তারাই, যারা কুআন ও সুন্নাহ্তে গভীর দক্ষতার অধিকারী হতেন, সর্বোচ্চ মানের মুত্তাকী ও পরহেজগার হতেন এবং আল্লাহর আইনকে চুল পরিমাণও লংঘন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ পরিস্থিতিতে আইনসভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ধরন যেমন হওয়ার কথা, তেমনই ছিলো। সকল বিচারক মামলার বিচার সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে করতেন, আর যেসব ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ্তে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় ইজতিহাদ করার প্রয়োজন দেখা দিতো, সে ক্ষেত্রে তারা সাধারণত নিজেরাই ইজতিহাদ করতেন। যেখানে বিচার্য বিষয় এমন ধরনের হতো যে, বিচারকের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ দ্বারা ফায়সালা করার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরিয়তের বিধান কি, সেটা খলিফার মজলিসে শূরা কর্তৃক নির্ণীত হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হতো, সে ক্ষেত্রে সামষ্টিক ইজতিহাদ দ্বারা ইসলামের মূলনীতিসমূহের

---

১. উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে এবং সংবিধানের ব্যাখ্যার অধিকার বিচার বিভাগকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাথে অধিকতর সঙ্গতিশীল একটা বিধি তৈরি করা হতো। এরূপ কর্মপদ্ধতি যেখানে অনুসৃত হতো, সেখানে বিচারকদের মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা রদবদলের অধিকার থাকার কোনো কারণ ছিলো না। কেননা তারা যদি কোনো আইন রদ করার অধিকারী হতেন তবে কেবল এজন্যই হতে পারতেন যে, সে আইন আসল সংবিধানের (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্র) বিরোধী। অথচ যে ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, সে ব্যাপারে তখন আদৌ আইন প্রণয়ন করাই হতো না। আইন প্রণয়নের প্রয়োজন শুধু সেই ক্ষেত্রে দেখা দিতো, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ না থাকা হেতু কুরআন ও সুন্নাহ্র সাধারণ নীতিমালা ও ভাবধারার ভিত্তিতে চিন্তা গবেষণা চালিয়ে উপযুক্ত নীতি ও বিধি উদ্ভাবন (অর্থাৎ ইজতিহাদ) অপরিহার্য হয়ে দেখা দিতো। আর এটা সুবিদিত যে, এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের তুলনায় সামষ্টিক ইজতিহাদই অধিকতর নির্ভরযোগ্য হতে সক্ষম। ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত ইজতিহাদপ্রসূত মতামত এই সামষ্টিক ইজতিহাদ থেকে ভিন্নতর হলেও তাতে কিছু আসে যায় না।

সে কালের এই সাংবিধানিক দৃষ্টান্ত আজকের পরিস্থিতিতে কোনোক্রমেই লাগসই হতে পারে না। আজকের শাসকবৃন্দের এবং আইনসভার সদস্যদের যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাদের মজলিসে শূরার সদস্যদের সাথে কোনো তুলনা হয় না, তেমনি আজকের বিচারকরাও তৎকালীন বিচারকদের মতো নয়। আর আজকের আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াতেও তৎকালীন আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের শর্তাবলী ও মান অনুসৃত হয় না। এমতাবস্থায় আমাদের গ্রহণযোগ্য একমাত্র কর্মপন্থা এই যে, আমাদের সাংবিধানিক বিধিমালা সমসাময়িক পরিস্থির আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। খেলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্তসমূহ প্রয়োগ করার আগে তৎকালীন সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে, যার পটভূমিতে ঐ দৃষ্টান্তগুলোর কার্যত উদ্ভব হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে শরিয়ত সংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার প্রশাসনকেও অর্পণ করা যায় না, আইনসভার হাতেও ন্যস্ত করা যায় না, বিচার বিভাগ কিংবা উপদেষ্টা পরিষদের হাতেও ছেড়ে দেওয়া যায় না। এইসব প্রতিষ্ঠানের একটিও এমন নয় যে, শরিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের উপর মুসলমান জনগণ পূর্ণমাত্রায় আস্থা স্থাপন করতে পারে। যে ইজতিহাদ শরিয়তকে বিকৃত করে, তা থেকে নিরাপদে থাকার জন্য মুসলিম জনমতকে জাগ্রত করা এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতিকে এ ধরনের যে কোনো ইজতিহাদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যেসব শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে শরিয়ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক কোনো বিধান দেয় না, সে ক্ষেত্রে আইনসভাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া বর্তমান অবস্থায় নিরাপদ নয়। এজন্য একটা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে সাংবিধানিক সীমালংঘন করছে কিনা, সেটা পর্যবেক্ষণ করাই

হবে ঐ নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানটির কাজ। বিচার বিভাগ ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠান যে, এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। *(তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৬২ খৃ.)*

ইসলাম ও গণতন্ত্র

প্রশ্ন : গণতন্ত্রকে আজকাল উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কেও এরূপ ধারণাই পোষণ করা হয়ে থাকে যে, তা বহুলাংশে গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে গণতন্ত্রে বেশ কিছু ক্রটি রয়েছে। আমি জানতে চাই যে, ইসলাম ঐ ক্রটিগুলো কিভাবে শুধরাতে পারে। ক্রটিগুলো নিম্নরূপ :

১. অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার মতো গণতন্ত্রেও শাসন ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনগণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কার্যত গুটিকয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং বিবেক বেচা কেনায় প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়। এভাবে ধনিক শ্রেণীর শাসন (Plutocracy বা Obgrachy) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপক্রম হয়। এ সমস্যার সমাধানের উপায় কি?

২. জনসাধারণের রকমারি ও পরস্পরবিরোধী স্বার্থ একই সাথে রক্ষা করা মনস্তাত্তিকভাবে খুবই দূরূহ কাজ। সর্বস্তরের মানুষের এ দায়িত্ব পালনে গণতন্ত্র কিভাবে সফল হতে পারে?

৩. জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিরক্ষর, সরল, অনুভূতিহীন এবং ব্যক্তিপূজারী। স্বার্থপর লোকেরা অনবরত তাদেরকে বিপথগামী করে থাকে। এমতাবস্থায় প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করা খুবই কঠিন।

৪. জনগণের ভোটে যেসব নির্বাচিত ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তার সদস্য সংখ্যা খুব বেশি হয়ে থাকে। তাদের পারস্পরিক বিতর্ক ও আলাপ পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আপনার ধারণামতে ইসলাম স্বীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব ক্রটি থেকে কিভাবে রক্ষা করবে, এটা বুঝতে আমাকে সাহায্য করবেন।

জবাব : আপনি গণতন্ত্রের যে ক'টি ক্রটি তুলে ধরেছেন, তার সব কয়টিই যথার্থ। কিন্তু এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মত স্থির করার আগে আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা জরুরি।

পয়লা বিবেচ্য বিষয় হলো, মানুষের সামষ্টিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নীতিগতভাবে কোন্ পদ্ধতিটা সঠিক? এর দু'টো পদ্ধতি হতে পারে। প্রথমটা এই যে, যাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে তাদের মর্জি অনুসারে শাসক বা পরিচালক নিয়োগ করতে হবে। সেই পরিচালক তাদের ইচ্ছা ও পরামর্শক্রমে

কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এবং যতোক্ষণ তাদের আস্থা ঐ পরিচালকের উপর থাকবে, কেবল ততোক্ষণই সে পরিচালক বা শাসক হিসেবে বহাল থাকবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেই শাসক বা পরিচালক হয়ে জেঁকে বসবে, নিজের ইচ্ছা মতোই সব কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং যাদের কর্মকাণ্ড সে পরিচালনা করে, তাদের নিয়োগ, কার্যনির্বাহ ও পদচ্যুতিতে তাদের বলার বা করার কিছু থাকবে না এ দু'টো পদ্ধতির মধ্যে প্রথম পদ্ধতিটাই যদি সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় পদ্ধতির দিকে যাওয়ার পথ শুরুতেই বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত এবং প্রথম পদ্ধতিটা বাস্তবায়নের সর্বোত্তম উপায় কি হতে পারে সেটাই হওয়া উচিত একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই যে, গণতন্ত্রের মৌল আদর্শ বাস্তবায়নের যে রকমারি কর্মপন্থা বিভিন্ন যুগে অবলম্বন করা হয়েছে অথবা উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার বিশদ বিবরণে না গিয়েও সেগুলোকে যদি শুধু এই দিক দিয়ে বিচার করা হয় যে, গণতন্ত্রের মৌল আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে তা কতোখানি সফল হয়েছে, তাহলে তার ব্যর্থতার তিনটি প্রধান কারণ দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথম কারণটি এই যে, জনগণকে সার্বভৌম (Sovereign) ও সর্বাত্মক শাসক ধরে নেওয়া হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ স্বয়ং মানুষ যখন এ বিশ্ব চরাচরে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়, তখন বহু মানুষের সমষ্টি জনগণ কেমন করে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হতে পারে? এ কারণেই স্বেচ্ছাচারসর্বস্ব গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত যে বিন্দুতে গিয়ে দাঁড়ায়, তা জনগণের উপর কতিপয় ব্যক্তির বাস্তব সার্বভৌমত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলাম শুরুতেই এ গলদ শুধরে দেয়। সে গণতন্ত্রকে এমন একটা মৌলিক আইনের অধীন করে দেয়, যা বিশ্ব প্রকৃতির আসল সার্বভৌম শাসকের রচিত। জনগণ এবং তাদের শাসকবৃন্দ এ আইনের আনুগত্য করতে বাধ্য। এজন্য যে স্বৈরাচার শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা আদৌ সৃষ্টি হওয়ারই অবকাশ পায় না।

দ্বিতীয়ত, জনগণের মধ্যে যতোক্ষণ গণতন্ত্রের দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত চেতনা ও চরিত্র সৃষ্টি না হয়, ততোক্ষণ গণতন্ত্র সাফল্যের সাথে চলতেই পারে না। ইসলাম এজন্যই এক একজন করে প্রত্যেক সাধারণ মুসলমানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের উপর জোর দেয়। ইসলাম কামনা করে যে, প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে ঈমানদারী, দায়িত্ব সচেতনতা এবং ইসলামের মৌলিক বিধানের আনুগত্য ও অনুসরণের দৃঢ় সংকল্প জন্ম নিক। এ জিনিসটা যতো কম হবে, গণতন্ত্রের সাফল্যের সম্ভাবনা ততোই কম হবে। আর এটা যতো বেশি হবে, তার সাফল্যের সম্ভাবনা ততোই উজ্জ্বল হবে।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে সদ্যজাগ্রত ও অনমনীয় জনমতের উপর। সমাজ যখন সৎ লোকদের দ্বারা গঠিত হবে, এই সৎ লোকদেরকে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা হবে এবং সেই সংঘবদ্ধ সমাজ এতোটা শক্তিশালী হবে যে, অসততা ও অসৎ লোক সেখানে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে না এবং শুধুমাত্র সততা ও সৎ লোকই উন্নতি ও বিকাশ লাভের সুযোগ পাবে। ইসলাম এ জন্য আমাদেরকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়ে দিয়েছে।

উল্লিখিত তিনটি উপকরণ যদি সংগৃহীত হয়ে যায় তাহলে গণতন্ত্রের বাস্তবায়নকারী সংস্থার রূপকাঠামো যে রকমই হোক না কেন, গণতন্ত্র সাফল্যের সাথে চলতে পারবে। আর এই সংস্থার কোথাও কোনো অসুবিধা অনুভূত হলে তা সংশোধন করে আরো ভালো সংস্থা গড়ে তোলাও সম্ভব হবে। এরপর গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাওয়াই অধিকতর উন্নতি ও পরিশুদ্ধি লাভের জন্য যথেষ্ট। অভিজ্ঞতার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে একটা ত্রুটিপূর্ণ অবকাঠামো উৎকৃষ্টতর ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গড়ে উঠতে থাকবে। *(তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৬৩ খৃ.)*

রাষ্ট্রপ্রধানের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা

প্রশ্ন : কিছুদিন যাবত পত্র পত্রিকার মাধ্যমে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে 'খলিফাতুল মুসলিমীন' বা 'আমীরুল মুমিনীন' সূচক সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হোক। এই প্রস্তাবকে আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যে এ কথাও বলা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপ্রধানকে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতাও দেওয়া উচিত। কেননা হযরত আবু বরক সিদ্দিক রা. বড় বড় সাহাবিদের মুকাবিলায় ভেটো প্রয়োগ করেছেন। যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল এবং যারা নবুয়তের দাবি করেছিল তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের নির্দেশ দিয়ে তিনি সাহাবায়ে কেরামের অভিমত রদ করেন। এই যুক্তির বলে ভেটোর মতো একটা ধান্ধাবাজীপূর্ণ আইনকে শরিয়তের ভিত্তিতে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।

এ পরিস্থিতির আলোকে আপনার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন রাখছি। আশা করি আপনি সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে আশ্বস্ত করবেন।

১. হযরত আবু বকর রা. কি আজকের যুগের প্রচলিত অর্থেই ভেটো প্রয়োগ করেছিলেন?

২. যদি তাই করে থাকেন তবে এজন্য তাঁর কাছে কোনো শরিয়তসম্মত যুক্তিপ্রমাণ ছিলো কি?

জবাব খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থা এবং বর্তমান যুগের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। যারা ইসলামের ইতিহাস

সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞ, তারা ছাড়া আর কেউ এ দু'টোকে এক বলতে পারে না। আমি "ইসলামি রিয়াসাত" (ইসলামি রাষ্ট্র) নামক গ্রন্থের ৩৩১-৩৩৩ পৃষ্ঠায় এ পার্থক্য সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছি। সেটি পড়ে দেখবেন। ঐ আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে, খেলাফতে রাশেদার শাসন ব্যবস্থায় যে জিনিসটাকে "ভেটো" ক্ষমতা বলে অভিহিত করা হয়, তা বর্তমান যুগের সাংবিধানিক পরিভাষা থেকে ভিন্ন জিনিস ছিলো। হযরত আবু বকরের রা. মাত্র দু'টো সিদ্ধান্তকে এ ক্ষেত্রে যুক্তির ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। একটি হলো, উসামার নেতৃত্বে যে সেনাদলকে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদেরকে দমন করার জন্য অভিযানে যাওয়ার নির্দেশ স্বয়ং রসূল সা. দিয়েছিলেন, কিন্তু রসূল সা. এর ইতিকালের দরুন অভিযান স্থগিত ছিলো, সেটা পুনরায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়টি হলো, যারা ইসলাম পরিত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের নির্দেশ। এই দু'টো ব্যাপারে হযরত আবু বকর রা. নিছক নিজের ব্যক্তিগত মতে সিদ্ধান্ত নেননি। বরং নিজের মতের স্বপক্ষে কুরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণ পেশ করেছিলেন। উসামার সেনাদল সম্পর্কে তাঁর যুক্তি ছিলো, যে কাজের ব্যাপারে রসূল সা. নিজেই জীবদ্দশায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটিকে রসূল সা. এর খলিফা হিসেবে সমাধান করাই আমার দায়িত্ব। সে ফায়সালা পরিবর্তনের অধিকার আমার নেই। ইসলাম পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিলো, যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে এবং বলে যে, আমি নামায পড়বো কিন্তু যাকাত দেবো না, সে ইসলাম বহির্ভূত, তাকে মুসলমান মনে করাই ভুল। সুতরাং যেসব সাহাবা বলেন যে, কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে তরবারি উত্তোলন করা যাবে, তাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত আবু বকরের রা. এই যুক্তির কারণেই সকল সাহাবি তার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। এটা যদি 'ভেটো' হয়ে থাকে তবে তা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর 'ভেটো', রাষ্ট্রপ্রধানের ভেটো নয়।

আসলে এটাকে ভেটো বলাই ভুল। কেননা হযরত আবু বকরের রা. যুক্তি মেনে নেওয়ার পর ভিন্নমত পোষণকারী সাহাবায়ে কিরাম খলিফার মতোই সঠিক বলে স্বীকার করেছিলেন এবং নিজেদের পূর্বের মত প্রত্যাহার করেছিলেন। *(তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৬৩ খৃ.)*

ইসলামি আন্দোলন প্রসঙ্গ

ইকামতে দীন সম্পর্কে কতিপয় সংশয়

প্রশ্ন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ইসলামি খিলাফতের দায়িত্ব যেসব মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবার কাঁধে তুলে দেয়া হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে নি:সন্দেহে বলা যায়, তারা ছিলেন মানবতার শ্রেষ্ঠতম ফসল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ ঐতিহাসিক সত্যটি অস্বীকার করা যাবে না যে, অতি দ্রুত খিলাফত ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং জামাল যুদ্ধ ও সিফফীন যুদ্ধের ন্যায় দু'টি আত্মঘাতী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে। ইসলামি আন্দোলনের ক্রমোন্নতির উপর এদের বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে। আশা করি এগুলোর জবাব দেবেন।

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতো নিকটতম জামানায় এবং নবুওয়াতী যুগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবাগণের উপস্থিতিতে যদি মুসলিম সমাজে এহেন নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে আজ আমরা যারা আমাদের ঐ উন্নত চরিত্রবান সৎকর্মশীল পূর্বপুরুষদের চারিত্রিক উন্নতির কল্পনাও করতে অক্ষম, আমরা কিসের ভিত্তিতে গর্ব করতে পারি এবং কিভাবে আমরা এ দাবি করতে পারি যে, আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করতে পরবো?

২. যদি বলা হয়, ইসলাম এতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব ছিলো না তাহলে এখানে প্রশ্ন দেখা দেবে, মুসলিম খলিফাগণ ইসলামি জীবন ব্যবস্থা ও মুসলিম সমাজকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী (Consolidate) করার আগেই কেন তার সম্প্রসারণ কাজে (Expansion) হাত দিলেন?

৩. যদি আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভুল থেকে সংরক্ষিত থাকতে সক্ষম না হয়ে থাকেন তাহলে আমরাই বা কেমন করে সংরক্ষিত থাকবো? আর ইকামতে দীনের জন্য কাজ করার সাহসই বা আমাদের কেমন করে হবে?

জবাব : আপনার প্রশ্নগুলো যেমন সংক্ষিপ্ত ও সহজ মনে হয়, এগুলোর জবাব ততোটা সহজ ও সংক্ষিপ্ত নয়। আপাতত এ প্রশ্নগুলোর বিস্তারিত জবাব দেয়া সম্ভব নয়। এগুলোর ব্যাপারে নিছক কয়েকটা ইঙ্গিতই করা যেতে পারে। আল্লাহর ইচ্ছা হলে এ জবাবটুকুই আপনার মানসিক পেরেশানী দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে।

১. আমাদের জাতীয় ইতিহাস থেকে শুধুমাত্র কয়েকটা কালো দাগ বেছে বেছে বের করা এবং সেগুলোর ভয়াবহ রূপ কল্পনা করে লজ্জিত হওয়া শুভ লক্ষণ নয়।

আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসংখ্য উজ্জ্বল আলোয় পরিপূর্ণ। সেগুলোর জন্য আমাদের গর্ব করা উচিত এবং সেগুলোর উজ্জ্বল নিশানী দৃষ্টির সমক্ষে রেখে আশা ও নির্ভরতার সাথে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। উজ্জ্বল নিশানীগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রেখে কেবলমাত্র কয়েকটা কালো দাগের কথা কল্পনা করে মনমরা হয়ে বসে থাকা অযথা হতাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ়করণের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করার ব্যাপারটা চিন্তা ও কল্পনার জগতে যতো সহজ, কর্মের জগতে ততোটা সহজ নয়। কোনো ব্যক্তি যদি শিরক ও কুফরী থেকে তওবা করার জন্য আপনার কাছে আসে তাহলে কি কারণে বা কোন ওজরটি দেখিয়ে আপনি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন? আপনি কি তাকে বলবেন, বর্তমানে আমি পূর্বের সুদৃঢ়করণে ব্যস্ত, সম্প্রসারণের কাজ এখন বন্ধ।

৩. মানুষ যতোক্ষণ তার এই মানবিক প্রকৃতিতে অবস্থান করছে ততোক্ষণ তার প্রচেষ্টা মানবিক চাহিদা ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করে তার দায়িত্ব যতোদূর সম্ভব ভালোভাবে ও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সম্পাদন করার চেষ্টা করা উচিত? আর এই সঙ্গে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যেনো তিনি ইচ্ছাকৃত ভুল থেকে আমাদেরকে বাঁচান এবং আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো মাফ করে দেন। *(তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৫৩ খৃ.)*

একটি আপোষ প্রস্তাব

প্রশ্ন পাকিস্তান বর্তমানে সংবিধান রচনার ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। পাকিস্তানের একটা বিশেষ মহল ইসলামি সংবিধান যাতে তৈরি না হয়, সেজন্য ফন্দিফিকিরে লিপ্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় জামায়াতে ইসলামি ও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বিরাজমান সংঘাত দুঃখজনক। যেহেতু ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা জামায়াতে ইসলামির অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য, তাই এই কোন্দলে সেও একটা পক্ষ হয়ে জঙ্গি রূপ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। এ কোন্দল মীমাংসার জন্য আমি একটি প্রস্তাব পেশ করছি। প্রস্তাবটি এই যে, জামায়াতে ইসলামি কয়েকজন নামকরা আলেমকে (এ ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী পাঁচজন নেতৃস্থানীয় আলেমের নাম উল্লেখ করেছেন। আমরা এই তালিকাটি প্রকাশ করা সমীচীন মনে করিনি। তার পরিবর্তে 'কতিপয়' 'নামকরা আলেম' এই শব্দ উল্লেখ করেছি) শালিস মেনে নেবে এবং প্রতিপক্ষকে জামায়াতে ইসলামির সকল আপত্তিকর উক্তি ঐ শালিসদের সামনে পেশ করার আহ্বান জানাবে। এই আলেমদের নিরপেক্ষতা, তাকওয়া, পরহেজগারী ও জ্ঞান যাবতীয় সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে। (এই পাঁচজন আলেমের নিরপেক্ষতা এতো উঁচু মানের যে, এদের একজন পাঞ্জাবের বিগত নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামির বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার চালিয়েছেন। অপর দু'জন ইদানীং

জামায়াতের বিরুদ্ধে "জিহাদ" চালিয়ে যাচ্ছেন)। যদি কোনো উক্তি আপত্তিকর প্রমাণিত না হয়, তা হলে মাওলানা মওদূদীর সম্মান যে বেড়ে যাবে এটা অবধারিত। আর যদি আলেমগণ ঐসব উক্তিকে আপত্তিকর আখ্যায়িত করেন, তাহলে মাওলানা মওদূদী সাহেব ঐ উক্তিগুলো প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করবেন। সকলে আন্তরিক হলে এবং আখিরাতের সাফল্য কামনা করলে এ কার্যক্রমের সব কয়টি স্তর অতিক্রম করা সম্ভব। আমার প্রস্তাবিত এ উপায়ে বর্তমান কোন্দল নিরসন করা সম্ভব কি না ভেবে দেখবেন।

বি.দ্র. এ প্রস্তাবের কপি তাসনীম, নাওয়ায়ে ওয়াক্ত ও নাওয়ায়ে পাকিস্তান পত্রিকাগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জবাব : আপনার আপোষ ফর্মুলা সম্বলিত রেজিস্ট্রি করা চিঠি পেয়েছি। এতে প্রথমেই একটা কথা আমার বুঝে আসেনি। আপনি আমাকে সম্বোধন করে এ আপোষ প্রস্তাব পাঠালেন কেন, তা আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে। এটা কি আপনার চোখে পড়েনি যে, আমি জেলে থাকতেই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা রটনার এক অভিযান শুরু করে দেওয়া হয়েছিল? পরে আমি বাইরে আসতেই অপপ্রচারের কি তাণ্ডব শুরু করা হলো? আপনার কি এটাও জানা নেই যে, যারা আমার উপর এসব আক্রমণ চালালো তাদের উপর আমি আগেও কোনো আক্রমণ চালাইনি, পরেও তাদের কোনো বাড়াবাড়ির জবাব দেইনি। তাহলে আমার জানতে ইচ্ছা করে যে, কোন্ ইনসাফের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনি সেই ব্যক্তির কাছে আপোষ ফর্মুলা হাজির করলেন যে কারোর সাথে কোনো ঝগড়ায় লিপ্ত হয়নি?

দ্বিতীয়ত,"জামায়াতে ইসলামিও এই কোন্দলে একটি পক্ষ হয়ে জঙ্গী রূপ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে", এ কথাটাই বা আপনি কিসের ভিত্তিতে বললেন, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। যথার্থ সত্যনিষ্ঠ কোনো ব্যক্তির পক্ষে কি এ কথা বলা সম্ভব? একদিকে লক্ষ্য করুন যে, আমার ও জামায়াতে ইসলামির বিরুদ্ধে কি জঘন্য অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। অপরদিকে এটাও লক্ষ্য করুন যে, আমি নিজে এ ব্যাপারে সব সময় চুপ থেকেছি। জামায়াতের মুখপত্র 'তাসনীম'ও বলতে গেলে পুরোপুরি নীরবতা অবলম্বন করেছে। জামায়াতের কোনো কোনো সদস্য অবশ্য ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি। তাদের নিজস্ব পত্রিকা রয়েছে এবং তাতে তারা দু'চার কথা লিখেছেন। কিন্তু তারা যা লিখেছেন, আমার ও জামায়াতের বিরুদ্ধে লেখা কুৎসার সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না। তাছাড়া তাদের অনেকেই আমার নিষেধ করাতে থেমে গেছে। অন্যান্যদেরকেও আমি সংযত রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। একে যদি আপনি জঙ্গী সাজে রুখে দাঁড়ানো বলেন, তবে আমার এছাড়া আর কিছু বলার নেই যে, আল্লাহ আপনাকে সুবিচার করার তওফিক দিন।

এখন আমি আপনার "আপোষ প্রস্তাব" নামক প্রস্তাবটি নিয়ে দু'চার কথা বলছি। আপনার বক্তব্য এই যে, অমুক অমুক বুযুর্গকে শালিস মেনে নিয়ে জামায়াতে ইসলামির আপত্তিকর বক্তব্যগুলো তাদের বিচারে সোপর্দ করা হোক। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা এই যে, শুধু জামায়াতে ইসলামির আপত্তিকর বক্তব্যগুলোই কেন পেশ করা হবে? ওঁদের যেসব বক্তব্য অন্যদের কাছে আপত্তিকর তাও কেন পেশ করা হবে না? বস্তুত যাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন তারাও কোনো ওহীর ভাষায় কথা বলেন না। তারা যা যা বলেন ও লেখেন, তাও অবশ্যই মানুষেরই কথা এবং তাতে আমরা অনেক আপত্তিকর কথাবার্তা দেখতে পাই। পার্থক্য শুধু এই যে, আমরা কখনো কারো সাথে কোনো অশোভন আচরণ করিনি। একজনের লেখা থেকে বেছে বেছে কিছু কিছু কথা খুঁজে বের করা এবং তার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখা ও প্রচারপত্র বিলি করার মতো ফালতু বেসাতিতে আমরা কখনো লিপ্ত হইনি। অথচ এই ফালতু আচরণটাই আমাদের সাথে করা হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে এবং আজও তার ধারা অব্যাহত রয়েছে। জানিনা, এটা আমাদের এই ভদ্রতারই পুরস্কার কিনা যে, সারা দেশের মধ্য থেকে শুধু আমাদেরকেই বাছাই করা হলো শালিসদের সামনে আসামী হিসেবে দাঁড় করার জন্য। এও জানি না যে, অন্যদের বিরুদ্ধে আমরা এমন অশালীন তুলকালাম কাণ্ড বাধাতে পারিনি বলেই তাদেরকে নিস্কৃতি দেওয়া হয়েছে কিনা।

এ প্রসঙ্গে আর একটা ভুল ধারণার অপনোদন করা আমি অত্যন্ত জরুরি মনে করছি। ওলামায়ে কেরাম যে সামগ্রিকভাবে জামায়াতে ইসলামির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, একথা বাস্তবে সত্য নয়। বরঞ্চ অধিকাংশ বিবেকবান ও খোদাভীরু আলেম বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করা সত্ত্বেও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার অভিন্ন লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামির সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। জামায়াতের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচারের ঝড় তোলা হচ্ছে, তাকে তাঁরা আন্তরিকভাবে অপছন্দ করেন এবং এটাকে থামানোর জন্য সাধ্যমত চেষ্টাও করছেন। যারা অপপ্রচারের হাঙ্গামা তুলছে তাদের মধ্যে এমন লোক অবশ্যই রয়েছে, যারা আলেম হওয়া সত্ত্বেও আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে বসেছেন। কিন্তু তাই বলে তাদের সবাই "ওলামায়ে কেরাম" নয়। নিতান্ত মামুলী পর্যায়ের রাজনীতিবাজ লোকেরাও তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

আমার সর্বশেষ কথা এই যে, এ ধরনের প্রস্তাবাদির ব্যাপারে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এ ধরনের অপবাদ ও কুৎসা রটনার প্রতিকার সালিশি দ্বারা হয় না। এর একমাত্র প্রতিকার এই যে, এ ধরনের লোকদের কোনো তোয়াক্কা না করে নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। ওরা যা করছে তা ওদেরকে করতে দিন। তারা যদি এই অপকর্মে সারা জীবনও লিপ্ত থাকতে চায় থাকুক। *(তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ খৃ.)*

ভিত্তিহীন আশংকা

প্রশ্ন : সম্প্রতি লাহোরের একটি পত্রিকার মাধ্যমে এক শ্রেণির আলেম আপনার ১৩ বছর আগের কিছু লেখা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উক্তি বের করে তার বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে। তবে আমি ঐসব ফতোয়া দ্বারা বিভ্রান্ত হইনি। কিন্তু আজ এক ব্যক্তি আমাকে একটা প্রবন্ধ দেখালো। তাতে আপনার ও জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তানের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্যের আলাপ আলোচনার উল্লেখ রয়েছে। আপনাকে বলা হয়েছে যে, আপনি যদিও ইমাম মাহ্দী হওয়ার দাবি করবেন না, কিন্তু আপনার ভক্তরা হয়তো আপনাকে ইমাম মাহ্দী ভাবতে আরম্ভ করবে, এ আশংকা রয়েছে। তাই আপনার কাছে দাবি জানানো হয়েছে যে, আপনার ইন্তেকালের পর আপনাকে কেউ মাহ্দী আখ্যায়িত না করে এই মর্মে ঘোষণা জারি করে দেন। কিন্তু আপনি এরপর নীরবতা অবলম্বন করেন। এতে জনমনে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়েছে।

জবাব : আপনি যদি খারাপ মনে না করেন তবে আমি বলবো যে, আপনার সারল্যের জন্য আমি খুবই বিস্মিত হচ্ছি। আপনার চিঠি পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, অপবাদ ও কুৎসা রটনাকারীরা আপনার মতো লোকদেরকে নজরে রেখেই তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে থাকে। কেননা তারা আশা করে যে, দশ বিশটা ধাপ্পার মধ্যে একটা না একটায় আপনারা ঘায়েল হবেনই। এখন আপনি নিজেই বিচার করুন যে, যে ব্যাপারটা আপনি আমার সামনে পেশ করেছেন তাতে আপনি কিভাবে প্রতারিত হয়েছেন। এক ব্যক্তি আমাকে বলছে যে, তুমি তো ঠিক আছো। তুমি নিজে মাহ্দী হওয়ার দাবিও করছো না, বরং এ কথাও বলছো যে, আমি ইনশাআল্লাহ সব রকম দাবি দাওয়ার দোষ এড়িয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হবো। তারপর দেখবো, যারা আমার উপর অপবাদ আরোপ করছে তারা আল্লাহর কাছে কি জবাব দেয়। তবে তোমার মৃত্যুর পর লোকেরা তোমাকে মাহ্দী আখ্যায়িত করে বসতে পারে। কাজেই তুমি ঘোষণা দিয়ে দাও যে, আমার মৃত্যুর পর কেউ যেনো আমাকে মাহ্দী না বলে।

একজন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য আমার ঐ জবাব যথেষ্ট ছিলো। কেননা তাতে আমি এ কথাও বলেছিলাম যে, আমার মৃত্যুর পর যারা আমার নামে কোনো অসত্য কথা রটাবে, তারা হযরত ঈসার আ. অন্তর্ধানের পর তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে যারা আখ্যায়িত করেছিল তাদের সমতুল্য। এর চেয়ে কড়া কথা আমি আর কিই বা বলতে পারতাম? কিন্তু আপত্তি উত্থাপনকারীরা আমার এ উক্তি উদ্ধৃত করে আপনার মতো লোকদেরকে ধোঁকা দিলো যে, দেখো এই লোকটার মনে কপটতা আছে। সেজন্যই আমরা যে ঘোষণাটা দিতে বলছি তা দিচ্ছে না। আর আপনিও এই ধোঁকায় প্রতারিত হয়ে ঐ দাবিটা নিয়েই আমার কাছে এলেন।

আপনার সরলতা সত্যিই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। আপনার মতো লোকেরা যতোদিন দুনিয়ায় থাকবে ততোদিন ধাপ্পাবাজ লোকদের ধাপ্পাবাজির কারবার বন্ধ হবার কোনো আশা নেই।

উপসংহারে এ কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমি কোনো ধর্মীয় পদ মর্যাদারও দাবি করিনি, আমার ব্যক্তিত্বের দিকে কাউকে আহ্বানও করিনি। কাজেই আমার কোনো "ভক্ত বা শিষ্য" একেবারেই নেই। আমি ও আমার সাথীরা সবাই আল্লাহর ও তার রসূলের ভক্ত। আমাদের সম্পর্ক আল্লাহর পথের সহযাত্রী হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। *(তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ খৃ.)*

আল্লাহর হক ও মাতাপিতার হক

প্রশ্ন : আমি একটা জটিল মানসিক দ্বন্দ্বে আক্রান্ত এবং আপনার দিকনির্দেশনার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছি। জামায়াতের সার্বক্ষণিক কর্মী হওয়ার কারণে আমাকে বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করতে হচ্ছে। মা বাবা খুবই পীড়াপীড়ি করছেন যাতে আমি তাদের কাছে থেকে ব্যবসায়িক কায় কারবারে নিয়োজিত হই। তারা আমাকে ক্রমাগত চিঠি লেখেন এবং এই বলে দোষারোপ করেন যে, তুমি মা-বাপের অধিকার উপেক্ষা করছো। আমি এব্যাপারে সবসময় দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকি। একদিকে মা বাপের অধিকার সম্পর্কে আমার অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র। অপরদিকে এটাও উপলব্ধি করি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালানোর জন্য আমার জামায়াতের কর্মী থাকা জরুরি। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সঠিক পরামর্শ দিন, যাতে বাড়াবাড়ি ও ঢিলেমি দু'টোই পরিহার করে চলতে পারি। আমি এটাও জানি যে, মতের পার্থক্যের জন্য বাড়িতে আমার জীবন যাপন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। কিন্তু মা বাপ যে দাবি জানাচ্ছেন, তা মানা যদি শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরিহার্য হয়, তাহলে বাড়িতে বসবাস করা যতো কষ্টকরই হোক তা সানন্দে বরদাশত করাই আমার জন্য উত্তম। আমার আব্বা আমার প্রতিটি তৎপরতায় আপত্তি তুলতে অভ্যস্ত। আর অত্যন্ত বিনম্র ভাষায়ও যদি তার জবাব দেই, তবে তাও শোনার মতো সহিষ্ণুতা তাঁর নেই।

জবাব : মা বাপের আনুগত্য করা ও ইসলামের খিদমত করা, এই দু'টো কাজই ভারসাম্য সহকারে করা জরুরি। কিন্তু কিছু সংখ্যক যুবকের পক্ষে এই ভারসাম্য রক্ষা করা এক উদ্বেগজনক সমস্যা। জামায়াতে ইসলামির প্রতি এবং ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য নিয়ে জামায়াত সংগ্রামরত তার প্রতি যেসব যুবকের মাতা পিতা সহানুভূতিশীল নন, সেইসব যুবক কর্মীই সাধারণত এ সমস্যার সম্মুখীন। আমি প্রায়শ দেখেছি, কোনো ছেলে যদি সরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত থাকে অথবা কোনো লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে, তাহলে সে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও মা বাপ সহ্য করেন। তাকে কখনো বলেন না যে, তুমি

চাকুরী বা ব্যবসা ছেড়ে দাও এবং বাড়ি এসে আমাদের খিদমত করো। ছেলে যদি দুর্নীতি ও পাপাচারে জড়িত থাকে তবুও তারা আপত্তি করার প্রয়োজন বোধ করেন না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কোনো ছেলে যখন ইসলামের খিদমতে আত্মোৎসর্গ করে কেবল তখনই তাদের নিজেদের যাবতীয় অধিকারের কথা মনে পড়ে যায়। এমনকি জামায়াত যদি তাকে ন্যায্য পারিশ্রমিকও দেয় তবু তারা জিদ ধরেন যে, ছেলে বাড়ি বসে তাদের 'হক' আদায় করুক। এমনকি হক আদায় করাতেও তাদের মন শান্ত হয় না। তার প্রত্যেক কাজেই তাদের খটকা লাগে। তার কোনো খিদমতেই তাদের মন খুশি হয় না। বেশ কিছুকাল ধরেই আমি এ অবস্থা লক্ষ্য করছি। জামায়াতের বহু সংখ্যক যুবক এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে ও হচ্ছে।

আমি জানি না আপনার সামনে আসলে কি ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আপনার বিবরণ থেকে যা বুঝা যাচ্ছে সেটাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এটা আপনার মা-বাপের বাড়াবাড়ি। আপনি যেখানে কাজ করছেন, সেখানেই করতে থাকুন। টাকা পয়সা দিয়ে যতোটা খিদমত করা আপনার সাধ্যে কুলায়, তাও চালিয়ে যান। বরঞ্চ নিজে কষ্ট করে সাধ্যের বাইরেও কিছু পাঠাতে থাকুন। আর প্রয়োজনমত কখনো কখনো বাড়িতে গিয়ে বেড়িয়ে আসুন, তবে যদি আসল পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে থাকে এবং যথার্থই আপনার পিতা মাতার জন্য আপনার তাদের কাছে থেকে খিদমত করাই জরুরি হয়ে থাকে তাহলে তাদের কথা আপনার মেনে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। *(তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৫৬ খৃ.)*

নির্বাচন পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমি আপনার কাছে নিজের একটা মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে চাই। কিছুকাল আগে আমি বক্তিগত পর্যায়ে নিছক পরীক্ষামূলকভাবে দশ বছরের জন্য যুক্ত নির্বাচন চালু হোক বলে মত ব্যক্ত করেছিলাম। নিজের মতের সপক্ষে যুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি আমি এ কথাও বলেছিলাম যে, যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামির পক্ষ থেকেই সবচেয়ে জোরদার আওয়ায তোলা হচ্ছে। তারপর আমি অনেকটা এ ধরনের মন্তব্য করেছিলাম, জামায়াতে ইসলামিতে এমন লোক রয়েছে যাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি। তবে এও জানি যে, জামায়াত পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেনি। ভারত যদি বিভক্ত না হতো, তাহলে যুক্ত ভারতে কি জামায়াতে ইসলামি পৃথক নির্বাচনের দাবি তুলতো? এরপর জামায়াতের কোনো কোনো বন্ধু আমার কাছে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আমি তাদেরকে বলেছি যে, আমি নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে আমার যুক্তির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্যই ঐ কথাটা বলেছি। জামায়াতের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। আমি আপনার কাছেও এ ব্যাখ্যা পেশ করা জরুরি মনে করলাম, যাতে ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যায়।

জবাব আমি পত্র পত্রিকায় আপনার বক্তৃতার প্রতিবেদন পড়েছিলাম। তবে আমার মনে এ নিয়ে কোনো অভিযোগ সৃষ্টি হয়নি। আপনি তো জানেনই যে, অন্যরা এর চেয়েও কড়া কড়া কথা বলে ও লিখে আসছে। অথচ কারোর প্রতিই আমার কখনো কোনো অভিযোগ সৃষ্টি হয়নি। এজন্য আপনার ব্যাখ্যা আমার জন্য প্রয়োজনই ছিলো না। তবুও আপনি যে নিজ থেকেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, সে জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

অবশ্য যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে আপনি জামায়াতে ইসলামি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা ঠিক নয়। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আপনি জামায়াতের অনুসৃত নীতিকে আগেও বুঝতে চেষ্টা করেননি, আজও তা যথাযথভাবে বোঝেন না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামি অংশ নেয়নি সত্য, কিন্তু তা থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবকাশ নেই যে, জামায়াত ভারত বিভক্তির বিরোধী কিংবা যুক্তভারত বহাল রাখার পক্ষে ছিলো। এ রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। আপনি আমার তৎকালীন লেখাগুলো যদি বিশদভাবে পড়েন তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। তখন একদিকে একটি গোষ্ঠী ছিলো মুসলিম জাতীয়তাবাদের সমর্থক। অপরদিকে মুসলমানদের আর একটি গোষ্ঠী ছিলো মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর যুক্ত জাতীয়তার পক্ষে। ভারতের মুসলমানদের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য উভয় গোষ্ঠী যে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করছিল এবং যে ধাচের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, আমি তার কোনোটাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমার তৎকালীন লেখাগুলোতে এই অসন্তোষ ব্যাখ্যা করেছি। এই দুই গোষ্ঠী সম্পর্কে আমার যা ধারণা ছিলো, তা হুবহু সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই অসন্তোষের কারণেই আমি এই উভয় গোষ্ঠী থেকে আলাদা থেকেছি এবং আমি যেটা সঠিক মনে করেছি তার জন্য কাজ চালিয়ে গিয়েছি। দেশ বিভাগের বিরোধিতা যদি আমি কখনো করে থাকি, তবে আপনি তার প্রমাণ পেশ করুন। যুক্ত জাতীয়তা বা যুক্ত ভারতের সমর্থনেও যদি কখনো কোনো কথা বলে থাকি, তবে আপনি তাও দেখান। সে প্রমাণ যখন নেই, তখন আমাকে বা জামায়াতে ইসলামিকে এ প্রশ্ন করা কিভাবে সঙ্গত হতে পারে যে, অখণ্ড ভারত থাকলে কি তোমরা পৃথক নির্বাচনের দাবি তুলতে?

এছাড়া এ বিষয়ের আরো একটা দিক রয়েছে। আপনি সেটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। সে দিকটি এই যে, অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার সাথে কোনো রকমের সহযোগিতা বা অংশীদারিত্বকে জামায়াতে ইসলামি আদর্শগতভাবে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এজন্যই বিভাগপূর্বকালের কোনো নির্বাচনে আমরা আদৌ আগ্রহী হইনি। খোদা না করুন, ভারত যদি এক থাকতো এবং তাতে ধর্মহীন শাসন কায়েম হতো, তাহলে সেই ধর্মহীন শাসন ব্যবস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণকে আমরা সমর্থনই করতাম না। তাহলে সেই শাসন ব্যবস্থায় আমাদের জন্য পৃথক বা যুক্ত নির্বাচনের

প্রশ্ন উঠতো কেমন করে? এ ধরনের ধর্মহীন রাষ্ট্রে কাজ করার কি পরিকল্পনা জামায়াতে ইসলামির ছিলো, তা জামায়াতের বই পুস্তকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। আমাদের সেই কর্মপদ্ধতিকে ভুল মনে করা ও ভুল বলার অধিকার আপনার রয়েছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য দ্বারা আমরা আসলে যা বুঝাতে চেয়েছি তার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে যদি তা গ্রহণ করা হয় এবং বলা হয় যে, আমরা যুক্ত ভারত কামনা করতাম এবং দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলাম, তবে সেটা হবে নিছক বাড়াবাড়ি। অন্ততপক্ষে আপনার মতো বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের কাছ থেকে এ ধরনের বাড়াবাড়ি আমরা আশা করি না। *(তরজমানুল কুরআন, বরিউল আওয়াল ১৩৭৬, নভেম্বর ১৯৫৬ খৃ.)*

জামায়াতের নীতি ও কর্মপদ্ধতি

প্রশ্ন : আমি যদিও জামায়াতে সদস্য নই, তবুও এ দেশে পাশ্চাত্যের ধর্মহীনতার ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিরোধে জামায়াত যতোখানি অবদান রাখছে, তা আমাকে জামায়াতের সাথে অনেকটা জড়িত করে ফেলেছে। আর এই জড়িত থাকার মনোভাব নিয়েই আমার নগণ্য মতামত প্রকাশ করছি।

পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র ও নির্বাচনের বিষয় নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এ সময় অত্যাধিক সতর্কতা ও বিচার বিবেচনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। কেননা বর্তমান সংবিধান কাঠামোগতভাবে ইসলামের সত্যিকার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব স্বীকার করে না। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত সর্বসম্মত বিধিসমূহের প্রয়োগও বর্তমান সংবিধান অনুসারে আইনসভা ও প্রেসিডেন্টের মঞ্জুরীর উপর নির্ভরশীল। এতে করে আল্লাহর আইন যে মানুষের মতামতের মুখাপেক্ষী হয়ে যাচ্ছে সে কথা যদি বাদও দেই, তবুও এ আশংকা অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে যে, ইসলামের নতুন নতুন ব্যাখ্যার ফলে ইসলামে নাজায়েয ছিলো না এমন বহু জিনিস এ দেশের ফৌজদারী বিধিতে অপরাধের তালিকাভুক্ত হয়ে যেতে পারে আর ইসলামি আদৌ পছন্দ করে না এমন বহু জিনিস বৈধ জিনিসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। বর্তমান সংবিধান একদিকে কুরআন ও সুন্নাহ্কে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুমোদন ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ করে দিয়েছে। অপর দিকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্জি ও স্বাক্ষরের উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছে। তৃতীয়ত, তাকে আদালতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও অধীন করে দিয়েছে। অথচ সমগ্র সংবিধানে প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, পার্লামেন্ট সদস্য এবং আদালতের বিচারপতিদের ইসলামি যোগ্যতা নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি ধারাও বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে রাখা হয়নি। তাদের জন্য ইসলামের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও পরহেজগারীর মান নির্ধারণ আদৌ জরুরি মনে করা হয়নি। এমতাবস্থায় এই সংবিধান ইসলামি সংবিধান বলা এবং মনে করাই আপত্তিজনক ব্যাপার, তাকে গ্রহণ করা ও কার্যকর করার তো কথাই ওঠে না।

ইসলামের নাম জড়িত করে পাকিস্তানের যে ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে, যুক্ত নির্বাচন দ্বারা যে সেটা দুর্বল হয়ে যায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথক নির্বাচন দ্বারা মুসলিম জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কি লাভ হতে পারে? এ ধরনের পৃথক নির্বাচন তো ইসলামের জন্য একেবারেই নিরর্থক, এমনকি ক্ষতিকরও। কেননা এর পরও পার্লামেন্টে মুসলমান ও অমুসলমান সদস্য সমান ভোটাধিকার ভোগ করে, পার্লামেন্টের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার মুসলমান ও অমুসলমান উভয়েই হতে পারে, মন্ত্রী পরিষদে উভয়কে গ্রহণ করা চলে এবং ইসলামি বিধির ব্যাখ্যা, সমালোচনা, মতৈক্য, মতানৈক্য ও ভোটদানের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম সদস্য সমান ক্ষমতার অধিকারী। এমতাবস্থায় সত্যিকার অর্থে ইসলামের কোনো উপকার হওয়ার পরিবর্তে ইসলামের সার্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অন্যদের মুকাবিলায় ইসলামের একটা যুদ্ধরত পক্ষ হয়ে আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। অমুসলিম জাতিগুলো অনর্থক তাকে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শত্রু ভাবতে আরম্ভ করবে। অমুসলিমদের মন ইসলামের প্রতি আরো বিরক্ত ও তালাবদ্ধ হয়ে যাবে। দেশে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে যাবে। এমনকি এভাবে হয়তো একদিন ইসলামও বনী ইসরাঈলের মতো মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ধর্মে পরিণত হবে। বর্তমানে মুসলমানদের যে অবস্থা তা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে সত্যিকার অর্থে কোনো ইসলামি উপকার সাধিত হবার আশা করা যায় না।

আমার উল্লিখিত বক্তব্যে আপনি যদি কোনো ভারত্ব ও সারবত্তা আছে বলে মনে করেন তাহলে আপনাকে অনুরোধ জানাবো যে, আপনি এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন এবং এই নাজুক সময়ে মুসলিম জনগণের সঠিক নেতৃত্ব দানে কুণ্ঠিত হবেন না। আল্লাহ্ আপনাকে এ কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার তওফিক দিন এবং আপনাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করার ব্যাপারে মুসলমানদেরকে অকুণ্ঠ মনে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করুন।

জবাব : আপনার মূল্যবান মতামত বিবেচনার যোগ্য এবং উপকারী পরামর্শগুলোর জন্য ধন্যবাদ। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করি যে, জামায়াতের প্রতি আন্তরিক সম্পর্ক পোষণকারী মহলে এমন চিন্তাশীল লোকও রয়েছেন, যারা নিজস্ব ধারায়ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে থাকেন এবং তার পাশাপাশি আমাদেরকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেও কুণ্ঠিত নন।

আপনি যে সমস্যাবলীর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, সে সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, আমরা যে আন্দোলন চালাচ্ছি তা শূন্যে নয় বরং বাস্তব জগতেই। আমাদের উদ্দেশ্য যদি শুধু সত্যকে প্রকাশ ও প্রচার করাই হতো, তাহলে আমরা অবশ্যই নিরেট সত্য কথা বলে দিয়েই ক্ষান্ত থাকতাম। কিন্তু

যেহেতু সত্যকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাও আমাদের করতে হবে। আর তা প্রতিষ্ঠার জন্য এই বাস্তব জগতের মধ্য থেকেই পথ খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য আমাদেরকে আদর্শ ও বাস্তব কর্মকৌশলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হচ্ছে। আদর্শবাদের দাবি এই যে, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে নিজেরাও স্মরণ রাখবো, দুনিয়ার মানুষকেও তার দিকে আহ্বান জানাবো এবং অনুপ্রাণিত করতে থাকবো। তবে বাস্তববাদী কর্মকৌশলতার দাবি এই যে, আমরা চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের দিকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যাবো, বাস্তব জগতে আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে আপন উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করবো এবং তাকে সহায়কে পরিণত করতে ও বাধা বিঘ্নকে হঠাতে সচেষ্ট থাকবো। এ উদ্দেশ্যে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে কিছু মধ্যবর্তী লক্ষ্য ও আসন্ন লক্ষ্যও স্থির করতে হয়, যাতে করে এর এক একটা লক্ষ্য অর্জন করতে করতে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতির প্রেক্ষাপটে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটা বিশ্বজোড়া ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্য অর্জনের পথে একদিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ এবং রুশ সমাজতন্ত্র অত্যন্ত মারাত্মক প্রতিবন্ধক। অপরদিকে মুসলিম জাতিগুলোর বর্তমান অবস্থাও এক বিরাট অন্তরায়। এসব বাধা বিঘ্ন অপসারণ করা আমাদের মধ্যবর্তী লক্ষ্য। মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক বিরোধ ও কলহ কোন্দল, তাদের বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়া, তাদের মধ্যে ভৌগোলিক ও স্বদেশিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া এ সবই আমাদের পথের বাধা। এসব বাধা আমাদের অপসারণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আমরা যদি কোনো নিকটতম লক্ষ্যের জন্য কিছু বলি বা করি, তাহলে আপনার ভাবা উচিত নয় যে, আমরা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য পরিত্যাগ করেছি কিংবা তার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করেছি।

অনুরূপভাবে ইসলামি শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আপনি যে কথাগুলো লিখেছেন, তা আমাদের কখনো অজানা ছিলো না, আজও অজানা নয়। কিন্তু এখানে পুরোপুরি একটা ধর্মহীন রাষ্ট্র কায়েম হলে আজকের এই আধা ইসলামি রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতি হতো। এ কথা সত্য যে, আমরা পুরো লক্ষ্যটা অর্জন করতে পরিনি। কিন্তু সংঘাতের প্রথম পর্বে আমরা অন্তত এতোটুকু ফায়দা হাসিল করতে পেরেছি যে, রাষ্ট্রকে একটা কট্টর ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছি এবং ইসলামের এমন কয়েকটা মূলনীতির স্বীকৃতি আদায় করেছি যার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে আরো কাজ করা সম্ভব। আমরা এমন ভুল ধারণায় লিপ্ত নই যে, আমাদের গোটা উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমরা এখানে থেমে থাকতে চাই না। যা কিছু অর্জন করেছি তাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার বানাতে চাই।

এই নিকটতর লক্ষ্যটুকু অর্জিত না হলে আমাদের যে অবস্থা হতো, সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমরা এখন তার চেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছি।

নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কেও আপনি আমাদের দৃষ্টভঙ্গি ভালোভাবে বোঝেননি। 'যুক্ত নির্বাচন কেন এবং কেন নয়' শীর্ষক পুস্তিকার শেষাংশে আমি যা কিছু বলেছি তা মনোনিবেশ সহকারে পড়ে দেখুন। সেই সাথে আপনি নিজেও ভাবুন যে, যুক্ত নির্বাচন যদি স্বাদেশিক জাতীয়তাবাদ ও ধর্মহীনতার পটভূমি সহকারে চালু হয় তাহলে তা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে বেশি প্রতিবন্ধক হবে, না আপনি যে দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন সে সব দোষত্রুটিসহ পৃথক নির্বাচন হলে বেশি প্রতিবন্ধক হবে। আপনি এটাও চিন্তা করুন যে, পৃথক নির্বাচনের দোষগুলো দূর করা বেশি সহজ, না যুক্ত নির্বাচনের দোষগুলো দূর করা বেশি সহজ? এ জিনিসগুলো সম্পর্কে ভেবেচিন্তে আপনি নিজেই একটি মত স্থির করুন। তবে এ কথা কখনো ভুলে যাবেন না যে, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি। আমাদের সে লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু মধ্যবর্তী লক্ষ্যগুলো অর্জন এবং পথের বাধাগুলো অপসারণ করেই আমরা এগুতে পারবো। এক লাফেই গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ২ : আপনি যে আমার কথাগুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন এবং মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য মনে করেছেন, সেজন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনার উৎসাহবর্ধক জবাবের পর এ প্রসঙ্গে আরো কিছু বক্তব্য আপনার কাছে পৌঁছানো জরুরি মনে করছি। আল্লাহ না করুন, আপনি যেনো একে একটি লিখিত বিতর্ক মনে না করে বসেন। আসলে এসব বক্তব্য আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ। বস্তুত ইসলামই যে ইহকাল ও পরকালে মানব জাতির মুক্তির একমাত্র উপায়, সেটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তবে বহু বছরব্যাপী মুসলমানদের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীকে একজন শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে পর্যাবেক্ষণ করার ফলে আমার মনে এ চিন্তাধারা দানা বেঁধেছে।

নির্বাচন দ্বারা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য যদি এটাই হয়ে থাকে যে, বর্তমান আধা ইসলামি শাসনতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শাসনতন্ত্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হবে এবং শাসনতন্ত্রের ইসলামি ধারাগুলো অবিকৃতভাবে ও নির্ভুলভাবে বাস্তবায়িত করা হবে, তাহলে সেজন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে ভালো পন্থা এই যে, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানসম্পন্ন, সৎ ও যোগ্য লোকদের নিয়ে গঠিত আইনসভা প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং প্রত্যক্ষভাবে তার জন্য চেষ্টা সাধনা অব্যাহত রাখা উচিত। বিশেষত যে সময়ে সারা দেশে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠী শাসনতন্ত্রের নামে ইসলামের নতুন নতুন ও উদ্ভট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে চলেছে, তখন এই প্রত্যক্ষ চেষ্টা সাধনার আরো বেশি প্রয়োজন। তবে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যদি এটা ভালো

মনে না করেন, তাহলে পৃথক নির্বাচন ও যুক্ত নির্বাচনের মধ্যে কোনটি এ লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে সহজতর ও সত্যের নিকটতর তা পূর্ণ মনোযোগের সাথে যাচাই বাছাই করা দরকার।

পৃথক নির্বাচনের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য মনস্তাত্ত্বিক। বিগত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে এ ঔৎসুক্য অব্যাহত রয়েছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিক দিয়ে পৃথক নির্বাচন প্রথার উদ্ভব ঘটেছিলো হিন্দুদের সংখ্যাধিক্যের মুকাবিলায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা ভারতীয় মুসলিম রাজনীতির একমাত্র প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এই পন্থাটাকে যদি পকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ইসলামিকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহলে নিম্নলিখিত কারণে ইসলামিকরণের লক্ষ্য অর্জন দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

প্রথমত, এতে ইসলামি কর্মসূচির অধিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় ইসলামি নামধারী এবং অমুসলিমদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ভোটারদেরকে আবেদনকারী গোষ্ঠী সব সময় অধিকতর সাফল্য লাভ করবে। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে তারা এভাবেই সাফল্য অর্জন করে আসছে। এই গোষ্ঠী আগে তো নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ইসলামের পবিত্র নাম ব্যবহার করেছে এবং ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করেছে। আজও তার মানসিকতা ও বাস্তব জীবন আগের মতো রয়েছে এবং আগের তুলনায় সাফল্যের চাবিকাঠি তাদের হাতে অনেক বেশি।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিকদের জ্ঞানগত প্রবঞ্চনার সহজ শিকার হয়ে অমুসলিমদের মুকাবিলায় ভীতি ও হীনমন্যতার মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকবে।

তৃতীয়ত, মুসলিম ভোটারদের কাছে তাদের নির্বাচনী এলাকা থেকে দাঁড়ানো মুসলিম প্রার্থীদেরকে জিতিয়ে দেওয়াটাই ইসলামের সবচেয়ে বড় কাজ বলে গণ্য হবে?

চতুর্থত, মুসলিম নির্বাচনী এলাকায় একাধিক মুসলিম প্রার্থীর মধ্যে ইসলামের নামে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করা হতে থাকবে, সেটাই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে।

পঞ্চমত, অমুসলিম নির্বাচনী এলাকাসমূহ ক্রমেই বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকবে। পরবর্তী সময়ে এটা ঐক্যবদ্ধ শিবিরের রূপ ধারণ করে বিদেশী শক্তির কারসাজির হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। ঐ সব নির্বাচনী এলাকার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বিদেশী শক্তিগুলো আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এমন হস্তক্ষেপ করতে পারে, যার ফলে দেশ স্নায়ুযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের লীলাভূমি হয়ে উঠবে।

ষষ্ঠত, দেশের এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ইসলামের অবস্থান নিতান্তই গৌণ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। ইসলামের সার্বজনীন দাওয়াতের সম্ভাবনা হয়তো

ক্রমশই ক্ষীণতর হতে থাকবে এবং দেশের ভেতরে ও বাইরে অমুসলিম মহল ইসলামের চির দুশমনে পরিণত হবে।

সপ্তমত, অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত লোকদের জন্য এটা এমন একটা উদাহরণ হয়ে বিরাজ করবে, যা তাদের সমস্যাকে অকল্পনীয় মাত্রায় বাড়িয়ে তুলবে। অমুসলিম জনগণকে ও জাতিসমূহকে মানুষ হিসেবে আবেদন জানানোর মতো অবস্থান ও ভাবমূর্তি তাদের থাকবে না।

শেষত, আমাদের দেশের ধনিক শ্রেণী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা এমনিতেই ব্যাপক প্রভাবশালী এবং যাবতীয় পাপ কাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে, তদুপরি পৃথক নির্বাচন দ্বারা তাদের দাপট আরো বেড়ে যায়। তাদের নির্বাচনী এলাকাগুলো এমনিতেই আজ তাদের একচেটিয়া পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। পৃথক নির্বাচনের কল্যাণে তাদের এই ঘাঁটি আরো মজবুত হবে। এরপর হয় তাদের বিত্তবৈভব ও প্রভাব প্রতিপত্তি খতম হতে হবে, নচেৎ তাদের ইসলামি চরিত্র সৃষ্টি হতে হবে। অথচ এ দু'টো জিনিস আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহেই হওয়া সম্ভব। মানুষের ক্ষমতা ও চেষ্টা তদবিরের জোরে এ দু'টোর কোনোটাই সহজসাধ্য নয়।

পক্ষান্তরে যুক্ত নির্বাচনে, যাকে সার্বজনীন নির্বাচন বলাই অধিকতর সঙ্গত, দলীয় কর্মসূচির উপরই সাফল্য নির্ভরশীল। যদিও এ ক্ষেত্রে ইসলামের জন্য আন্দোলন ও সংগ্রামরত দলকে সর্বাত্মক ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। তবে সে ইসলামকে দলীয় কর্মসূচিতে পরিণত করে প্রথমত সমগ্র দেশবাসীকে দাওয়াত দিতে পারবে। দ্বিতীয়ত, এ কর্মসূচিকে আন্তর্জাতিক আদর্শবাদী আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারবে এবং মুসলিম ও অমুসলিম দেশে ইসলামের জন্য আন্দোলনরত লোকদের জন্য তা একটা সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করতে পারবে। তৃতীয়ত, এতে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির নয়, বরং দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচির মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। আমরা ইসলামের আদর্শ ও কর্মসূচিকে নিয়ে সমগ্র জনতা ও সমগ্র দেশবাসীর কাছে যেতে পারবো। এভাবে আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে স্বার্থপর ও মতলববাজ গোষ্ঠীগুলোর সাথে অবাধ ও সমতাভিত্তিক প্রতিযোগিতা সম্ভব হবে। চতুর্থত ইসলামি দল যখনই নির্বাচনে জয়ী হবে, অন্যান্য লোকদের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী না হয়েই সহজে দেশের গোটা অবকাঠামোকে ইসলামি রূপ দিতে সক্ষম হবে এবং একটা আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের নমুনা পেশ করতে পারবে। আপনার পুস্তিকা' যুক্ত নির্বাচন কেন এবং কেন নয়'তে এই দিক দিয়ে নির্বাচন সমস্যার পর্যালোচনা করা হয়নি। আমার অনুরোধ আপনি এসব বিষয় নিয়েও চিন্তাভাবনা করবেন। প্রসঙ্গত এ কথাও জানাচ্ছি যে, যুক্ত নির্বাচনের বর্তমান সমর্থকদের সাথে আমি কখনো একমত নই। কেননা তারা এমন পাকিস্তান বানানোর স্বপ্ন দেখছে, যার কোনো মুসলমান মুসলমান থাকবে না,

হিন্দুও হিন্দু থাকবে না। অথচ আমি চাই পাকিস্তান একটা খাঁটি মুসলিম জাতিতে পরিণত হোক। যদি কোনো ভ্রান্ত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে যুক্ত নির্বাচনকে প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার বানানো হয়, তাহলে আমি অবশ্যই পৃথক নির্বাচনকে সমর্থন করবো। এতদসত্ত্বেও আমার আন্তরিক অভিমত এই যে, ইসলামকে দলীয় কর্মসূচিতে পরিণত করে যুক্ত নির্বাচনকে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। যদিও খাঁটি ইসলামি আইনসভা গঠন এই মুহূর্তে সম্ভব না। এতে করে ইসলামিকরণের লক্ষ্য সুষ্ঠতর উপায়ে এবং সহজে অর্জন করা যাবে এবং পৃথক নির্বাচনের তুলনায় কম বাধা আসবে।

আপনি আপনার জবাবের শেষাংশে লিখেছেন, চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে আমাদেরকে কিছু মধ্যবর্তী লক্ষ্য ও নিকটতর লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়, যেনো তার এক একটা লক্ষ্য অর্জন করতে করতে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারি। আসলে এটা একটা নিদারুণ বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। বহু আন্দোলন বিশেষত মুসলমানদের অধিকাংশ সংগঠন এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আসছে। একটা কিছু নিকটতর লক্ষ্যে তারা এমনভাবে ডুবেছে যে, তাদের অনেকেই আর ভেসে ওঠেনি। অথচ মধ্যবর্তী মনজিলগুলো বড়জোর একটা মাধ্যম হবারই যোগ্য। অবশ্য আপনার এ সতর্কবাণী প্রশংসনীয় যে, চূড়ান্ত লক্ষ্য, দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া চাই না। কিন্তু আমার মতে, মধ্যবর্তী মনজিলকে লক্ষ্য ঠাওরানোই বিপজ্জনক। ওটাকে কেবল মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত, লক্ষ্য হিসেবে তার উপর কখনো গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তার কর্মসূচির মধ্যে সাম্য ও সুষমতা বজায় রাখাই আদর্শবাদ ও বাস্তব কর্মকৌশলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার সঠিক উপায়। তাছাড়া লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন যোগসূত্র বহাল রাখার দরকার যা প্রত্যেক ব্যাপারে পথের প্রতিটি মোড়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। বর্তমান যুগের মানসিক বিভ্রান্তি ও চিন্তার নৈরাজ্যকে প্রতিহত করার সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা হলো উদ্দেশ্যের সর্বব্যাপী প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে কখনো দুর্বল হতে না দেওয়া।

ধর্মহীন শাসনতন্ত্র চালু থাকার সময় আমাদের লড়াই ছিলো একটা প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে। আমরা তখন ফেরাউন ও আবু লাহাবের মানসিকতার মুখোমুখী ছিলাম। কন্টকাকীর্ণ ও বিপদসংকুল সেই পথ ভয়াল ছিলো সত্য, কিন্তু প্রবঞ্চনাপূর্ণ ছিলো না। কিন্তু আধা ইসলামি শাসনতন্ত্র চালু থাকলে আমাদেরকে ভণ্ডামী ও মুনাফেকীদুষ্ট মানসিকতার সম্মুখীন হতে হয়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ রহ. এ ধরনের মানসিকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। হাতুড়ে চিকিৎসক দ্বারা জীবন এবং কাটমোল্লা দ্বারা ঈমান বিপন্ন হয়ে

থাকে এ প্রবচন তো আপনার জানাই আছে। আমার মতে রাষ্ট্রকে কট্টর ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখাটা যেমন একটা বড় রকমের সাফল্য, আধা ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে থেকে যাওয়াটাও তেমনি একটা মারাত্মক হুমকির সূচনা ঘটাতে পারে। এটা শুধু পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং ইসলামের জন্যও বহু আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য এ পরিস্থিতির ত্বরিত প্রতিকার করা অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় এমন শাসনতন্ত্রকে ইসলামি শাসনতন্ত্র নামে আখ্যায়িত করা কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখার মতোই হবে। শাসনতন্ত্রে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী আইন তৈরি করা হবে না বলে ঘোষণা দেওয়া ১৮৫৭ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক 'ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ হবে না' বলে ঘোষণা দেওয়ার মতোই কাগুজে দলীলে পরিণত হবে।

আসল কথা হলো, যতোক্ষণ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সুস্পষ্টভাবে মেনে নেয়া না হবে, কুরআন ও সুন্নাহকে ইতিবাচকভাবে আইন রচনার উৎস এবং শাসনতন্ত্রের উপর কর্তৃত্বশীল বলে স্বীকার করা না হবে, কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী খোদাভীরু ও সূক্ষ্মদর্শী লোকদের দ্বারা আইনসভা গঠিত না হবে এবং পূর্বতন ইমাম ও আলেমদের নীতি অনুসারে ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী ও শরিয়ত বিশেষজ্ঞদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া না হবে, ততোক্ষণ সামান্য অসতর্কতার দরুন বর্তমান আধা ইসলামি শাসনতন্ত্রকে অনৈসলামিক উদ্দেশ্যে অবাধে ও সহজে ব্যবহার করা যাবে এবং সেই সব অনৈসলামিক উদ্দেশ্যকে ইসলামি উদ্দেশ্য বলে চালিয়ে দেওয়াও সম্ভব হবে।

সর্বশেষে জামায়াত সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমার ঘনিষ্ঠ মহলে জামায়াতের কর্মীগণের সততা, আন্তরিকতা ও উদ্যম দেখে আমি মুগ্ধ এবং তাদের জন্য আমার মন সর্বদা শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ থাকে। তবে তারা তাদের জনসভাগুলোতে শাসনতন্ত্রের এই ত্রুটিগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরেন না এবং নির্বাচনী বক্তব্যে খালেস ইসলামি মজলিসে শূরার তত্ত্বও অবহিত করেন না। এর ফলে জনগণ এরূপ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়ছে যে, আমাদের দেশের সংবিধান তো খাঁটি ইসলামি সংবিধানই হয়েছে। এখন বাকী শুধু সর্বশেষ ইসলামি অভিযান পৃথক নির্বাচন। তাছাড়া জনসংযোগের পদ্ধতিটাও বিরূপ সমালোচনায় পরিপূর্ণ ও নেতিবাচক ধাচের। এতে করে স্থানীয় ব্যক্তিগত ও খুঁটিনাটি ভিত্তিক মতভেদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। জামায়াতের নেতা কর্মীরা দলীয় সংকীর্ণতায় এতো বেশি তাত্ত্বিক হয়ে যান যে, কোনো কোনো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় খুঁটিনাটি মতভেদকেও জামায়াতের সাথে ব্যক্তিগত গোষ্ঠীগত বিদ্বেষের পর্যায়ভুক্ত করেন। এদেশের অতীত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কে হয়তো অজ্ঞ থাকার

কারণে অথবা অবচেতনভাবে জামায়াত প্রীতির আতিশয্যে বর্তমান ঘটনাবলীকে অতীতের ঘটনাবলীর সাথে এমনভাবে পরতে পরতে মেলান যে, তাতে প্রায়ই পূর্বপুরুষদের কাজের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং তাদের ইসলামি প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতায় সংশয় জন্মে। যদিও এ ব্যাপারে জামায়াতের কতিপয় লেখক এবং আপনার সম্পর্কেও কমবেশি অভিযোগ থাকা বিচিত্র নয়, তবে আমাদের নিকটতম কর্মী ও গণ্যমান্য সদস্যরা তো এ ব্যাপারে নানা রকমের বিভ্রান্তির শিকার। তারা বর্তমান পরিবেশের মানদণ্ডে অতীতের ঘটনাবলীকে তুলনা ও বিচার করতে যেনো অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। প্রশস্ত দৃষ্টি ও উদার মন নিয়ে বাছ বিচার করা এবং মূল লক্ষ্যের নিচে না নামাই বাঞ্ছনীয়। এসব সত্ত্বেও বর্তমান সমাজে এরাই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও শ্রদ্ধার পত্র। আল্লাহ আমাদের সকলকে সর্বাধিক পরিমাণে পারস্পরিক সহযোগিতা করা এবং স্বীয় দীনের যথাযথ খিদমত করার যোগ্যতা দান করুন।

জবাব : দু:খের বিষয় যে, আমার পূর্ববর্তী চিঠির এই উক্তিটা আপনি লক্ষ্য করেননি যে, আমরা আমাদের আন্দোলন শূন্যে চালাচ্ছি না, বরং বাস্তব জগতে চালাচ্ছি। আমাদের শুধু সত্যকে প্রকাশ ও প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকা চলবে না, বরং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সেজন্য আমাদেরকে এই বাস্তব জগতের মধ্য দিয়েই পথ বের করতে হবে। এ কথাটা আমি জবাবের শুরুতেই লিখে দিয়েছিলাম। কেননা আপনার চিঠি পড়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আপনি নিজের তাত্ত্বিক জগতে এতোটা হারিয়ে গেছেন যে, আমরা যে বাস্তব জগতে আপন লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট তার দিকে আপনার দৃষ্টি যাচ্ছে না। আপনার দ্বিতীয় চিঠি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমার ধারণা সঠিক ছিলো। আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার পর যে এদিকে আপনার দৃষ্টি যায়নি, তাও বুঝা গেছে।

আর একটা কথা আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে, যে ব্যক্তি বাস্তব জগতে শুধু সত্যের ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে চায় না বরং সত্যকে প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও পালন করতে বদ্ধপরিকর, তার পক্ষে আদর্শবাদ ও বাস্তব কর্মকৌশলের মধ্যে যতো বেশি সম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা করা জরুরি। আপনি এ কথাটাও ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেননি। আমার মনে হচ্ছে এই দ্বিতীয় কথাটা আপনার মনে ভালোভাবে বদ্ধমূল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি বুঝা আপনার পক্ষে দুরূহ হবে। এজন্য আপনার বক্তব্যগুলোর পর্যালোচনা করার আগে এই দু'টো বিষয়ে আমি পুনরায় বিশদভাবে আলোচনা করা জরুরি মনে করছি।

যে দেশে বা যে জনগোষ্ঠীর মধ্যেই আমরা কোনো প্রচলিত ব্যবস্থাকে পাল্টিয়ে অন্য ব্যবস্থা চালু করতে চেষ্টা করবো, সেখানে আমরা কখনো এমন শূন্যতা পাবো না যে, একেবারে নিশ্চিত মনে 'প্রত্যক্ষভাবে' আমাদের লক্ষ্য অর্জনের দিকে

এগিয়ে যেতে পারবো। সে দেশের একটা ঐতিহাসিক পটভূমি নিশ্চয়ই থাকবে। সেই জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগতভাবে এবং তার বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে কিছু ঐতিহ্য থাকবে। কোনো বিশেষ মানসিক, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশও সেখানে বিদ্যমান থাকার কথা। আমাদের মতো আরো অনেকের মস্তিষ্ক ও হাত পা সেখানে সক্রিয় থাকবে এবং তারা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে এবং অন্য কোনো লক্ষ্যের দিকে দেশ ও জনগণকে পরিচালিত করতে সচেষ্ট থাকবে। এই সমস্ত রকমারি উপকরণের কতক আমাদের পক্ষে এবং কতক আমাদের বিপক্ষে থাকা স্বাভাবিক। প্রচলিত ব্যবস্থা যে সেখানে কম বেশি কিছু কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এটা থেকেই বুঝা যায় যে, এ সমস্ত উপকরণ আমাদের পক্ষে কম এবং কায়েমী ব্যবস্থার পক্ষেই বেশি। তাছাড়া এটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত যে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা তার সহযোগী অথবা সম্ভাব্য সহযোগী ঐ সব উপকরণকে আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হবে এবং যেসব উপকরণকে সে আমাদের সহযোগী বলে মনে করে সেগুলোকে সে আমাদের অসহযোগী কিংবা অন্ততপক্ষে অলাভজনক করে দিতেও চেষ্টা করবে। আর দেশে সক্রিয় অন্যান্য যেসব আন্দোলন আমাদের লক্ষ্যের বিপরীত অবস্থানে রয়েছে, তারা হয় প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থন করবে, নচেৎ বিদ্যমান উপকরণগুলোকে যথাসম্ভব আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে।

এ পরিস্থিতিতে আমরা যে অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে আসবো এবং দেশের অতীত ও বর্তমান জুড়ে সুগভীর ও সুসংহত অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান ব্যবস্থাকে রাতারাতি পরিবর্তন করে ফেলবো, তার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটাও সম্ভব নয় যে, ঐ পরিবেশে বসবাস করেই কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাত ছাড়া নিভৃতে কোথাও বসে এমন প্রস্তুতি নিয়ে আসবো যে, মুকাবিলার ময়দানে নেমেই সোজা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাবো। দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়েও যে আমরা 'সরাসরি' লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবো, সেটাও অকল্পনীয়। এটা অনিবার্য যে, বাস্তবতার এই জগতে সহযোগী উপকরণসমূহের সাহায্য নিয়ে এবং বিরুদ্ধবাদী শক্তিসমূহের সাথে টক্কর দিতে দিতেই পর্যায়ক্রমে আমাদের লক্ষ্য পথে এগিয়ে যেতে হবে। যখন যতোটুকু অগ্রসর হবার সুযোগ আসবে, ততোটুকু তৎক্ষণাত অগ্রসর হতে হবে। অত:পর আরো এক ধাপ অগ্রসর হবার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। বিরোধী পক্ষ যদি ধাক্কা দিয়ে আমাদেরকে পেছনে হটাতে চায়, তবে পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে আমাদের পা না সরে সেজন্য চেষ্টা করতে হবে। এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের সময় আমাদের সর্বশেষ গন্তব্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য আমাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হতে না পারে এটা লক্ষ্য রাখা যতোটা জরুরি, তার দিকে এগুনোর জন্য মধ্যবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপকে আমাদের একটা লক্ষ্য হিসেবে গুরুত্ব দেওয়াও ঠিক

ততোখানি জরুরি। যে অবস্থানে পা রাখা হয়েছে, তাকে যতোদূর সম্ভব মজবুত ও সংহত করতে হবে? পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য যতোদূর সম্ভব শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং সুযোগ হওয়া মাত্র তা দখল করতে হবে। সর্বশেষ লক্ষ্যস্থলের দিকে দৃষ্টি রাখা এজন্য জরুরি যে, এতে করে আমাদের ভুল পথে পা বাড়ানোর আশংকা থাকবে না। পক্ষান্তরে মধ্যবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপকে আশু লক্ষ্য (Immediate Objective) হিসেবে গণ্য করা এ জন্য অপরিহার্য যে, এছাড়া সামনে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না। যে ব্যক্তি শুধু নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত থাকতে চায় না। বরং চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে বাস্তবিকপক্ষে অগ্রসর হতে চায়, তাকে প্রতিটি পদক্ষেপকে সংহত করা ও পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যাবতীয় সম্ভাব্য অনুকূল শক্তিগুলোকে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং যাবতীয় বিদ্যমান প্রতিকূল শক্তিগুলোর সাথে এমনভাবে লড়তে হবে যেনো, আপাতত এটাই একমাত্র করণীয় কাজ।

এ ব্যাপারে নিছক আদর্শ, নিষ্ঠা ও তাত্ত্বিক বুলি কপচানোতে কাজ হয় না, বরং সেই সাথে কার্যকর কৌশল প্রয়োগ অপরিহার্য। এই কৌশল উপেক্ষা করে কোনো আদর্শবাদী মানুষ নানা রকমের বুলি আওড়াতে পারে। কেননা সে হয়তো লক্ষ্যাভিসারী কাফেলার অন্তর্ভুক্তই হয় না অথবা কাফেলাকে পরিচালনা করার দায়িত্ব তার উপর বর্তায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি লক্ষ্য পথে নিজেও চলতে চায় অন্যকেও পরিচালিত করতে চায়, সে কোনো কিছুকেই নিছক তার কাল্পনিক সৌন্দর্য ও চমকে মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করতে পারে না। তাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই বাছাই করতে হয়। যে পরিস্থিতিতে সে কাজ করছে যে শক্তি বর্তমানে তার হাতে রয়েছে অথবা সংগ্রহ করার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং যেসব বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূল শক্তি তার চলার পথ আগলে রয়েছে সে সব দেখে শুনেই তাকে বিবেচনা করতে হয় যে, কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয় এবং কোনটি গ্রহণ করার কি ফল দাঁড়াবে। আদর্শবাদী মানুষ নির্দ্বিধায় যে কোনো পর্যায়ে বলে বসতে পারে যে, অতো ভেবেচিন্তে পা ফেলার এবং প্রতি কদম জায়গার জন্য সংঘর্ষে যাওয়ার দরকার কি? সোজাসুজি এগিয়ে যাই না কেন? কিন্তু বাস্তববাদী মানুষের একথা না ভেবে উপায় থাকে না যে, পথের প্রতিকূল শক্তিগুলোর ভীড় ঠেলে 'সোজাসুজি' এগিয়ে যাই কিভাবে? তাদের মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে যাবো ? না মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে যাবো? না এমন কোনো তাবীজ নেবো, যা দেখেই সমস্ত ভীড় কেটে পড়বে এবং আমি আমার কাফেলাকে নিয়ে গট গট করে সোজা গন্তব্যস্থলে গিয়ে উপনীত হবো? আদর্শবাদী মানুষ এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে যে কোনো জায়গায় যাত্রাবিরতি করার কিংবা পিছু হটার পরামর্শ নি:সংকোচে দিতে পারে। সে বলতে পারে যে, একটু থেমে কিংবা পিছু হটে প্রস্তুতি নাও, তারপর এমন জোরে এসো যেনো এক ধাক্কায় সাবেক ব্যবস্থা কুপোকাত এবং নয়া ব্যবস্থা

পুরোপুরিভাবে কায়েম হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তববাদী কর্মতৎপর মানুষকে এ ধরনের পরামর্শ গ্রহণ করার আগে দেখে নিতে হয় যে, বিরোধী শক্তির উপস্থিতিতে সংঘর্ষে বিরতি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব কি না? পেছনে হটলে তারপর এক ধাক্কায় গন্তব্যে পৌঁছা দূরে থাক, যেখান থেকে পিছু হঠতে বলা হচ্ছে সেখানে ফিরে আসা সম্ভব হবে কিনা? আমি থেমে থাকলে বা পিছু হটলে বিরোধী শক্তিও কি থেমে থাকবে বা পিছু হটবে? আমার পরিবেশকে আরো বেশি প্রতিকূল ও বিপদসংকুল বানানোর কাজ থেকে তারা কি বিরত হবে এবং আমি তাকে খুবই অনুকূল পেয়ে পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে নিশ্চিত একটা সর্বাত্মক আক্রমণ চালানোর সুযোগ পাবো? মোটকথা, আদর্শবাদী মানুষের পক্ষে যে কোনো কল্পনাযোগ্য প্রস্তাব উত্থাপন করা সম্ভব। কেননা যে আকাশ কুসুম কল্পনার রাজ্যে সে বাস করে, সেখানে পরিস্থিতি ও বাস্তব ঘটনাবলী থাকে না। সেখানে কেবল কল্পনারই রাজত্ব চলে। কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে কর্মরত, সে বাস্তবতার জগতে কাজ করে এবং তার উপর কার্যনির্বাহের দায়িত্ব থাকে। তাই বাস্তব সমস্যাকে সে উপেক্ষা করতে পারে না।

বাস্তব জগতে কার্যকরভাবে আপন লক্ষ্যে উপনীত হতে আগ্রহী ব্যক্তির পক্ষে আদর্শবাদ ও বাস্তব কর্মকৌশলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা আরো একটা দিক দিয়ে অপরিহার্য। আদর্শবাদীতার দাবি হলো চূড়ান্ত লক্ষের নিচে কোনো জিনিসের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করা চাই না। নিজের প্রচারিত আদর্শের কঠোরভাবে আনুগত্য করা চাই। কিন্তু বাস্তবতার জগতে হুবহু একথা অচল। এখানে লক্ষ্যে উপনীত হওয়াটা প্রথমত: কর্মীর হাতে আসা উপায় উপকরণের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত: যে সুযোগ সুবিধা হস্তগত হয়েছে তার উপর নির্ভরশীল। তৃতীয়ত: বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে পরিবেশের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার হ্রাস বৃদ্ধির যে আনুপাতিক তারতম্যের সম্মুখীন হতে হয়, তার উপর নির্ভরশীল। এই তিনটা জিনিস কারো কাছে পুরোপুরি অনুকূল হয়ে ধরা দেবে এটা অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। অন্তত সত্য দীনের প্রতিষ্ঠাকামীদের কাছে এ জিনিসগুলো কখনো অনুকূল হয়নি, আজও হবার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর নয়। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি পয়লা কদমেই শেষ মঞ্জিলে পৌঁছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং চেষ্টা চালানোর মধ্যবর্তী কোনো স্তরে কোনো বৃহত্তর প্রয়োজন ও সুবিধার খাতিরে আপন অনুসৃত আদর্শ ও নীতির ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম বা নমনীয়তার অবদান রাখবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে, সে বাস্তবিকপক্ষে এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কোনো কাজই করতে সমর্থ হয় না। এ ক্ষেত্রে আদর্শনিষ্ঠার সাথে সমানুপাতিক হারে বাস্তবধর্মী কর্মকুশলতার প্রয়োজন। এই কর্মকুশলতাই স্থির করে দেয় চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য পথের কোন্ কোন্ জিনিসকে সামনে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে বা সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কোন্ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে, কোন্ কোন্ বাধা অপসারণকে আশু লক্ষ্য হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে। নিজের নীতি ও আদর্শের কোন্ কোন্

অংশে অনমনীয় হতে হবে এবং কোন্ কোন্ অংশেই বা বৃহত্তর স্বার্থ ও সুবিধার খাতিরে প্রয়োজন অনুপাতে নমনীয় হবার অবকাশ রাখতে হবে।

এ ব্যাপারে ভারসাম্য বিধানের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপদ্ধতিতে পাই। তার জীবনে এতদসংক্রান্ত অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আমি এখানে মাত্র একটার উল্লেখ করবো। যে জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা ছিলো সমগ্র মানব জাতির জন্য, শুধু আরবদের জন্য ছিলো না। কিন্তু আরবে তা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পুরোপুরিভাবে সংহত হওয়া সারা দুনিয়ায় তার প্রতিষ্ঠার জন্য একটা অপরিহার্য মাধ্যম বা উপকরণ ছিলো। কেননা তার পক্ষে তাঁর লক্ষ্য অর্জন করার যে সুযোগ সুবিধা আরবে ছিলো, তা আর কোথাও ছিলো না। এজন্য তিনি সেটাকে আশু লক্ষ্য হিসেবে গুরুত্ব দেন। বাইরের দুনিয়ায় দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে কেবল প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। তাঁর সমগ্র মনোযোগ এবং সমস্ত শক্তি তিনি শুধু আরবে ইসলামের বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করেন। আন্তর্জাতিকতার খাতিয়ে তিনি এমন কোনো কাজ করেননি, যা আরবে এই মহান লক্ষ্য অর্জনে অসুবিধার সৃষ্টি করে। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহের মধ্যে এটাও একটা মূলনীতি ছিলো যে, যাবতীয় বংশীয় গোত্রীয় বিভেদ বৈষম্য খতম করে ইসলামি ভ্রাতৃত্বে প্রবেশকারী সকল মানুষকে সমান অধিকার দিতে হবে এবং সততা ও খোদাভীতি ছাড়া মর্যাদাভেদের আর কোনো ভিত্তি থাকতে দেওয়া যাবে না। এ মূলনীতিটা পবিত্র কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে। রসূল সা. নিজেও এ কথাটা শুধু মুখ দিয়েই বারংবার উচ্চারণ করেননি, বরং বাস্তবেও মনিব ও গোলাম উভয় শ্রেণীর মুমিনদেরকে আমীর বা নেতা নিয়োগ করে কার্যত সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যখনই সমগ্র দেশের শাসক নিয়োগের প্রশ্ন উঠলো, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে, الائمة من قريش। 'কোরেশ বংশের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচন করতে হবে। এই বিশেষ ব্যাপারটিতে এ নির্দেশ যে সাম্যের সাধারণ মূলনীতির বিরোধী তা প্রত্যেকের কাছে সুস্পষ্ট। প্রশ্ন উঠে যে, ইসলামের এমন গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিতে এতো বড় ব্যতিক্রম কেন সৃষ্টি করা হলো? এর জবাব একমাত্র এটাই হতে পারে যে, আরবের তৎকালীন পরিস্থিতিতে কোনো অনারব তো দূরের কথা, কোনো অকোরেশীর খেলাফতও কার্যত সফল হতে পারতো না। এজন্য তিনি সাম্যের এই মূলনীতি বাস্তবায়ন করতে সাহাবায়ে কেরামকে নিষেধ করে দিলেন। কেননা তাঁর তিরোধানের পর আরবেই যদি ইসলামি শাসন ব্যবস্থা পণ্ড হয়ে যায়, তাহলে বাদবাকী দুনিয়ায় দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কে পালন করতো?[১] এ থেকে বুঝা গেলো যে, একটা নীতির বাস্তবায়নে এমন জিদ ধরা যাতে ঐ নীতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শুধু বাস্তব কর্মকুশলতারই পরিপন্থী নয়,

---

১. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'রাসায়েল ও মাসায়েল' ১ম খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

ইসলামি কর্মপদ্ধতিরও পরিপন্থী। তাই বলে ইসলামের সকল মূলনীতির ক্ষেত্রে একথা সমভাবে প্রযোজ্য নয়। যেসব মৌলতত্ত্বের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, যেমন তাওহীদ, রিসালাত প্রভৃতি এগুলোতে বাস্তব সুবিধাদির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো নমনীয়তা দেখানোর দৃষ্টান্ত রসূল সা.-এর জীবনে পাওয়া যায় না, আর তা কল্পনাও করা যায় না।

উল্লিখিত বিষয়গুলো আপনি যদি হৃদয়ঙ্গম করে নেন, তাহলে আপনার বহু প্রশ্নের জবাব নিজেই পেয়ে যেতে পারেন। তথাপি আপনার কথাগুলো সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমার মত ব্যক্ত করার চেষ্টা করবো।

১. আপনার ধারণা এই যে, বর্তমান আধা ইসলামি শাসনতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শাসনতন্ত্রে পরিণত করার জন্য সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম উপায় কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ সৎ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মুসলমানদের সমন্বয়ে আইনসভা গঠন করা। এ উদ্দেশ্যে আপনি প্রত্যক্ষ চেষ্টা চালানোকে অগ্রগণ্য মনে করেন। দেশে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী মহল সংবিধানের নামে ইসলামের আজগুবি ও উদ্ভট নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিচ্ছে বলে আপনি এই প্রত্যেক্ষ চেষ্টা আরো বেশি বেশি জরুরি মনে করেন। তবে আপনি অগত্যা এ উদ্দেশ্যে নির্বাচনকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি।

এ বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে যতোগুলো কথা আপনি বলেছেন, তার একটিরও বাস্তব দিক আপনি ভেবে দেখেননি। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যে পরিস্থিতির শিকার সেটা হলো আমাদের দেশে আইনসভা প্রতিষ্ঠার সূচনা বৃটিশ শাসনামলে হয়েছে। এ ব্যবস্থাটা তারা তাদের মতাদর্শ অনুসারে জাতীয় গণতান্ত্রিক ধর্মহীন রাষ্ট্রের মূলনীতি অনুসারে প্রবর্তন করেছে। বহু বছরব্যাপী এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই এর ক্রমাগত বিকাশ ঘটেছে। এসব মূলনীতির আলোকে শুধু যে রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাই নয়, বরং তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাও এর আলোকে মন মগজ তৈরি করেছে। আমাদের সমাজের বিভিন্ন প্রভাবশালী শ্রেণী ও গোষ্ঠী সেই শিক্ষা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে আপন করে নিয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজ তার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এই বাস্তবতার পাশাপাশি আমাদের হাতে (অর্থাৎ ইসলামি শাসন ব্যবস্থা যারা চায় তাদের হাতে) যে সব উপায় উপকরণ ছিলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে অন্ততপক্ষে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের আসল কুফরী ভিত্তিকে (ধর্মহীনতাকে) পাল্টিয়ে তার স্থলে কুরআন ও সুন্নাহ্র সম্বলিত ভিত্তি স্থাপন করাটাও সহজ কাজ ছিলো না। এটা করা সম্ভব হয়েছে বলেই আপনি বর্তমান শাসনতন্ত্রকে আধা ইসলামি শাসনতন্ত্র বলে স্বীকার করছেন। বিগত ৯ বছরে এ কাজটা যে সমস্যাবলীর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে তা ভুলে যাবেন না। এখনও প্রভাবশালী ধর্মহীন গোষ্ঠী এই ইসলামি আদর্শিক ভিত্তিটাকে

ধ্বসিয়ে দেওয়ার জন্য যেভাবে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে তাও আপনার নজর এড়িয়ে যাওয়া উচিত না। এ পরিস্থিতিতে খাঁটি ইসলামি আদর্শ মোতাবেক একটা আইনসভা গঠিত হওয়া কি বাস্তবতার বিচারে সম্ভব ছিলো? আর ন্যূনতম যেটুকু গ্রহণযোগ্য জিনিস আমরা বর্তমানে পাচ্ছি, তা গ্রহণ করে তাকে ভবিষ্যতের আরো অগ্রগতির মাধ্যমে পরিণত করার পরিবর্তে আমরা যদি পুরোপুরি ইসলামের জন্য জিদ ধরতাম এবং যা পাওয়া যাচ্ছে তা প্রত্যাখ্যান করতাম, তবে সেটা কি বুদ্ধিমত্তার কাজ হতো? এখন এই আধা ইসলামি শাসনতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শাসনতন্ত্রে রূপান্তরিত করার সমস্যা আমাদের বিবেচনাধীন। আপনার বক্তব্য অনুসারে শাসনতন্ত্রের দাবি কোনো বিকৃতি ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা করার জন্যই এ সমস্যা নিয়ে বিচার বিবেচনা করা দরকার। আপনার এ কথা যথার্থ যে, এজন্য কুরআন ও সুন্নাহর বুৎপত্তিসম্পন্ন সৎ ও প্রাজ্ঞ মুসলমানদের সমন্বয়ে একটা আইনসভা গঠিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে আপনি নির্বাচনের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ উদ্যোগ গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষপাতি। আপনার এ প্রস্তাবের বাস্তব দিকটাও একটু দেখুন। এ ধরনের আইনসভার জন্য উপযুক্ত লোক মনোনয়নের কাজ তো স্পষ্টত কারুর হাতেই ন্যস্ত করা যায় না। শুধুমাত্র ধর্মীয় মাদরাসা, ধর্মীয় সংগঠন এবং দীনদার লোকদের মধ্যে এসব সদস্যের নির্বাচন সীমাবদ্ধ রাখা হবে এটাও সম্ভব নয়। যদি সেটা করাও হয় তবে তাদের ভোটে বর্তমান অবস্থায় যে ধরনের লোক নির্বাচিত হয়ে আসবে, তাদের হাতে হয়তো ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণাই চিরতরে কলংকিত হয়ে যাবে। সামগ্রিক পরিস্থিতিদৃষ্টে এ কথা মানতেই হবে যে, সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যতীত নির্বাচনের আর কোনো পদ্ধতি সম্ভবও নয়, অপেক্ষাকৃতভাবে বাঞ্ছনীয়ও নয়। এ কথাটা আপনি যদি বুঝে নেন, তাহলে এটাও স্বতসিদ্ধভাবে বুঝতে পারবেন যে, দেশের জনগণকে মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে এতোটা যোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা চালানো দরকার, যাতে তারা কুরআন ও সুন্নাহর বুৎপত্তিসম্পন্ন সৎ ও প্রাজ্ঞ লোক কামনা করে এবং তাদেরকে খুঁজে বের করতে পারে। বর্তমান আধা ইসলামি সংবিধানকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সংবিধানে রূপান্তরিত করা ও তার ইসলামিকরণের দাবি পূরণের এটাই একমাত্র উপায়। এখন এ কথা না বললেও চলে যে, এ কাজটা এক দীর্ঘ, সর্বাত্মক ও প্রাণান্তকর পরিশ্রম দ্বারা পর্যায়ক্রমেই সম্পন্ন হতে পারে। আর এ কথাও সবার জানা যে, এ কাজ শূন্যে হবার নয়। এ কাজ এমন অবস্থায় সম্পন্ন করতে হবে, যখন বিরোধী শত্রুশিবির প্রবল প্রতাপ ও দাপট নিয়ে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী উপায় উপকরণ নিয়ে এই জনগোষ্ঠীর মন মানসিকতা ও চরিত্রকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধাচের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করতে থাকবে। সেই সাথে তাদের এই প্রস্তুতির ফসল প্রতিটি নির্বাচনের সময় ঘরে তুলতে থাকবে। এতে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা হয় বাড়তে থাকবে, নচেত বহাল থাকবে। এমতাবস্থায়

নির্বাচনকে উপেক্ষা করে শুধু প্রত্যক্ষ চেষ্টা চালিয়ে কি লাভ বলে আপনি মনে করেন? 'প্রত্যেক চেষ্টা' বলতে আপনি যদি বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করে ইপ্সিত ধরনের আইনসভা গঠনকে শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে আরোপ করা বুঝান অথবা দেশে এমন নৈতিক ও মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করা বুঝান, যার ফলে কুরআন ও সুন্নাহকে বুৎপত্তিসম্পন্ন খোদাভীরু ও প্রজ্ঞাবান লোকেরা আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় কিংবা পুরোপুরিভাবে আইনসভাকে দখল করতে পারে, তবে উভয় ক্ষেত্রেই এই ফল যখনই দেখা দেবে নিছক বাইরে থেকে সরাসরি দেখা দেবে না, বরং নির্বাচনী রীতির মাধ্যমেই দেখা দেবে চাই এই মাধ্যমকে আপনি আজ ব্যবহার করেন, অথবা দশ বিশ বা পঞ্চাশ বছর পর ব্যবহার করেন। বাস্তব অবস্থা যখন এরূপ তখন এই প্রত্যক্ষ চেষ্টা নির্বাচনকে বাদ না দিয়ে তাকে পাশাপাশি চালু রেখে করা হবে না কেন? এমন হলে ক্ষতি কি যে, সাধারণ মানসিক ও নৈতিক বিপ্লবের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ চেষ্টাও সর্বশক্তি দিয়ে করা হোক এবং এই চেষ্টায় যতোটা সাফল্য আসতে থাকবে, তাকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হতে থাকুক? বিরোধী শক্তির জন্য এ ফ্রন্টকে ফাঁকা রেখে দেওয়াতে আপনি কি ফায়দা দেখতে পান? আপনি কি এটা বুঝতে পারেন না যে, যতো দিনই এ ফ্রন্টকে ফাঁকা রাখার পর আপনি পুনরায় এখানে আসতে চেষ্টা করবেন (আপনাকে এক সময় না এক সময় আপন লক্ষ্যের খাতিরে এ ফ্রন্টে ফিরে আসতেই হবে) তখন এখানে পা রাখার জায়গা একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে দেখতে পাবেন।

২. যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে যে আলোচনা আপনি করেছেন, তা থেকে আমার মনে হচ্ছে যে, আপনি বাস্তব পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে একটা ফাঁকা জায়গার কল্পনায় বিভোর রয়েছেন। আপনি ভাবছেন যে, এই ফাঁকা ময়দানে আপনার কল্পনাপ্রসূত প্রস্তাবগুলো আপনার ইচ্ছামতোই কার্যকর হয়ে যেতে পারবে। আপনার ধারণা এই যে, এখানে একটা সাদামাটা জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের কোনো অতীত বর্তমান কিছুই নেই। এই সরলমতি মানুষগুলোর সামনে ইসলামি কর্মসূচি তুলে ধরতে পারলেই কেল্লাফতে। অথচ এখানে এমন একটি মানবগোষ্ঠী বাস করে যাদের উপর দীর্ঘকাল যাবত গণতন্ত্র, ধর্মহীনতা ও ভৌগলিক জাতীয়তার মতবাদের ভিত্তিতে বাস্তবিকভাবে একটা জীবন ব্যবস্থা চালু ছিলো। সে জীবন ব্যবস্থার শিকড় শুধু শাসন ব্যবস্থায় নয়, বরং শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বহু দূরব্যাপী ও গভীরভাবে বিস্তৃত। এ ব্যবস্থার তিনটে মতাদর্শের প্রত্যেকটা পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এর সাথে সাথে দ্বিতীয় যে বাস্তব সমস্যাটা আমাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আছে তা এই যে, এই সমাজে শুধু সাধারণ মানুষ বাস করে না বরং মুসলমান ও অমুসলমান এই দু'টো জনগোষ্ঠী বাস করে। অমুসলিম গোষ্ঠীর সংখ্যাগুরু অংশ হিন্দু। মুসলমানদের মধ্য থেকে যে শ্রেণীর

হাতে বর্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি রয়েছে সে শ্রেণীটি মানসিকভাবে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার বিরোধী, যার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা তৎপর তারা দীর্ঘকালব্যাপী চালু ধর্মহীন শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতি। অমুসলিমদের মধ্যে যে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, স্বাদেশিক জাতীয়তাবাদের প্রতি তাদের শুধু আবেগোদ্দীপ্ত ঝোঁক নয়, বরং তাদের যাবতীয় স্বপ্নসাধ ও যাবতীয় স্বার্থ নিহিত রয়েছে স্বাদেশিক জাতীয়তাবাদভিত্তিক ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এ পরিস্থিতিতে যুক্ত নির্বাচন অমন সাদামাটা রূপ নিয়ে আসবে না যেমনটি আপনি কল্পনা করছেন এবং যাকে আপনি ইসলামি কর্মসূচি পেশ করার পক্ষে যুৎসই ভাবছেন। ওটা আসবে তার পুরো ঐতিহাসিক ও বর্তমান পটভূমি নিয়ে এবং স্বাদেশিক জাতীয়তাবাদ ও ধর্মহীনতার সমর্থকদের হাতিয়ার হয়ে। বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের বিরাজমান পরিস্থিতির উপর যার দৃষ্টি রয়েছে, সে কখনো এই খোশ খেয়ালে মত্ত থাকতে পারে না যে, সেখানে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা ধর্মহীনতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের তুলনায় ইসলামি কর্মসূচির জন্য বেশি অনুকূল হবে। ইসলাম ও ধর্মহীনতা এই উভয় মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব শক্তি, যে অনুকূল উপায় উপকরণ সেখানে রয়েছে, তার তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে সহজেই এই খোশখেয়াল দূরীভূত হতে পারে। পৃথক নির্বাচনের যতো কুফল এবং যুক্ত নির্বাচনের যতো উপকারিতাই আপনি দেখান না কেন, তা হুবহু মেনে নেওয়ার পরও এ প্রশ্ন থেকে যায় যে, আমরা বর্তমানে যে বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন তা উপেক্ষা করে উভয় ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার বিবেচনা না করা এবং একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে গ্রহণ করা বাস্তব প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশলতার দিক দিয়ে কতোখানি সঙ্গত?

আপনার আলোচনায় আপনি এ কথাও ভুলে গেছেন যে, ইসলামি কর্মসূচি পেশ করার জন্য সব জায়গায় একই ধরাবাঁধা নিয়ম অনুসরণ করা চলে না। স্থান কাল ভেদে এ কাজের বিভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি থাকে। কোথাও সমগ্র জনগোষ্ঠী অমুসলিম থাকে। কোথাও মুসলমান কিছু থাকলেও অমুসলিমদের প্রাধান্য ও অনৈসলামি বিধি ব্যবস্থারই আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বজায় থাকে। কোথাও মুসলমানের প্রাধান্য ও সংখ্যাধিক্য থাকলেও তারা একেবারেই উদাসীন ও পথভ্রষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ অনৈসলামি ব্যবস্থা অনুসরণ করতে থাকে। কোথাও আবার কুফরি ব্যবস্থার কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনেপ্রাণে ইসলামকে চায়। আর সর্বাপেক্ষা ভিন্ন অবস্থা দেখা দেয় সেই জায়গায়, যেখানে মুসলমানদের শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতাই বিরাজ করে না, বরং সেই সাথে সেখানে ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিত্তিও স্থাপিত হয়ে গেছে। এখন শুধু ইসলামি ব্যবস্থার পূর্ণতাদান বাকী। পাকিস্তানে আমরা প্রথমোক্ত চার অবস্থার কোনোটার সম্মুখীন নই। এখানে শেষোক্ত অবস্থা বিরাজমান। এখানে আপনাকে সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকেই ডাক

দিতে হবে এই অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য এবং ঘোষণা দিতে হবে যথোপযুক্ত কর্মসূচি। এ পর্যায়ে যদি যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালু থাকে, তাহলে আপনাকে অনেক পেছনে হটে যেতে হবে এবং যেখান থেকে দাওয়াতের সূচনা করলে মুসলমান ও অমুসলমান উভয়কে সমভাবে আকৃষ্ট করা যায়, সেখান থেকেই দাওয়াত দিতে হবে। সেই সাথে শাসনব্যবস্থার যে ভিত্তি স্থাপন করা হয়ে গেছে, সেটা উপেক্ষা করে নতুন করে ভিত্তি স্থাপনের কথা পাড়তে হবে। বাস্তব পরিস্থিতিকে যে ব্যক্তি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করছে, সে আপনার এই বুদ্ধিমত্তা দেখে না হেসে পারবে না। আর যদি আপনি তা না করেন, বরং এই অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যেই কর্মসূচি দেন তাহলে আমাকে বলুন, কোন যুক্তিতে আপনি অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে একথা বলবেন যে, আধা ইসলামি শাসনতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শাসনতন্ত্রে রূপান্তরিত করা এবং ইসলামি শাসনতন্ত্রের দাবি যথাযথভাবে ও অবিকৃতভাবে পূরণ করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহতে অভীষ্ট ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রাজ্ঞ লোকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অতএব, এস আমাদের সাথে মিলিত হয়ে তোমরাও এ ধরনের লোক নির্বাচন করে দাও এবং ইসলামি শাসনতন্ত্রের যে ভিত্তি গড়া হয়েছে, তা যারা ধ্বসিয়ে দিয়ে স্বাদেশিক জাতীয়তার ভিত্তিতে ধর্মহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের সংশ্রব ত্যাগ করো।

এখানে শুধু বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তব কৌশলেরই নয়, বরং কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণিত সংবিধানের প্রশ্নও জড়িত। এই সংবিধান ইসলামের অনুগত ও অবাধ্যদেরকে কোনো অবস্থাতেই এক পর্যায়ে গণ্য করে না। ঈমান ও আমল তথা বিশ্বাস ও বাস্তব অনুসরণের দিক দিয়ে অনুগতদের যতোই স্তরভেদ থাকুক না কেন, চাই তাদের কেউ সততা ও সত্যনিষ্ঠার সর্বোচ্চ স্তরে থাকুক অথবা ইসলামের একেবারে প্রাথমিক স্তরে থাকুক, সাংবিধানিক অবস্থানের দিক দিয়ে তারা সবাই সমান। তাদের তুলনায় ইসলামকে যারা আদৌ মানে না তাদের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইসলামি রাষ্ট্র যখনই কায়েম হবে, ইসলামি সংবিধানের আলোকে তার ইমারত ইসলামি সমাজের ভিত্তির উপরই গড়ে তোলা হবে। যারা ইসলামি ব্যবস্থায় বিশ্বাসী তাদের হাতেই ন্যস্ত থাকবে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার। যারা আদৌ তাতে বিশ্বাসী নয় তাদের হাতে কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সে রাষ্ট্রের কার্য নির্বাহকদের নির্বাচন, নিয়োগ ও পদচ্যুতির ক্ষমতা ইসলামের অনুগতদের হাতেই থাকবে, অবাধ্যদের হাতে নয়। এ তারতম্য ও পার্থক্য স্বয়ং ইসলামেরই প্রবর্তিত বিধান। এর পরিপূর্ণ দাবি তো শুধুমাত্র মুসলমানদের নিয়ে পার্লামেন্ট গঠন। কিন্তু পরিস্থিতি ও সময়ের বিচারে যদি পার্লামেন্টে অমুসলিমদেরকেও অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়, তবে তার মুসলমান সদস্যদের অন্তত মুসলমানদের ভোটেই নির্বাচিত হওয়া চাই। এতে

অমুসলিমদের রায়ের নাক গলানোর কোনো অর্থ হয় না। এতে যদি বৈষম্য ও জাতিভেদের সৃষ্টি হয় তবে তাতে কিছু আসে যায় না। ইসলামের দাওয়াত দিতে অসুবিধা ও অন্তরায় সৃষ্টি হলেও পরোয়া নেই। আমরা তো ইসলাম স্রষ্টা নই যে, আপন খেয়ালখুশি মোতাবেক কর্মসূচি তৈরি করবো। ইসলামি দাওয়াতের স্বার্থ আমাদের দৃষ্টিতে যে পন্থায় রক্ষা পায় সে পন্থাই গ্রহণ করবো, এ অধিকার আমাদের নেই। ইসলাম নিজেই যখন তার বিধানে মুসলমান অমুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করে। তখন আমরা ইসলামের চেয়েও তার ভালোমন্দ বেশি বুঝার দাবিদার কিভাবে হই? আর তার নিজের প্রবর্তিত এই পার্থক্যকে উপেক্ষা করে এক আজগুবি ইসলামি বিধান তৈরির কর্মসূচি আমরা কোন্ অধিকারে গ্রহণ করি?

৩. বর্তমান অর্ধ ইসলামি শাসনতন্ত্রের যে ক'টি সম্ভাব্য বিপদের বর্ণনা আপনি দিয়েছেন তার সবই সত্য? এর মধ্যে যে ক'টি আসন্ন বিপদের উল্লেখ আপনি করেছেন আমরা তার চেয়েও অনেক বেশি বিপদের আশংকা অনুভব করি। এ শাসনতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শাসনতন্ত্রে উন্নীত করার উপর আপনি যতো জোর দেবেন তার সবটাই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এ সবের বর্ণনা দিতে গিয়ে আপনি যখন এতোটা অতিরঞ্জিত করেন যে, বর্তমান অর্ধইসলামি শাসনতন্ত্রের চাইতে ধর্মহীন শাসনতন্ত্র তৈরি হওয়া অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়, তখন আপনার সাথে একমত হওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত কাফেরদের পরিচালিত রাষ্ট্রের ধর্মহীন হওয়া এক জিনিস, আর মুসলমানদের জাতীয় রাষ্ট্রের ধর্মহীন হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এই দু'টোতে আকাশ পাতাল পার্থক্য। পাকিস্তানের নবজাত রাষ্ট্রকে যদি শুরুতেই ধর্মহীনতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা না করা হতো এবং মুসলমানদের জাতীয় আবেগ উদ্দীপনাকে ইসলামি রাষ্ট্রের দাবির দিকে চালিত করা না হতো, তাহলে এখানে অচিরেই ইসলামি শাসন কায়েমের আন্দোলনের পথে বর্তমান অবস্থার তুলনায় বহু গুণ বেশি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যেতো। পাহাড় ডিঙ্গানোর আগ্রহে নিজের সামনে সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি করা, অত:পর তা অতিক্রম করার পরিকল্পনা করা কোনো বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। বর্তমান অর্ধইসলামি শাসনতন্ত্রের যতো ধোঁকাপূর্ণ ও বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্যই থাক এর কল্যাণে আমাদের সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটা অর্জিত হয়েছে তা হলো এখন গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এখন আমরা সঠিক ভারসাম্য সহকারে চেষ্টা চালাতে পারি যাতে একদিকে দেশবাসীর চিন্তাধারা, ধ্যান ধারণা ও নৈতিক মূল্যবোধকে পর্যায়ক্রমে পাল্টানো যায়, অপরদিকে পাল্টানোর সাথে সাথে সেই অনুপাতে নির্বাচনের উপর প্রভাব

বিস্তার করে এতোটা শক্তি সঞ্চয় করা যায়, যাতে করে দেশের সঠিক জীবনধারাকে কার্যত ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় উপায় উপকরণ কাজে লাগানো সম্ভব হয়। এভাবে এই ধারাবাহিক বিকাশ ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক সময় সমাজ ও রাষ্ট্র পুরোপুরি ইসলামের অনুসারী হয়ে যেতে পারে। সম্পূর্ণ ধর্মহীন শাসনতন্ত্র তৈরি হয়ে গেলে আমাদের জন্য এ পথ রুদ্ধ থাকতো। এ পথ খোলার জন্য আমাদেরকে এরচেয়ে বহুগুণ বেশি কঠিন অন্যান্য পন্থার অন্বেষণ করতে হতো। তবুও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদেরকে এ কথা ভেবে নিদারুণ উদ্বেগে কাল কাটাতে হতো যে, রাষ্ট্রের কুফরি ভাবধারাকে কার্যত ইসলামি ভাবধারায় পরিবর্তিত করার শেষ পদক্ষেপটা (Final Act) কি হওয়া উচিত।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। বিগত আট নয় বছর ধরে সংগ্রাম চালিয়ে আমরা যে শুধু রাষ্ট্রকে একটা কট্টর অনৈসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া থেকে ঠেকাতে পেরেছি এবং কোনো রকমে একটা অর্ধইসলামি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পেরেছি, এটা মারাত্মক ভুল ধারণা এবং সত্যের নিদারুণ অপলাপ। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের শাসনতান্ত্রিক সংগ্রাম নিছক শাসনতন্ত্র রচনার সংগ্রাম ছিলো না। ওটা আসলে এ দেশের দুটো বিপরীত ধারার দ্বন্দ্বই ফুটিয়ে তুলেছিল। একটা ধর্মহীন প্রবণতা দেশটাকে পুরোপুরি মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিয়েছিল। তার পৃষ্ঠপোষকতায় শুধু যে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় উপায় উপকরণ নিয়োজিত ছিলো তা নয়, বরং সারা বিশ্বের বিজয়ী সভ্যতার গোটা আদর্শিক ও তাত্ত্বিক পুঁজি এবং আমাদের জাতির ভেতরকার সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীসমূহের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সক্রিয় সহযোগিতাও তাকে পোষকতা দিয়ে যাচ্ছিলো। এই পোষকতার কল্যাণে উক্ত ভাবধারার ধারক বাহকরাই এই নবজাত রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা কোন্ কোন্ আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলো। কেননা শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্বে নিয়োজিত গণপরিষদে মাত্র এক ব্যক্তি ছাড়া আর সকলেই ছিলো একেবারেই ধর্মবিমুখ অথবা অন্ততপক্ষে ইসলামি ভাবধারার প্রতি উদাসীন। অপরদিকে ইসলামি ভাবধারার পশ্চাতে মুসলিম জনগণের আবেগ বিজড়িত ইসলামপ্রীতি ছাড়া আর কোনো পার্থিব ও বস্তুগত শক্তি ছিলো না। আর এই আবেগবিজড়িত ইসলাম প্রীতিরও অবস্থা ছিলো এরূপ যে, ধর্মের নামে যে কোনো তামাশা দেখিয়ে তাদেরকে প্রতারিত করা যেতো। এমনকি ক্ষুধা ও খাদ্যের দোহাই পেড়ে তাদেরকে সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করাও সম্ভব ছিলো। ইসলামি রাষ্ট্রের যে অস্বচ্ছ ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে বিরাজমান ছিলো তার কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ছিলো না। এমনকি বড় বড় বিদ্যান লোকদের মাথায়ও এর চেয়ে বেশি

কিছু আসতো না যে, ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হলে ইসলামি বুৎপত্তিসম্পন্ন লোকেরা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হবে এবং ইসলামি আদালতে বিচার আচার হবে। এহেন অবস্থা থেকে আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু হয়ে তা যে বর্তমান আধা ইসলামি শাসনতন্ত্র তৈরি হওয়া পর্যন্ত গড়িয়েছে, সামগ্রিকভাবে এ কার্যক্রম কি ইসলামি ভাবধারার শক্তি বৃদ্ধি এবং ধর্মবিমুখ ভাবধারার শক্তি খর্ব হওয়া ছাড়াই সফল হতে পেরেছে বলে আপনি মনে করেন? বস্তুত এটুকু সাফল্য দ্বারা স্পষ্টতই পরিমাপ করা চলে যে, এ আট নয় বছরে উভয় ভাবধারার শক্তির কতোটা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। শুধু একটা শাসনতান্ত্রিক দাবি তোলা দ্বারাই তো আর এ সাফল্য আসেনি। আজকে যেটুকু কৃতকার্যতা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা জনগণের দোদুল্যমান ভাবাবেগকে অন্য কোনো দিকে চালিত হতে না দিয়ে নিশ্চিতভাবে ইসলামি ভাবধারার দিকে চালিত করতে পারাই সার্থক কৃতিত্ব। ইসলামি ব্যবস্থা ও ইসলামি রাষ্ট্রের একটা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ধারণা জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামি আদর্শের অন্তত ততোটুকু পরিচয় তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো লোক দেখানো লেবেল দ্বারা তারা প্রতারিত না হয়। তাদের মধ্যে ইসলামের তীব্র আকাঙ্ক্ষা না হোক অন্তত এতোটুকু চাহিদা জন্মানো হয়েছে, যাতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ গ্রহণে সম্মত না হয়। তাদের জনমত গঠন করে ইসলামি আদর্শের পক্ষে দেশবাসীকে এতোটা দীক্ষিত করা হয়েছে যে, দেশকে অন্য কোনো দিকে চালিত করা দু:সাধ্য হয়ে পড়েছে। আর যতোটুকু সামনে আগানো হয়েছে সেখান থেকে পিছু হটাও আর সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ইসলামি জীবন ব্যবস্থা, ইসলামি আইন এবং ইসলামি শাসনতন্ত্র সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠা ও বিভ্রান্তি নিরসনে যথেষ্ট কাজ করা হয়েছে। এর কল্যাণে আজ এই শ্রেণীর যে অংশ ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক, তার চেয়ে বড় অংশ ইসলামের সমর্থক। অধিকন্তু এই সময়ে ইসলামের পক্ষে সক্রিয় আন্দোলনে নিয়োজিত ও তার সহযোগীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এ জিনিসটাকে আন্দোলনের সূচনাকালের অবস্থার সাথে তুলনা করলে অস্বীকার করা যাবে না যে, আজ এই ভাবধারার সেবা করার জন্য অনেক হাত প্রসারিত, অনেক মনমগজ প্রস্তুত এবং অনেক উপায় উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। আর এসব কিছু আধাইসলামি শাসনতন্ত্র রচনা করেই নি:শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের ভবিষ্যতের কাজের জন্যও তা পুঁজি হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহের পর যদি আর কোনো জিনিসের উপর নির্ভর করে পরবর্তী সংস্কার ও নির্মাণের ব্যাপারে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে সেটা এই অতীত কাজের সংগৃহীত পুঁজি ছাড়া আর কিছু নয়। এর মূল্যমান মাত্রাতিরিক্ত বাড়িয়ে অনুমান করা যেমন ভুল, তেমনি কমিয়ে দেখাও ভুল। বাস্তবতার চেয়ে অতিরিক্ত ধারণা করার পরিণাম

যেমন হবে আমাদের হাতে যতোটা শক্তি সঞ্চিত আছে তার চেয়ে বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া, তেমনি বাস্তবতার চেয়ে কম অনুমান করারও ফল হবে এই যে, যেটুকু করার সাধ্য আমাদের রয়েছে তাও করতে পারবো না। অত:পর এমনও হতে পারে যে, এর সুযোগ আর কখনো পাবোনা কিংবা আজকের তুলনায় সুযোগ অনেক কমে যাবে।

৪. জামায়াতে ইসলামির যেসব লোক তাদের কথাবার্তা কিংবা কার্যকলাপ দ্বারা আপনার মনে এই অভিযোগ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ দিয়েছে, যার উল্লেখ আপনি চিঠির শেষভাগে করেছেন, তাদের জন্য আমি দু:খিত। ঐ লোকদের সঠিক পরিচয় জানতে পারলে আমরা অনুসন্ধান চালাবো এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টায় কসুর করবো না। তবে জামায়াত দলগতভাবে বর্তমান শাসনতন্ত্রের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করতে এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শাসনতন্ত্রের ধারণা দিতে কখনো শৈথিল্য দেখায়নি। আর জনগণকে কখনো এ ধারণাও দেয়নি যে, ইসলামি শাসনতন্ত্রতো পূর্ণাঙ্গভাবেই তৈরি হয়ে গেছে। এখন কেবল যুক্ত নির্বাচিত হবে না পৃথক নির্বাচন হবে, সেই ব্যাপারে শেষ অভিযান চালানোটাই বাকী। অন্যান্য যেসব ত্রুটির উল্লেখ আপনি করেছেন, সেগুলো দূর করার জন্য ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই চেষ্টা করা হবে। তবে মানুষের কাজতো কখনো পুরোপুরি নির্ভুল ও নিখুঁত হতে পারে না। তথাপি আপনি জামায়াতের এবং আমার দুর্বলতা সম্পর্কে সাবধান করা অব্যাহত রাখলে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। বিশেষত আমাকে এ কথাটা অবশ্যই জানাবেন যে, আমি কোথায় আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাজের ভুল মূল্যায়ন করেছি অথবা তাদের ইসলামি প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করেছি। আমার যে কাজেরই ভুলত্রুটি আমাকে ধরিয়ে দেওয়া হবে এবং তার ভ্রান্ত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত করা হবে, তা আমি শুধরাতে প্রস্তুত। আপনি বিশ্বাস করুন যে, এ ধরনের কোনো কাজ আমার দ্বারা হয়ে থাকলেও তা সজ্ঞানে হয়নি। *(তরজমানুল কুরআন, রবিউস সানি ১৩৭৬ হি., ডিসেম্বর ১৯৫৬ খৃ.)*

দীন প্রতিষ্ঠার কাজ কি সকলের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয?

প্রশ্ন : আপনার কর্মব্যস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে প্রশ্ন করে কষ্ট দেওয়া সমীচীন নয়, তথাপি বাধ্য হয়ে আপনার কাছ থেকেই এ প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে চাই। কেননা আপনার সযত্ন প্রচেষ্টার ফলে যে সংগঠনটি গড়ে উঠেছে এবং কর্মতৎপর রয়েছে, আমার এ প্রশ্নগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেই সংগঠন সংক্রান্ত। আমি নয় বছর যাবত এই জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই সময়ে আমি এর প্রায় সমস্ত বই পুস্তক যথাযথ মনোযোগের সাথে পড়েছি। অত:পর আমি একটি আন্তরিক দায়িত্বানুভূতির অধীনেই শুধু নয় বরং বিবেকের চাপেই এ সংগঠনে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আমি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র যুক্তি

প্রমাণ দ্বারা ভালো করে বুঝেসুজে এই জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামাতে যুক্ত হওয়াতে নিজের ঈমান ও আত্মশুদ্ধির দাবি বলে মনে করেছি। আমি আবেগের বশে নয় বরং পূর্ণ সচেতনতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এ ধারণা পোষণ করি যে, যে ব্যক্তির কাছে এ জামায়াতের সত্যপন্থী হওয়া সুস্পষ্ট না হয় সেতো আল্লাহর কাছে ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তির বিবেক সোচ্চার কণ্ঠে তাকে জানিয়ে দেয় যে, এ উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামিই একমাত্র দল, যা এ যুগে ইসলামের কাজ সঠিক পদ্ধতিতে করছে এবং এ ভূখণ্ডে আর কোনো দল দলগতভাবে এমন নিষ্কলুষ চিন্তা ও কর্মের অধিকারী নয়, আল্লাহর দৃষ্টিতে তার উপর এ দলে যোগদান করা 'ফরযে আইন' তথা ব্যক্তিগতভাবে ফরয হয়ে যায়। সে যদি এরপরও কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা দুনিয়াবী সুবিধার খাতিরে এ দলের সাথে সম্পর্ক না রাখে, তবে তাকে এ জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর সাক্ষী যে, আমি এ কথাগুলো বলতে গিয়ে কোনো দলীয় গোড়ামী বা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেইনি, কেবল নিজে যা বুঝেছি সেটাই ব্যক্ত করেছি। যদি এতে আমার কোনো ভুল বুঝাবুঝি থেকে থাকে, তবে তা দূর করে দেবেন।

এখানে আমি সাত আট মাস যাবত অবস্থান করছি। এখানে একজন গণ্যমান্য আলেমের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। তিনি জামায়াতের দাওয়াত ও কর্মপদ্ধতিকে সঠিক মনে করেন এবং তিনি জামায়াতের যথারীতি মুত্তাফিকও (সহযোগী সদস্য)। তা সত্ত্বেও তাঁর মত এই যে, আল্লাহর দীন কায়েম করার জন্য জামায়াত যে কাজ করছে তা 'ফরযে আইন' নয়, বরং ফরযে কেফায়া। তাই কিছু লোক যখন এ কাজে অংশ নিচ্ছে তখন প্রতিটি মানুষের তাতে অংশগ্রহণ করা জরুরি নয়। যদি কারো পার্থিব স্বার্থ এ কাজে অন্তরায় হয়, সে কারণে সে এ দলের সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ইকামতে দীনের জন্য ব্যক্তিগতভাবেও কোনো কাজ না করে, তবে তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। এটা জানাযা নামাযের মতো। কারো যদি সুযোগ ও সময় থাকে এবং তার মনে চায়, তাহলে সে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর যদি তার সুযোগ ও অবসর না থাকে এবং তার মনে না চায়, তাহলে তার তাতে অংশগ্রহণ না করার পুরো অধিকার রয়েছে।

এতো হলো ইকামতে দীনের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর অভিমত। জামায়াতের সাংগঠনিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ, তার আমীরের আনুগত্য, এ কাজে যেসব বিপদ মুসিবত ও সমস্যা দেখা দেয় তার উপর ধৈর্য ধারণ করা এবং এ লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে সব রকমের জানমালের কুরবানী দেওয়া, এ সব তিনি একেবারেই নফল মনে করেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, এ কাজগুলো তাহাজ্জুদের নামাযের মতো। আল্লাহর কাছে উচ্চতর মর্যাদা লাভের জন্য এসব জরুরি, কিন্তু শুধুমাত্র মুক্তি ও ক্ষমা লাভের জন্য জরুরি নয়। তাঁকে যখন বলা হলো যে, যাঁরা এ পথে

প্রাণ উৎসর্গ করেছে এবং নিজের সন্তান ও পরিবারের ভবিষ্যতের কথা কিছুমাত্র ভাবেনি, তারা কি নিছক একটা নফল কাজের জন্য এতো কিছু করলো? তখন তিনি হাঁ সূচক জবাব দেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, তাদের এই সমস্ত ত্যাগ ও কুরবানী কেবল উচ্চতর মর্যাদা লাভের জন্য ছিলো, এগুলো তাদের উপর ফরয ছিলো না। তাঁর কাছে ইখওয়ানের দৃষ্টান্ত পেশ করা হলে তিনি এসব মন্তব্য করেন। তাঁর যুক্তির ধরন এ রকম যে, তা সঠিক বলে মেনে নিলে ইখওয়ান এবং তাদের মতো আর যেসব ইসলামি লোক আল্লাহর উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন তারা প্রশংসনীয় নয়, বরং উল্টো তিরস্কারযোগ্য সাব্যস্ত হবেন। কেননা নিছক একটি নফল কাজের জন্য মৃত্যুবরণ করা এবং পোষ্যদেরকে অসহায় অবস্থায় ফেলে যাওয়া ধর্মীয় বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কি হতে পারে? এ ধরনের কাজ যারা করে তারা আল্লাহর কাছে আযাব পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত না হয়ে পারে না।

জামায়াতের সাংগঠনিক শৃংখলা মেনে চলা এবং আমীরের আনুগত্যের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন, যুগে যুগে দেশে দেশে ইসলামি আন্দোলন পরিচালনার জন্য এ ধরনের বিভিন্ন সংগঠন কায়েম হয়ে থাকে। এসব সংগঠনের শৃংখলা ও তার নেতার আনুগত্য করা ফরয নয়। আনুগত্য ফরয ছিলো কেবল রসূল সা. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের। বিভিন্ন দেশে ইসলামের কাজ করার জন্য সময়ে সময়ে যেসব দল গঠিত হয় তার নেতাদের আনুগত্য করা ফরয নয়। অর্থাৎ কিনা এখন ইসলামের জন্য করার মতো আর কোনো কাজ বাকী নেই। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ যুগে যদি হুবহু নবুয়তের ধারায় খেলাফত পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তার আমীরের আনুগত্য করা যে খোলাফায়ে রাশেদীনের মতোই ফরয সেটাও তিনি মানতে রাজি নন।

ইসলামের বুৎপত্তিসম্পন্ন একজন আলেমের মুখ থেকে এসব কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। আমি নিজের অপরিপক্ক ইসলামি জ্ঞান দ্বারা যতোটা পারি তাঁকে বুঝাতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁর প্রথম ও শেষ কথা এই যে, এ কাজগুলো ফরযে আইন নয় বরং ফরযে কেফায়া বা নফলের পর্যায়ভুক্ত। এ ধরনের চিন্তাধারা ইসলামি আন্দোলনের বিকাশ ও বিস্তারের জন্য বিষবৎ। যে তরুণ সবেমাত্র এ আন্দোলনে ঢুকেছে এ জাতীয় কথাবার্তা তার কানে যাওয়া তার কর্মক্ষমতাকে নিস্তেজ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই ভ্রান্ত চিন্তাধারা খণ্ডন করা উক্ত আলেম ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য নয়, বরং অন্যরা যাতে এর দ্বারা সংক্রমিত না হয় সেজন্য জরুরি। জামায়াতের সমগ্র বই পুস্তকেই এর জবাব রয়েছে তা জানি। তবে কোনো এক জায়গায় এর সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য জবাব সম্ভবত নেই।

এই আলেম সাহেবের মাথায় ফেকাহ্ শাস্ত্রীয় পরিভাষা এমনভাবে জট পাকিয়ে রয়েছে যে, জামায়াতের বইপুস্তকের সমস্ত যুক্তি প্রমাণ তাঁর কাছে ভারহীন মনে হয়। তিনি বলেন যে, জামায়াতের বইপুস্তকে যুক্তিপ্রমাণ থাকে না। প্রথমে তো

আমি তার এ মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। কেননা অকাট্য যুক্তি প্রমাণে সমৃদ্ধ হওয়াই যে জামায়াতের বই পুস্তকের বৈশিষ্ট্য, সে কথা বিরোধীরাও স্বীকার করে থাকে। এজন্য যখন তাঁর কাছে উক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হলো তখন তিনি বললেন যে, এতে হানাফী মাযহাব অথবা অন্যান্য মাযহাবের ফিক্হ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীর বরাত দেওয়া হয় না। কেবল নিজস্ব ধারার কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ দেওয়া হয়। তাঁর বক্তব্যের সারকথা এই দাঁড়ায় যে, যদি হানাফী ফিক্হের কোনো কিতাবে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, ইকামাতে দীন এবং তার জন্য একটা দল গঠন, অত:পর সেই দলীয় শৃংখলা ও আমীরের আনুগত্য করা ফরযে আইন, তাহলে তিনি তা মেনে নেবেন। অন্যথায় তিনি এ জন্য প্রস্তুত যে, জামায়াতের বৈঠকে যোগদান ও সাপ্তাহিক রিপোর্ট দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি জামায়াতের সহযোগী সদস্যপদ থেকেও সরে দাঁড়াবেন। এজন্য আমার বাসনা এই যে, জবাবে যদি হানাফী ফিক্হের কিতাবাদির বরাত দেওয়া সম্ভব হয় তবে তা যেনো দেওয়া হয়। হয়তো বা এতে তার মাথার জট খুলে যাবে।

আমার নিজের পক্ষ থেকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমার মনে প্রায়ই এ প্রশ্নটা জেগে থাকে যে, ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে পাঁচটা জিনিসের উন্মেষ করা হয়েছে। এর মধ্যে দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সাধনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অথচ গুরুত্বের বিচারে এটা ৬ষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত ছিলো। এটা যদি হতো তাহলে ইসলাম কেবল নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না। বরং যে দাবি ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক যুগে স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলন চালু হয়েছে, সেই দাবি ও লক্ষ্য প্রত্যেক মুসলমানের মনে সব সময় জাগরুক থাকতো। ইসলামি বিধানে ইকামতে দীনের দায়িত্ব ও কর্তব্য কিরূপ গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী, সে কথাটা স্পষ্ট করে লিখে জানাবেন।

আর একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কথা বলছি। ইনি জামায়াতের এতো ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে, রুকনিয়াতের (সদস্য পদ) দরখাস্ত দিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে এমন এক চিন্তার উদ্ভব হলো যে, সকল সম্পর্ক ঝেড়েমুছে জামায়াত থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন, যেন জামায়াতের সাথে তার কখনো কোনো সংশ্রবই ছিলো না। তিনি বলেন যে, ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার পর পাকিস্তান একটা ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেছে। এখানে সকল মুসলিম নাগরিক একটা আনুগত্যের ব্যবস্থার আওতায় এসে গেছে। এই আনুগত্য ব্যবস্থা সবাইকে মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে এবং এর স্থান সব কিছুর উপরে। এখন সকলের আনুগত্য এই বৃহত্তর আনুগত্যের ধারায় এসে মিলিত হয়েছে। সুতরাং এর উপস্থিতিতে অন্য কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং জনগণকে তার অনুগত হওয়ার আবেদন জানানো একটা রাষ্ট্রের ভেতরে আর একটা বিকল্প রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার সাথে তুলনীয়। মোটকথা, এখন আর কোনো সংগঠন এবং আর কোনো আমীরের প্রয়োজন নেই। পাকিস্তান একটা ইসলামি রাষ্ট্র। সরকার তার সাংগঠনিক রূপ। সকল মুসলিম নাগরিক এখন আর কোনো দলের নয় বরং এই রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী সংগঠনের সদস্য। এখন তাদের যাবতীয় আনুগত্য ও অঙ্গীকার এই রাষ্ট্রের একমাত্র প্রাপ্য, অন্য কোনো সংগঠনের নয়। এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছাড়া এখন আর কারোর আনুগত্য করা উচিত নয়। এটা এমন এক ধরনের যুক্তিতর্ক, যার পরিণতিতে নাগরিকদের সমিতি গঠনের (Right to form Associations) অধিকারই খতম হয়ে যেতে বাধ্য। শুধু যে খতম হয়ে যায় তা নয়, বরং একথার উল্লেখ করাও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শামিল। আপনার কাছে এ যুক্তির কি জবাব আছে? সত্যিই কি ইসলামি রাষ্ট্রে অন্য কোনো দল গঠিত হতে ও টিকে থাকতে পারবেনা? যদি পারে, তাহলে একটা আনুগত্য ব্যবস্থা হিসেবে তার মর্যাদা কি হবে? এখন কি কোনো মুসলমানদের এরূপ যুক্তি দেওয়া চলে যে, এখন তার ইসলামের দাবি পূরণের জন্য কোনো দলে শামিল হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা সে একটা ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এ প্রশ্নগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এগুলোর জবাব তাত্ত্বিকভাবেই দেওয়া দরকার।

একটা প্রশ্ন হলো, শরিয়তে জামায়াতে নামায পড়ার গুরুত্ব কিরূপ? এটা ওয়াজিব না সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, না ওয়াজিব কেফায়া, না সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কেফায়া? কি কি অবস্থায় এবং কোন্ কোন্ ওজরে জামায়াতের কড়াকড়ি শিথিল হয়? আমাদের এখানে মসজিদের সংখ্যা কম এবং দূরে দূরে অবস্থিত। তাই অধিকাংশ লোক বাড়িতে নামায পড়ে। একটু কষ্ট করলেই মসজিদে গিয়ে পড়া যায়। কিন্তু কেউ কেউ সঙ্গির অভাবের ওজর দেয়। কেউ অন্ধকারে রাতের অজুহাত তোলে, কেউ কাদা পানি ও খারাপ রাস্তার যুক্তি দেয়। এসব ওজর আপত্তি কি যুক্তিসঙ্গত? কেউ কেউ দোকানেই নামায পড়ে এবং একাকীত্বের ওজুহাত দেয়। এদের মধ্যে জামায়াতের রোকন ও কর্মীরাও রয়েছে। এদের দীর্ঘ সময় ধরে বৈঠক করতে করতে জামায়াতের সময় চলে যায়। পরে একা একা নামায পড়ে নেয়। এটা কতোখানি সঙ্গত হচ্ছে জানাবেন।

কবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে মিথ্যা কোন পর্যায়ের? কুরআন ও সুন্নাহতে এর কিরূপ নিন্দা এবং মিথ্যুকের জন্য কি ধরনের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে জানাবেন। কোন্ কোন্ অবস্থায় কি মিথ্যা বলা বৈধ হয়ে যায়?

কারো কাছে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যের অথচ সাড়ে সাত তোলার চেয়ে কম ওজনের স্বর্ণ থাকে, রূপা মোটেই না থাকে এবং টাকা মোটেই সঞ্চিত না থাকে, তাহলে তার যাকাত দিতে হবে কিনা? স্বর্ণের যাকাতের নেছাব সাড়ে সাত তোলা হওয়ার কারণেই এ প্রশ্ন জাগে।

অধিকাংশ লোক বেতেরের তৃতীয় রাকাতে গদবাঁধাভাবে সূরা এখলাস পড়ে থাকে। এ ব্যাপারটা রমযানেই বেশি দেখা যায়, যখন তারাবীর পর জামায়াতের সাথে বেতের পড়া হয়। এ রকম নির্দিষ্ট করে নেওয়ার পক্ষে কি কোনো প্রমাণ আছে, না এটা নিছক প্রথামাত্র। এভাবে নির্দিষ্ট করা কি জায়েয?

ফেতরার পরিমাণ নিয়ে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। কেউ সোয়া সের গম দেয়, কেউ পৌনে দুসের দেয়, আবার কেউ দেয় সোয়া দুসের। এর সঠিক পরিমাণ কতো? আপনি নিজে কিভাবে ফেতরা দেন? ফেতরা সম্পর্কে আর একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা যে, কোনো ব্যক্তির নিজের উপর যদি ফেতরা ওয়াজেব না হয় বরং তার স্ত্রীর উপর ওয়াজেব হয়, তাহলে ফেতরা শুধু স্ত্রী দিলেই চলবে, না স্বামীরও দিতে হবে? সন্তানদের পক্ষ থেকেও ফেতরা দিতে হবে কিনা?

জবাব : জামায়াত সম্পর্কে আপনি নিজের যে দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেছেন প্রায় সেই দৃষ্টিভঙ্গিই আমি জামায়াত গঠনের সময় বর্ণনা করেছিলাম। তারপর থেকে অব্যাহতভাবে আমি মানুষকে এ কথাই বুঝাবার চেষ্টা করে আসছি যে, সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এবং জামায়াতকে সত্যপন্থী দল হিসেবে বুঝতে পারার পর তার সমর্থন ও সহযোগিতা না করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তবে যাদের মনে জামায়াতের নীতি সম্পর্কে কোনো সংশয় রয়েছে কিংবা সততা ও আন্তরিকতার সাথে তার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে, তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে।

আপনি যে আলেমের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর এ ধারণা ভুল যে, দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সর্বাবস্থায় নিছক ফরযে কেফায়া। এটা ফরযে কেফায়া হবে কেবল তখনই, যখন কোনো ব্যক্তির নিজের দেশে বা অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ইসলামি রাষ্ট্রের উপর কাফেরদের কোনো আগ্রাসন নেই এবং আশপাশের এলাকায় ইকামতে দীনের চেষ্টা চালানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি কোনো গোষ্ঠী এ দায়িত্ব পালন করে, তাহলে বাদবাকী লোকদের উপর থেকে দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। ব্যাপারটা তখন জানাযার নামাযের মতো ফরযে কেফায়া হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম যদি মুসলমানদের নিজ দেশেই পরাজিত থাকে, আল্লাহর শরিয়ত পরিত্যক্ত ও রহিত অবস্থায় পড়ে থাকে, প্রকাশ্যে অনৈসলামি ও অশ্লীল কার্যকলাপ চলতে থাকে এবং ইসলামের যাবতীয় বিধি নিষেধ লংঘিত হতে থাকে অথবা দেশটাতো ইসলামি দেশে পরিণত হয়েছে কিন্তু তার উপর অমুসলিমদের আগ্রাসনের আশংকা দেখা দিয়েছে, এমতাবস্থায় এটা ফরযে কেফায়া নয় বরং ফরযে আইন হয়ে যায়। এ সময়ে ক্ষমতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করে না এমন প্রতিটি ব্যক্তি আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে। এ ব্যাপারে ঐ মাওলানা

সাহেবের উচিত ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় কিতাব পড়ার আগে কুরআন অধ্যয়ন করা, যাতে জেহাদ বর্জনকারীদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে, এমনকি তাদেরকে মুনাফেক পর্যন্ত বলা হয়েছে। অথচ তারা নামায, রোযা যথারীতি পালন করতো। কুরআন এ ধরনের পরিস্থিতিতে জেহাদকেই ঈমানের কষ্টিপাথর বলে আখ্যায়িত করেছে এবং জেনে শুনে জেহাদ বর্জনকারী এমনকি শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদের শত আনুগত্যকেও ভ্রুক্ষেপযোগ্য মনে করে না। এরপরও যদি তিনি কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন মনে করেন তবে ফিক্‌হ এর কিতাবগুলোতে জেহাদের অধ্যায় বের করে যেনো দেখে নেন যে, ইসলামি জনপদের উপর শত্রুর আগ্রাসন হলে জেহাদ ফরযে আইন হয় না ফরযে কেফায়া হয়। যে আমলে ফেকাহর এই সব কিতাব লেখা হয়েছে তখন মুসলিম দেশগুলোর কোনোটাতেই ইসলামি আইন পরিত্যাগ এবং ইসলামি দণ্ডবিধি স্থগিত হয়নি। এজন্য তারা কেবল শত্রুর আক্রমণের অবস্থায় ইসলামের বিধান কি; সেটাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যখন মুসলমানদের নিজ দেশে অনৈসলামি আইন চালু ও ইসলামি আইন বাতিল হয় এবং যারা ইসলামি দণ্ডবিধি প্রবর্তনকে অসভ্য ও অমানুষিক কাজ বলে আখ্যায়িত করে তাদের হাতে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তখন পরিস্থিতি বহিশত্রুর আক্রমণের চেয়েও বহুগুণ বেশি গুরুতর হয়ে পড়ে। ইসলাম সম্পর্কে যার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, সে এরূপ ক্ষেত্রে ইকামতে দীনের চেষ্টা সাধনাকে নিছক ফরযে কেফায়া বলতে পারে না।

এরপর আসে সাংগঠনিক শৃংখলার প্রসঙ্গ। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত চেষ্টা সাধনা ছাড়া বাতিল ব্যবস্থার মুকাবিলায় আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ কাজের জন্য দল বা সংগঠন গড়া জরুরি এবং সংগ্রামরত দল বা সংগঠনের শৃংখলা মেনে চলাও জরুরি। বহু সংখ্যক হাদিস থেকে এ বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। তবে যেখানে সকল মুমিনদের একটি মাত্র সংগঠন নেই, বরং এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামষ্টিক শক্তি সৃষ্টির বিভিন্নমুখী চেষ্টা চলছে, সেখানে একমাত্র সংগঠন 'আল জামায়াত' এর ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূল যে বিধান দিয়েছেন, সেটা তো প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু ইকামতে দীনের কাজটা কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং এ কাজে একজন মুমিনের অংশগ্রহণ কতো জরুরি সেটা যে ব্যক্তি জানে ও অনুভব করে, তার পক্ষে এই চেষ্টা সাধনার প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। যেসব সংগঠন বা দল এই চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত রয়েছে, তাদের তৎপরতাকে ঠাণ্ডা মাথায় পর্যবেক্ষণ করা এবং যেটাতে সত্যনিষ্ঠ ও সঠিক মনে হবে তাতে অংশগ্রহণ ও যোগদান করা তার অবশ্য কর্তব্য। অত:পর একটি সংগঠনকে সত্যনিষ্ঠ মনে করে তাতে যোগদান করার পর তার নেতৃত্বের আনুগত্য না করা ও সাংগঠনিক নিয়মশৃংখলা না মানা সম্পূর্ণ অনৈসলামী। এই আনুগত্য নফল নয়, বরং ফরয। কারণ তা ছাড়া ইকামতে

দীনের ফরয আদায় করা সম্ভব নয়। হাদিস ও কুরআনে আমীর বা নেতার আনুগত্যের যে নির্দেশাবলী এসেছে, তাকে শুধু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জন্য নির্দিষ্ট মনে করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তা যদি হতো, তাহলে তার অর্থ এটাই হতো যে, এখন আর কোনো ইসলামি সরকার যেমন চলতে পারে না তেমনি আল্লাহর পথে জেহাদ চালানোরও আর অবকাশ নেই। কেননা শৃংখলার আনুগত্য ও নেতার আদেশ শোনা ও মানা ছাড়া ইসলামি শাসন ও ইসলামি জেহাদ পরিচালনা করার কথা চিন্তাও করা যায় না। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে, ইসলামের ইলমের বাতাসও যার গায়ে লেগেছে, সে এমন আজগুবি ও উদ্ভট কথাবার্তা কিভাবে বলতে পারে।

দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কথা আপনি বলেছেন, তার মাথায় এমন তন্ত্রমন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, যা এ যুগের তথাকথিত 'আমীরুল মুমিনীন'দের মাথায়ও আসেনি। এ তত্ত্ব যদি তাদের মাথায় গজিয়ে বসে, তাহলে তারা দেশের সকল দলকে কলমের এক খোঁচায় বন্ধ করে দেবে। অত:পর এখানে ইসলামি আইন জারি করার নামও কাউকে উচ্চারণ করতে দেবে না, ফলে এখানে কেবল নাচগান ও পাপচারমূলক কর্মকাণ্ডই হতে থাকবে। এরপর এখানে অবাধে বৃটিশ আমলের আইন কানুন চলতে থাকবে। শরিয়তের বিধান বাস্তবায়নের সংগ্রামে লিপ্ত লোকেরা শুধু দুনিয়ার জীবনে নয় বরং পরকালীন জীবনেও অপরাধী ও আজাবযোগ্য বিবেচিত হবে। কেননা এই ব্যক্তির মতে মুসলিম জনতা শরিয়ত মোতাবেক ইসলামি বিধান বাস্তবায়নের চেষ্টা করারও অধিকারী নয়। আমি এ কথা শুনে খুবই খুশি হয়েছি যে, যে ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধির এমন দশা হয়েছে সে জামায়াত ছেড়ে চলে গেছে।

এবার আপনার প্রশ্নগুলোর ধারাবাহিক জবাব দিচ্ছি।

১. ইকামতে দীনের দায়িত্ব শরিয়তে কি মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী, সেটা বুঝতে আপনাকে বেগ পেতে হয়েছে এজন্য যে, আপনি ইসলামের স্তম্ভসমূহ ও মুমিনদের দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারছেন না। ইসলামের রুকন বা স্তম্ভসমূহ হলো ইসলামি জীবনের সৌধ গড়ার ভিত্তি। আর ইসলামি জীবনের সৌধ গড়ে তোলার পরে যে কাজগুলো ঈমানের দাবি অনুসারে করতে হয়, সেগুলো হলো মুমিনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলামের স্তম্ভ বা রুকনসমূহ যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে আদৌ ইসলামি জীবনের সৌধই তৈরি হবে না। কিন্তু এই সৌধ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ঈমানের দাবিগুলো যদি পূরণ করা না হয়, তাহলে সেটা হবে এমন যেনো জঙ্গলের মধ্যে একটি উদ্দেশ্যহীন বিরান ইমারত দাঁড়িয়ে আছে। দীন প্রতিষ্ঠার কাজ ইসলামের স্তম্ভ নয়, বরং তা ইসলামের সৌধ নির্মাণের প্রধানতম উদ্দেশ্য। অধিকন্তু এ কাজের উপরই ঐ সৌধটির স্থায়িত্ব, বাসযোগ্যতা ও সম্প্রসারণ নির্ভরশীল। এ কাজটা যদি অবহেলিত থাকে তাহলে ইসলামের সৌধ

ক্রমান্বয়ে ধ্বংসোন্মুখ হবে, তাতে কুফরি ও পাপচারের বসতি স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর তা আরো প্রশস্ত হয়ে সমগ্র মানব জাতির আশ্রয়স্থল হওয়ার তো সম্ভাবনাই থাকবে না। এজন্যই এ কাজটাকে ইসলামে মুসলমানদের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس

"আমি তোমাদেরকে সত্যপন্থী উম্মাত বানিয়েছি, যেনো তোমরা সমগ্র মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও।" *(সূরা আল বাকারা : ১৪৩)*

আরো বলা হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر

"তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম জাতি, যার আবির্ভাব হয়েছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" *(সূরা আলে ইমরান : ১১০)*

২. ইসলামি রাষ্ট্রের এক অবস্থা এরূপ হয়ে থাকে যখন রাষ্ট্র শুধু আদর্শগতভাবেই ইসলামি নয় বরং কার্যত সরকারও ইসলামি চরিত্রের হয়, সৎ ও খোদাভীরু লোকেরা তার শাসনকার্য পরিচালনা করে, খাঁটি ইসলামি প্রেরণায় উজ্জীবিত ও ইসলামি ভাবধারায় পরিচালিত পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু থাকে এবং যেসব লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে ইসলাম স্বীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, রাষ্ট্রের গোটা প্রশাসনিক কাঠামো সেই লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে কার্যরত থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টই সকল মুসলমানের নেতা হবেন এবং তার নেতৃত্বে সকল মুমিন একই দল বা জামায়াতে শামিল হবে। এ সময় জামায়াতের অভ্যন্তরে জামায়াত গঠনের যে কোনো চেষ্টা ভুল হবে এবং সেই একমাত্র নেতা ছাড়া অন্য কারোর ব্যয়ভার বা আনুগত্য করা বৈধ হবে না। আর একটি অবস্থা এই যে, রাষ্ট্র শুধু আদর্শগতভাবেই ইসলামি, অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তাতে অবর্তমান। এ অবস্থার স্তরভেদ ও মাত্রাভেদ রয়েছে এবং প্রত্যেক স্তরের জন্য আলাদা আলাদা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। এমতাবস্থায় সংশোধন ও মান উন্নয়নের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে ও সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা নাজায়েয তো কোনো মতেই হতে পারে না। বরঞ্চ কোনো কোনো অবস্থায় তা ফরযও হয়ে যায়। একে নাজায়েয মনে করা ইসলামি রাষ্ট্রের পাপাচারী শাসকদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। তাই বলে সৎ নাগরিকরাও এটাকে নাজায়েয বলে মেনে নেবে এটা বড়ই বিস্ময়কর। অথচ এর নাজায়েয হওয়ার পক্ষে আদৌ কোনো শরিয়তসম্মত প্রমাণ নেই। এটা যদি নাজায়েয হতো তাহলে যেসব

মুজতাহিদ ইমাম বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদেরকে কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছিলেন, তাদের স্থান কোথায় হবে?

নামায সম্পর্কে শরিয়তের বিধান এই যে, আযানের আওয়ায যতোদূর পৌঁছে, ততোদূর পর্যন্ত লোকদের মসজিদে হাজির হওয়া উচিত। তবে শরিয়তসম্মত ওজর থাকলে ভিন্ন কথা। শরিয়তসম্মত ওজর বলতে বুঝায় রুগ্ন হওয়া, যে কোনো ধরনের বিপদের আশঙ্কা থাকা অথবা শরিয়তে যেসব বাধাবিপত্তি বা অসুবিধাকে স্বীকার করে তার উপস্থিতি। কাদা পানি এ ধরনেরই বাধাবিপত্তি। হাদিস থেকে জানা যায় যে, কোনো কোনো সাহাবি এরূপ পরিস্থিতিতে আযানের সাথে সাথে এ আওয়াজও দিতেন যে, الا صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ শুনে রাখ, তোমরা নিজ নিজ বাসস্থানে নামায পড়ে নাও। এ কথা শুনে লোকেরা নিজ নিজ আবাসে নামায পড়ে নিতো। জামায়াতের লোকেরা যদি বৈঠক করতে করতে জামায়াতের সময় কাটিয়ে দেয় এবং পরে একা একা নামায পড়ে, তবে এটা ভীষণ আপত্তিকর। এর সংশোধন অবশ্যই প্রয়োজন।

কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে মিথ্যা অত্যন্ত মারাত্মক গুনাহ। এমনকি রসূল সা. একে মুনাফেকীর আলামত বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেবল সেই ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েয হবে, যখন মিথ্যার চেয়েও মারাত্মক কোনো অনাচার দূর করার জন্য এর প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন কোনো মজলুমকে জালেমের কবল থেকে মুক্ত করা অথবা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি রোধ করা ইত্যাদি।

কারোর কাছে নেছাব পরিমাণের চেয়ে কম স্বর্ণ থাকলে যাকাত দিতে হবে না। চাই তার মূল্য রৌপ্যের নেছাবের মূল্যের চেয়ে যতোই বেশি হোক।

কোনো নামাযে কোনো বিশেষ সূরা নির্দিষ্ট করে নেওয়া জায়েয নয়। অভ্যাসগতভাবে পড়াতে দোষের কিছু নেই। তবে মাঝে মাঝে অভ্যাসের বিপরীত করা উচিত, যাতে বিদআতের মতো অবস্থার উদ্ভব না হয়।

ফেতরার পরিমাণে মতপার্থক্যের কারণ এই যে, আরবে তৎকালে ওজন ও পরিমাপের যে নিয়ম প্রচলিত ছিলো, তাকে বর্তমান যুগের ওজন ও পরিমাপের নিয়মের সাথে মেলাতে গেলে অসুবিধা দেখা দেয়। আলেমদের মধ্যে থেকে বিভিন্নজন চিন্তাগবেষণা করে যে ওজন নির্ণয় করেছেন, সাধারণ মানুষ তার যে কোনোটা অনুসারে ফেতরা দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বেশি কড়াকড়ি করার প্রয়োজন নেই। ঈদের দিন নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পর যে ব্যক্তি ফেতরা দিতে সক্ষম হয়, তার ফেতরা দিতে হবে। স্ত্রী সক্ষম হলে ফেতরা তার উপরই ওয়াজেব হবে। কেননা স্বামীর ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব তার উপর বর্তায়

না। তবে আমার মতে এরূপ সক্ষম স্ত্রীর স্বীয় সন্তানদের বাবদ ফেতরা দেওয়া উচিত। *(তরজমানুল কুরআন, শাওয়াল ১৩৭৬ হি., জুলাই ১৯৫৭ খৃ.)*

তাবলীগি জামায়াতের সাথে সহযোগিতা

প্রশ্ন : একটা কথা অনেকদিন ধরে আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনো কখনো এটা আমার জন্য একটা চিন্তার রূপ ধারণ করে বসে। আমি আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দোয়া করি যে, যেসব বিজ্ঞ ও সুযোগ্য ব্যক্তির চেষ্টা সাধনায় যথেষ্ট প্রভাব নিহিত রয়েছে, যাদের মনমগজের শক্তি দ্বারা অনেক কিছু ভাঙ্গা ও গড়া, মুসলমানদের সংস্কার ও সংশোধন, তাদের দলাদলি ও বিভেদ মেটানো, গঠনমূলক বিপ্লব সাধন করা এবং অনেক অসাধ্য সাধন করা সম্ভব, তাদেরকে যেনো আল্লাহ্ এ বিষয়টির দিকে মনোনিবেশ করার তওফিক দেন। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের চিন্তাশক্তির সমন্বয় ও ঐক্যের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি।

আমি যে কথাটা বলতে চাই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল। আমার মতো স্বল্প যোগ্যতার মানুষের পক্ষে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখনি চালনা করা কোনোক্রমেই সমীচীন নয়। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে আমি এ বক্তব্য পেশ করছি। আশা করি তিনি এতে কোনো সুফল দর্শাতে পারেন।

আপনি আপনার বিভিন্ন লেখাতে বারবার একথা বলেছেন যে, আমরা এ কাজ (ইসলামি আন্দোলন) আল্লাহরই উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহরই উপর নির্ভর করে শুরু করেছি, যেনো আমাদের কোনো ভুল ত্রুটি হলে তিনি তার সংশোধন করে দেন। তাছাড়া আপনি খোলাখুলিভাবে এই মর্মে আশ্বাসও দিয়েছেন যে, সত্যানুসন্ধানী ও সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কেউ দ্বিমত প্রকাশ করলে তাও আপনি উদার ও খোলা মনে বিবেচনা করবেন। আমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত যে, এ ধরনের কোনো দ্বিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনি সত্যিই কোনো রকম সংকীর্ণতা প্রদর্শন করেননি।

আপনার হয়তো জানা আছে যে, আমি ইসলামের প্রাথমিক চেতনা তাবলীগি জামায়াত থেকে লাভ করেছি। এখন পর্যন্ত এ জামায়াতের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ এ সম্পর্ক স্থায়ী করুন এবং বাড়িয়ে দিন এই কামনা করি। তবে এর পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামির সাথেও আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বর্তমানে আমার অধিকতর সময় এই দলের কাজেই ব্যয় হয়। আমি গর্বিত নই, তবে এ কথা সত্য যে, জামায়াতে ইসলামি এখন একটি জীবন্ত দল। ইদানীং দীনদার লোকদের দৃষ্টিও এর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। তবে যে ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক তা হলো, তাবলীগি জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামির

কোন্দল। আমি এ ব্যাপারে তাবলীগি জামায়াতের নেতৃস্থানীয় আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলেছি এবং নিসংকোচে এ আপত্তি তুলেছি যে, আপনারা অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ ও হেদায়াতের জন্য দোয়া করতে পারেন। কিন্তু একমাত্র জামায়াতে ইসলামির ব্যাপারেই আপনাদের মনে কোনো উদারতা নেই। আপনারা একজন পাপিষ্ঠ মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস ও আমলের ক্রটি শোধরানোর জন্য সর্বপ্রকার পরিশ্রম ও কষ্ট করতে প্রস্তুত। তাদের সব ধরনের অনাচার ও পদস্খলন সহ্য করতে পারেন। অথচ জামায়াতে ইসলামিকে আপনারা গোমরাহ বিবেচনা করা সত্ত্বেও তার দিকে নযর দিতে চান না এবং তার প্রয়োজনও অনুভব করেন না। তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা, তাদের কথা শুনা এবং তাদের কার্যকলাপকে বুঝতে চেষ্টা করাও আপনাদের মতে গোমরাহী ডেকে আনার শামিল। কিন্তু এই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামির বন্ধুদের অবস্থাও এদিক থেকে তাবলীগিদের তুলনায় ভালো নয়। আমি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে, তাবলীগি লোকদেরকে দেখামাত্রই জামায়াত ইসলামির লোকদের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনার ভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। আমার বুঝে আসে না যে, এমনটি কেন হয়। আমি তাদের কাছ থেকে বহুবার একথা জিজ্ঞাসা করে বুঝতে চেষ্টা করেছি যে, তাবলীগি জামায়াত ইসলামইতো প্রচার করে, কোনো ইসলাম বিরোধী ধ্যান ধারণার প্রচার তো করে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, শুধুমাত্র কালেমা নামাযেই তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ তা হলেও জিজ্ঞাস্য এতোটুকুও কি ইসলামের প্রচার নয়? এগুলো কি ইসলামের মৌলিক জিনিস নয়? কোনো মুসলমান, তা সে এল্‌ম ও আমলের যে স্তরেই থাক, এ জিনিসগুলোর অভাবে যে তার মুসলমানিত্ব টিকতে পারে না, এটা কি সত্য নয়? তারা দিনরাত যে পরিশ্রম করেন তা কি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়? মেনে নিলাম যে তাদের মস্তিষ্কে যথাযোগ্য প্রশস্ততা নেই। কিন্তু একজন দুর্বল মানুষের কিঞ্চিৎ পরিশ্রমও যদি ইসলামের জন্য নিবেদিত হয়, তবে তা কি আল্লাহর দরবারে কবুল হবার যোগ্য নয়? আমি তো বলি, একজন সাদাসিধে মানুষ তার যাবতীয় বোকামী ও দুর্বলতা নিয়েও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার দীনকে উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য যেটুকু চেষ্টা সাধনা করে, তা নির্ভেজাল হওয়ার কারণে হয়তো অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে একজন সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য মানুষ তার আখিরাতের কল্যাণের জন্য যেটুকু কাজ করে, তাতে ভেজাল থাকতে পারে। নিজের জ্ঞান, আমল ও প্রজ্ঞা নিয়ে তার ভেতরে অহংকার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

যাহোক, এ কথাগুলোতো আমাদের নিজেদের খাতিরেই বললাম। কিন্তু ইসলামের স্বার্থ ও কল্যাণের দিক যদি বিবেচনা করি, তাহলে আমার এ ধারণা কতোদূর সত্য জানি না যে, এ ধরনের লোকেরাই যদি ইসলামি শাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তবে আমাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। এমন একটি আত্মনিবেদিত দল,

যারা এ দুনিয়ায় বাস করেও দুনিয়ার কোনো মোহকে প্রশ্রয় দেয় না, বরং যা কিছু ভাবে, বোঝে এবং কামনা করে সবই কেবল আখিরাতের জন্য, তাদের চাইতে উপকারী ও স্বার্থক মানুষ এমন তৈরি অবস্থায় আর কোথায় পাওয়া যাবে? খুব জোর দিয়ে বলতে না পারলেও যতোদূর জানি ও বুঝি তাতে এ কথা সত্যের কাছাকাছি বলেই মনে করি যে, খেলাফতে রাশেদা এ ধরনের লোকদের উপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

আমার এই বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যদি তাবলীগি জামায়াতের লোকদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেই এবং সামনে এগিয়ে তাদেরকে আপন করার চেষ্টা করি তবে সেটা কতোদূর স্বার্থক ও কল্যাণকর হবে ভেবে দেখা দরকার। এক দল আর এক দলের সাথে যুক্ত হয়ে একদলে পরিণত হবে সে কথা বলছিনে। বরং যে যে কাজ করছে করতে থাকুক। আমরা শুধু নিজ নিজ সীমার মধ্যে থেকে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হই এবং তারা আমাদের কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হোক। দু'টো মুসলিম দলের মধ্যে রেষারেষি ও বিরোধ দূর হয়ে যাওয়াটাই এক বিরাট সাফল্য।

জবাব : অন্যান্য ইসলামি সংগঠন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় এরূপ ছিলো এবং আমি সে কথা সব সময় প্রকাশ্যে বলেও আসছি যে, যিনি যে পর্যায়ে আল্লাহর দীনের কোনো খিদমত করছেন, সেটাই এক দুর্লভ ও অমূল্য সম্পদ। ইসলাম বিরোধী আন্দোলনসমূহের বিপরীতে ইসলামের জন্য কর্মরত সকলেই প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের সহযোগী এবং তাদের পরস্পরকে সহযোগী মনে করাই উচিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব কেবল তখনই সৃষ্টি হতে পারে, যখন আমরা আল্লাহর নাম ভাঙ্গিয়ে দোকানদারীতে লিপ্ত হবো। তেমনটি হলে তো নি:সন্দেহে প্রত্যেক দোকানদার চাইবে যে, বাজারে তার দোকান ছাড়া আর কারুর দোকান যেনো না থাকে। কিন্তু আমরা যে কাজ করছি তা যদি দোকানদারী হিসেবে না করি বরং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাজ হিসেবেই করি, তাহলে আমাদের আরো খুশি হওয়া উচিত যে, আমরা ছাড়াও একই আল্লাহর কাজে অন্যেরাও নিয়োজিত রয়েছে। কেউ যদি মানুষকে শুধু কালেমা পড়ানোর কাজে লিপ্ত থাকে, তবে সেও আল্লাহর দীনেরই একটা খিদমত করছে। কেউ যদি শুধু অযু ও গোছলের নিয়ম পদ্ধতি শিখানোর কাজে নিয়োজিত থেকে থাকে, তবে সেও এই দীনেরই কাজ করছে। এমতাবস্থায় আমার সাথে তার এবং তার সাথে আমার রেষারেষি কেন হবে? আমরা একজন আর একজনের কাজে বাধা দিতে যাবো কেন? যারা পৃথিবীতে নাপাক কালেমা অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী তন্ত্রমন্ত্র ছড়াচ্ছে তাদের মুকাবিলায় পাক কালেমা পড়ানোর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিতো আমার অধিকতর প্রিয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমি জামায়াতে ইসলামির কর্মীদের মধ্যেও সব সময় এই মনোভাবই সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি এবং এর বিপরীতে কোনো আচরণ কখনো পছন্দ করিনি। আপনি যদি জামায়াতের মধ্যে এর বিপরীত মনোভাব ও কার্যকলাপ দেখে থাকেন, তবে আমাকে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানের নাম সহকারে জানান, যাতে আমি ব্যাপারটা শোধরাতে পারি।

বিশেষভাবে তাবলীগি জামায়াতের কথা যেহেতু আপনি উল্লেখ করেছেন সেজন্য বলছি যে, আমি এই জামায়াতের জন্যও সব সময় হিতাকাঙ্ক্ষীর মনোভাবই পোষণ করেছি এবং নিজের মুখ ও কলম দ্বারা তার পক্ষে উত্তম বক্তব্যই রেখেছি। মরহুম মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের জীবদ্দশায় স্বয়ং তাঁর কাছে গিয়েছি। মেওয়াত অঞ্চলে তাঁর সাথে সফর করে তাঁর কর্মকাণ্ড নিকট থেকে দেখেছি। এরপর তার কর্মকাণ্ডে আমি যতোখানি ভালো ও কল্যাণকর পেয়েছি, তরজমানুল কুরআনে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছি। আর যেসব ব্যাপারে কিছু অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেছি, সেগুলোর কথা নিভৃতে শুধু মরহুম মাওলানা সাহেবকে বলেই ক্ষান্ত থেকেছি।[১] তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই জামায়াতের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেছি বা লিখেছি এমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে না। জামায়াতে ইসলামির কর্মীরা কখনো তাদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এমন দৃষ্টান্তও দেখানো যাবে না। কিন্তু আমাকে পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, তাবলীগি জামায়াতের আচরণ আমার ও জামায়াতে ইসলামির সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের দেখা গেছে। শুধু এর সাধারণ কর্মীরাই নয় বরং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও জামায়াতে ইসলামির সাথে বিভিন্ন সময়ে এমন আচরণ করেছেন, যার জন্য একবার আমাকে লিখিত অভিযোগ করতে হয়েছিল।[২] কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কোনো প্রতিকার করেননি। সম্প্রতি তাদের একজন বিশিষ্ট নেতা স্বীয় পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে ও জামায়াতে ইসলামির বিরুদ্ধে উপর্যুপরি যেভাবে বিষোদগার করেছেন তাও হয়তো আপনি দেখেছেন। কিছুদিন আগে তারা পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামির বিরুদ্ধে দেওবন্দী আলেমদের ফতোয়ার কপি বিপুল পরিমাণে বিলি করেছেন। অথচ সেখানে ক্রমবর্ধমান অনৈসলামি ভাবধারা রোধে জামায়াতে ইসলামি যে চেষ্টা করে যাচ্ছিলো, ইসলামের কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী সেই চেষ্টায় তার সহযোগিতা করতে না পারুক, অন্তত এ ক্ষেত্রে ধর্মহীনদের মুকাবিলায় এই সংগঠনটির কাজ বিঘ্নিত করা উচিত ছিলো না। এতোসব কিছুর পর আপনি এখন আমাকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে বলেছেন। শত্রুতার হাততো ওদিক থেকেই বাড়ানো হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। আমার প্রশ্ন এই যে, বন্ধুত্বের হাত যদি বাড়াই তবে তা ঐ হাতের সাথে কোথায় গিয়ে মিলিত হবে? দু:খের বিষয় যে, 'ইকরামুল মুসলিমীন' অর্থাৎ প্রত্যেক

---

১. তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৩৯ দ্রষ্টব্য।

২. রাসায়েল ও মাসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

মুসলমানকে শ্রদ্ধা করার যে নীতি তারা ঘোষণা করে থাকেন, তা তাঁদের কাছে কেবল ফাসেক ফাজের তথা দুর্নীতিবাজ ও পাপাচারী লোকদের জন্যই আমাদের জন্য নয়। আর কিছু না হোক তাঁদের অন্তত এতোটুকু চিন্তা করা উচিত যে, তারা যেভাবে আমার ও জামায়াতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটান, আমিও যদি সেভাবে তাদের ও তাদের তাবলীগি জামায়াতের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটনা শুরু করে দেই তাহলে এর পরিণাম কি দাঁড়াবে? সাধারণ মানুষের চোখে উভয় দলেরই অনাস্থাভাজন ও ধিকৃত হওয়া এবং আমাদের উভয় দলের জন্য দীনের কাজ করার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া এর পরিণতি আর কিছু হতে পারে না। অন্যান্য ইসলামি দলের পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদগার, কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি এবং একে অপরের মূলোৎপাটনের ফলও একই রকম হতে বাধ্য। বস্তুত এর ফলে সামগ্রিকভাবে গোটা ইসলামপ্রিয় গোষ্ঠীর মানসম্ভ্রম ও বিশ্বাসযোগ্যতা জনগণের চোখে একেবারেই ভূলুণ্ঠিত হবে এবং ধর্মহীন আন্দোলনসমূহ তা দ্বারা উপকৃত হবে। এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করেই আমি আমার বিরুদ্ধে পরিচালিত যাবতীয় আক্রমণকে ধৈর্যের সাথে এড়িয়ে চলেছি। সেই সাথে জামায়াতের জনশক্তিকেও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়ে থাকি। নচেত একথা বলাই বাহুল্য যে, আমি যদি তাদের বিরুদ্ধে প্রচারভিযানে অবতীর্ণ হই, তাহলে তাদের কেউই ওহীর ভাষায় কথা বলেন না যে, ভুলত্রুটি ধরার আদৌ কোনো সুযোগই আমি পাবো না। *(তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ খৃ.)*

বিহারের ইমারাতে শরিয়ার প্রশ্নাবলী ও তার জবাব

প্রশ্ন : বিহার ও উড়িষ্যার (ভারত) ইমারাতে শরিয়ার ফতোয়া বিভাগে জামায়াতে ইসলামি সম্পর্কে নানা রকমের প্রশ্ন এসে থাকে। এগুলোতে প্রশ্নকর্তাদের উগ্র মনোভাব প্রকাশ পায়। প্রশ্নগুলোতে প্রধানত জামায়াতে ইসলামি ও তার সদস্যদের ইসলামি মান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে (যা প্রায়শ জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে) সরাসরি জামায়াতের দায়িত্বশীলদের নিকট প্রশ্ন করা ও তার জবাব চেয়ে নেওয়া সমীচীন মনে করেছি, যাতে এই জবাবের আলোকে জামায়াতে ইসলামি এবং তার সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের ইসলামি মান সম্পর্কে মত স্থির করা ও শরিয়তের বিধান জানানো আমাদের পক্ষে সহজ হয়। আমাদের মতে এভাবে নিশ্চিত না হয়ে শরিয়তের কোনো বিধি প্রয়োগ করা সতর্কতার পরিপন্থী কাজ হবে। আপনার কাছে অনুরোধ, নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর জবাব অত্যন্ত সংক্ষেপে, সম্ভব হলে শুধুমাত্র 'হ্যাঁ' ও 'না' দ্বারা এমনভাবে দেবেন, যাতে এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামি এবং তার দায়িত্বশীলদের নীতি ও অভিমত কি তা আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে জানতে পারি। উল্লেখ যে, কখনো কখনো দীর্ঘ জবাব দ্বারা বক্তব্য স্পষ্ট হওয়ার পরিবর্তে আরো অস্পষ্ট হয়ে যায়। আমাদের উদ্দেশ্য আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা নয়। বরং উল্লিখিত বিষয়ে

জামায়াতের মতামত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং জামায়াত ও তার সদস্যদের ইসলামি মান নির্ণয়কে নিজেদের জন্য সহজতর করা। আশা করি আপনি এ প্রশ্নগুলোকে একজন শুভানুধ্যায়ীদের প্রশ্ন মনে করে জবাব লিখবেন।

১. আপনাদের মতে সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মত অভিমত শরিয়তের অকাট্য দলিল কিনা?

২. যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামের নিন্দা করে এবং কোনো দীনদার লোকের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন কার্যকলাপের দায়ে তাদেরকে অভিযুক্ত করে, সে ফাসেক ও গুণাহ্গার নয় কি?

৩. ফরয কাজ পরিত্যাগকারী এবং কবীরা গুনাহতে লিপ্ত ব্যক্তি আপনাদের দৃষ্টিতে মুসলমান কিনা?

৪. তাসাউফ (প্রচলিত তাসাউফ নয়) যা 'ইহসান' ও 'সুলুক' নামেও পরিচিত এবং যার শিক্ষা দিয়েছেন নকসবন্দিয়া, চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া ও কাদেরিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতাগণ যথা হযরত শেখ শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ নকসবন্দ, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী, হযরত শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী এবং হযরত শেখ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রহ.। এ তাসউফকে আপনারা ইসলামের জন্য উপকারি মনে করেন না ক্ষতিকর?

৫. কোনো উক্তিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসরূপে গ্রহণ করার জন্য বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হিসেবে কোনটা অগ্রগণ্য, রেওয়ায়াত (বিশ্বস্ত সনদযুক্ত বর্ণনা) না দেরায়াত (হাদিসের বক্তব্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য)? যে দেরায়াত হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধ যাচাই এর মাপকাঠি হওয়ার যোগ্য, আপনার মতে তার সংজ্ঞা কি?

৬. জামায়াতে ইসলামির সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা ছাড়া উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমানগণ, যারা নিজেদেরকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' নামে আখ্যায়িত করে থাকে এবং যাদেরকে আপনি নিছক জন্মসূত্রে মুসলমান বলে থাকেন, তারা শরিয়তের দৃষ্টিতে ইসলামের গণ্ডীভুক্ত, না ইসলাম থেকে খারিজ?

৭. আপনার মতে 'সত্যের মাপকাঠি' বলতে কি বুঝায়? সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি কিনা?

৮. একজন মুসলমানের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার জন্য কোনো না কোনো ইমাম বা মাযহাবের তাকলীদ (অনুকরণ) করা ফরয কিনা? ব্যক্তিগত তাকলীদকে আপনি কেমন মনে করেন? যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত তাকলীদকে ওয়াজেব বলে, সে আপনার দৃষ্টিতে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য না ভৎসনাযোগ্য?

৯. আপনি কি মনে করেন যে, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছাকৃতভাবে নবীদের পদস্খলন ঘটিয়েছেন?

১০. নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জেহাদ, এই ইবাদগুলোর মধ্যে কোন্টা শরিয়তের দৃষ্টিতে মুখ্য ইবাদত? সর্বপ্রধান মুখ্য ইবাদত কোন্টা? নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইসলামে মুখ্য ইবাদত, না জেহাদই মুখ্য এবং এগুলো তার মাধ্যম ও উপকরণ মাত্র। আপনি কি এই শেষোক্ত আকিদা পোষণ করেন?

১১. কালেমায়ে শাহাদাতে বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা দেওয়ার চার পাঁচ দিন বা চার পাঁচ ঘণ্টা পর যদি কেউ মারা যায় এবং সে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও একজন মুসলমানের ঋণ পরিশোধ না করে মারা যায়, আপনি তাকে মুসলমান স্বীকার করে তার জানাজা পড়বেন কিনা?

১২. যেসব মুসলমান সরকারি চাকুরি করে কিংবা সরকারি আদালতে জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ভারতীয় আইন প্রয়োগ করে অথবা আইনসভার সদস্য হিসেবে আইন প্রণয়নে অংশ নেয়, তারা আপনার দৃষ্টিতে ইসলামের আওতাভুক্ত কিনা? আপনাদের মতে এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি?

জবাব : আমাকে স্মরণ করার জন্য ধন্যবাদ। আমি বুঝিনা, আপনারা অন্যদের সম্পর্কে ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব অনর্থক নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেন কেন। আমার কাছে যদি কেউ আপনার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তবে আমি প্রথম চোটেই অক্ষমতা প্রকাশ করবো এবং কোনো প্রশ্নপত্র লিখে আপনার কাছে পাঠাবো না। তবুও আপনি যখন কষ্ট করে এ প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছেন, তখন সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

১. জ্বি হ্যাঁ, আমার মতে সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত শরিয়তের অকাট্য দলিল।

২. সাহাবায়ে কিরামের নিন্দা ও কুৎসা রটনাকারী শুধু ফাসেক নয়, তার ঈমানও সন্দেহজনক। রসূল সা. বলেছেন, مَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ যে ব্যক্তি সাহাবিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে।

৩. আমরা তাকে মুসলমান বলে স্বীকার করি। তবে তার সংশোধনও জরুরি মনে করি।

৪. আমাদের মতে আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্র সাথে সংগতিশীল এমন প্রতিটি জিনিস উপকারি এবং যা সংগতিশীল নয় তা ক্ষতিকর। এই সাধারণ মূলনীতির আওতায় তাসাউফও পড়ে। তাসাউফেও যা কিছু কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক তা সত্য এবং নিঃসন্দেহে উপকারি ও কল্যাণকর। কিন্তু এতে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে বেখাপ্পা যদি কোনো সংযোজন ও সংমিশ্রণ ঘটে, আমরা তা বর্জন করি এবং অন্যদেরকেও বর্জন করতে বলি।

৫. হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধ যাচাই এর জন্য প্রথম বিবেচ্য বিষয় হাদিসের সনদ। এর পরেই দেখতে হবে দেরায়াত। দেরায়াত অর্থ এই যে, হাদিসের বক্তব্য যাচাই করে দেখতে হবে যে, তা কুরআন ও প্রামাণ্য হাদিসের বিরুদ্ধে যায় কিনা? তার সমর্থনে অন্য কোনো বর্ণনা আছে কিনা? রসূল সা. এর যে কথা বা কাজের উল্লেখ এতে করা হয়েছে, কি অবস্থায় ও কোন ক্ষেত্রে তা বলা বা করা হয়েছে এবং সেই অবস্থা ও ক্ষেত্রের সাথে ঐ উক্তি বা কাজের সম্পর্ক কি? ইত্যাদি।

৬. জামায়াতে ইসলামিতে যোগদান করা আমাদের মতে আগেও কখনো মুসলমান হওয়ার জন্য শর্ত ছিলো না, আজও নয়। ইনশাআল্লাহ, আমরা এমন আহাম্মকিতে কখনো লিপ্ত হবো না যে, যারা জামায়াতে আসেনি তাদেরকে মুসলমান মনে করবো না। জামায়াতের বাইরের সকল মুসলমানকে আমরা 'বংশগত ও জন্মগত মুসলমান' বলিনি। কেবল যারা এ ইসলামের কোনো জ্ঞান রাখে না এবং তদনুযায়ী কাজও করে না, চরিত্র, আদত অভ্যাস ও কার্যকলাপে ইসলামের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকেই বলেছি।

৭. আমাদের মতে সত্যের মাপকাঠি বলতে সেই জিনিসকে বুঝায়, যার সাথে মিল থাকাই সঠিক ও সত্য আর যার সাথে গরমিল হওয়াই বাতিল বা অসত্য। এ হিসেবে সত্যের মাপকাঠি শুধু আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত বা আদর্শ। সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি নন, বরং তারা কুরআন ও হাদিসের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। কুরআন ও সুন্নাহ্র কষ্টিপাথরে যাচাই করেই আমরা বুঝি যে, সাহাবায়ে কিরাম সত্যপন্থী দল। তাদের মতৈক্যকে আমরা শরিয়তের অকাট্য দলিল হিসেবে মানি এজন্যই যে, তাদের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ্র বিন্দুমাত্র বিরোধী সিদ্ধান্তে একমত হয়ে যাওয়া আমাদের মতে অসম্ভব।

৮. মুসলমানের জন্য খাঁটি মুসলমান হিসেবে একমাত্র রসূল সা. এর তাকলীদ করা ফরয। মুজতাহিদ ইমামদের তাকলীদ করাটা আমরা শুধু এমন মুসলমানদের পক্ষে জরুরি মনে করি, যারা শরিয়তের বিধি সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের পুংখানুপুংখ বিচার গবেষণা করার যোগ্য নয়। যারা বিচার বিশ্লেষণ ও চিন্তা গবেষণা করার যোগ্যতা রাখে তারা যদি কোনো মুজতাহিদ ইমামের মতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নি:সন্দেহ হয়, তবে তাদের ঐ ইমামের অনুকরণ ও অনুসরণকে আমরা দূষণীয় মনে করি না। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি চিন্তা গবেষণা দ্বারা কোনো বিষয়ে নিজ ইমাম ছাড়া অন্য কোনো ইমামের মতামতকে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে অধিকতর সংগতিশীল বলে বুঝতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় নিজ ইমামেরই তাকলীদ করতে থাকে, তবে এটা আমাদের মতে জায়েয নয়।

৯. জ্বি না, আমার ধারণা এই যে, নবীগণ যেহেতু আল্লাহর তত্ত্বাবধানে কাজ করেন তাই আল্লাহ তাদের প্রতি উদাসীন বা বেখেয়াল হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের পদস্খলা ঘটেনি। বরঞ্চ পদস্খলন যা কিছু ঘটেছে তার কারণ এই যে, আল্লাহ তাদের দ্বারা সেই পদস্খলন ঘটতে দিয়েছেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাঁরা মানুষ, খোদাসুলভ গুণাবলীর অধিকারী নন।

১০. আমার মতে মুখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহর দীন কায়েম করা। আল্লাহ বলেছেন,

اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْ فِيْهِ

"তোমরা দীন কায়েম কর, এ ব্যাপারে দলাদলি ও মতভেদে লিপ্ত হয়ো না।" যেহেতু নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইসলামের মূল স্তম্ভ এবং এর উপরই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, তাই দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এগুলোর বাস্তবায়ন অপরিহার্য। আর যেহেতু জেহাদ ইসলামকে তার সমগ্র বিধিব্যবস্থা সহকারে কায়েম করার একটা মাধ্যম, তাই ইসলাম কায়েম করার জন্য জেহাদও অপরিহার্য। প্রশ্নের শেষাংশের জবাব হযরত মায়ায বিন জাবালের বর্ণিত হাদিসে বিদ্যমান।

الا ادلّكمْ بِرَاْسِ الاَمْرِ وَعُمُوْدِهِ وَذَرْوَةِ سِنَامِهِ ؟ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلُ اللهِ –قَالَ رَاسُ الاَمْرِ الاِسْلاَمُ وَعُمُوْدُهُ الصَّلوةُ وَذَرْوَةُ سِنَامِهِ الجِهَادُ –

"আমি কি তোমাকে বলে দেবো না যে, এই নেতৃত্বের মাথা কি, এর স্তম্ভ কি এবং সর্বোচ্চ চূড়া কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহর রসূল। তখন রসূল সা. বললেন, নেতৃত্বের মাথা হলো ইসলাম, এর স্তম্ভ হলো নামায এবং সর্বোচ্চ চূড়া হলো জেহাদ।"

১১. অবশ্যই আমি তার জানাযা পড়বো।

১২. আমার মতে সে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত নয়। আমি তাকে মুসলমান মনে করেই বলতে চাই যে, তুমি এমন কাজ করছো যা কোনো মুসলমানের করা উচিত নয়। *(তরজমানুল কুরআন, আগস্ট ১৯৬১ খৃ.)*

সমাপ্ত

رسائل ومسائل

রাসায়েল ও মাসায়েল গ্রন্থটি ইসলামকে জানার জন্যে এক অসাধারণ জ্ঞান-ভান্ডার। এ গ্রন্থের সবগুলো খন্ড পড়ুন

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট

ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২